অনাথবন্ধু।

(উপন্যাস)

দৈন্যঞ্চ পারতন্ত্র্যঞ্চ শিক্ষা বৈদেশিকী তথা।
স্বার্থোপদেশিনীত্যেতত্ত্রয়ং বিঘ্নোঽদ্য চেদিহ ॥
তথাপি শাস্ত্রদিষ্টেন ভক্তিমজ্জ্ঞান বর্ত্মনা।
সততং যো নরোযাতি ন স জাতু বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥

হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ১।০ মাত্র।

এত ব্যয়সাধ্য বিদ্যা শিক্ষার পর, এবং বিবাহেরও পরে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এক পয়সাও আনিয়া যে পিতার সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, এজন্ত অনাথবন্ধুর মনে বড় কষ্ট হইত।

অনাথবন্ধু পঠদ্দশায় ছাত্রসমিতিতে ছোট ছোট বক্তৃতা করিতেন। প্রথমে বক্তব্য কথাগুলি বাড়ী বসিয়া লিখিতেন—তাহার কাটকুট করিতেন—বিচারে ফাঁকি না থাকে অবহিত হইয়া দেখিয়া লইতেন; পরে মুখস্থ করিয়া তবে প্রকাশ্যে বলিতেন। সমপাঠীরা ও শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহার বক্তৃতার এই বিশেষ প্রশংসা করিতেন যে, উহাতে কিছুমাত্র অসার কথা থাকিত না, এবং বিচার্য্য বিষয়ের অতি ধীরভাবে সমালোচনা ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা হইত। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে অনাথবন্ধুর দু কথা গুছাইয়া বলিবার একটু ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি কুর্দ্দন ও হস্ত পদাদির আস্ফালন পূর্ব্বক অনর্গল অসার কথা বলিয়া সাধারণের তৃপ্তি সম্পাদনে অক্ষম হইলেও, তাঁহার অনেক পরিশ্রমার্জ্জিত বাক্‌শক্তিটুকু দ্বারা তিনি সহজে ও অতি সংক্ষেপে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই আসল কথাগুলি বলিতে পারিতেন।

এখন অনাথবন্ধুর একান্ত ইচ্ছা যে, দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমায় সধন নির্ধন যেমন মক্কেলই হউক এক জন কাহাকেও কিছু উপলক্ষ করিয়া

আদালতে ত কথা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাই কি নব্য উকীলের পক্ষে সহজে ঘটিয়া উঠিতে পারে? মোকদ্দমা একেবারে না পাইলে কোথায় কি বলিবেন? অবশেষে যে সকল নিতান্ত গরীব আসামী দায়রায় উকীল দিতে পারে না, তাহাদের জন্য নিজের পয়সায় ষ্ট্যাম্প কিনিয়া ওকালতনামা দিয়া অনাথবন্ধু মোকদ্দমা লইতে আরম্ভ করিলেন। একটা চেষ্টা করা ত চাই, আর শুনিয়াও ছিলেন যে, ঐরূপ উপায়ে মোকদ্দমা লইয়া ভালরূপ কার্য্য করিতে পারিলে ক্রমশঃ পসার হওয়া সম্ভব—দু এক জনের তাহা হইয়াছে।

দায়রায় এইরূপ "অসমর্থিত পক্ষের" মোকদ্দমা অধিকাংশ সময়েই হারিয়া আসিতে হইত। "পূর্ব্বে শাস্তিপ্রাপ্ত" চোরের বা ডাকাইতি মোকদ্দমার আসামীর বিরুদ্ধে, প্রমাণে অল্প স্বল্প ত্রুটি জুরিরা সাধারণতঃ লক্ষ্য করেন না। সহজেই আসামীকে পাকা চোর ও বদমাইস স্থির করিয়া ফেলেন—পূর্ব্ব-শাস্তি-নিবন্ধন এবারেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। পুলিশ আবার প্রায়ই ওরূপ মোকদ্দমায় বিশেষ উপায়ে কলম-বন্ধ একরার দাখিল করিতে পারেন।

যাহা হউক, প্রমাণের ত্রুটি দেখাইয়া অনাথবন্ধু একবার একটি অতি দরিদ্র খুনী আসামীকে খালাস করিতে পারিয়াছিলেন।

—— × ——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জজ সাহেব।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমন্তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥

আসামী খালাস হইবার অল্পক্ষণ পরেই জজ সাহেব অনাথ বন্ধুকে খাস কামরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অনাথবন্ধু তথায় গিয়া বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন। সাহেব একটু স্মিত মুখে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাবু! অপরাধীদের প্রতি তোমার এমন প্রগাঢ় প্রেম কেন হইল? শুনিতেছি তুমি বিনা "ফি"তে খুনীর মোকদ্দমায় তদ্বির করিতেছিলে।"

অনাথবন্ধু উত্তর করিলেন,—"হুজুর যখন আমার মক্কেলকে এইমাত্র বেকসুর খালাস দিয়াছেন তখন সে কি অপরাধী পদ বাচ্য হইবে?"

কথাটা জজ সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন—"আইনের মার প্যাঁচ কাটান প্রমাণ না থাকায় তাহাকে ছাড়া গেল বটে, কিন্তু লোকটা অপরাধী।"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "হুজুর! আপনি বহুদর্শী বিচারক। পুলিশের চালানী সমস্ত কাগজ পত্র ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পান। অনেক কাল দেখিয়া শুনিয়া তাহার কোন অংশ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি না, তাহা জ্ঞাত আছেন এবং এদেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতি আপনার কিছুই অবিদিত নাই। কত প্রকার অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সংবাদে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন। আমি সে সকলের কি বুঝিব?"

সাহেব এদেশে পাঁচ বৎসরমাত্র আসিয়াই জজ হইয়াছেন। তাঁহার একবার মনে হইল যে আমি বিদেশী, এদেশের বিষয় বড় কিছু জানি না, পুলিশের অবিশ্বাস্য কাগজে এবং উড়ো কথায় সিদ্ধান্ত স্থির করি, ইশারায় বুঝি এইরূপ কিছু বলিতেছে; কিন্তু অল্পবয়স্ক পসার হীন ক্ষুদ্র উকীলের পক্ষে সেরূপ ধৃষ্টতার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, এবং অনাথবন্ধুর একান্ত বিনীত ধরণ দেখিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহার প্রশংসাই করিতেছে।

তখন একটু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনসেফেরা ও সব্ জজেরা তোমাকে 'কমিশনের' কাজ দেন না কি? আমি নূতন উকীলদিগকে ঐরূপে সাহায্য করা উচিত মনে করি। পসার স্থাপন চেষ্টাতেই তুমি এরূপ মোকদ্দমা লইয়াছিলে; কিন্তু দেখ অপরাধীর শাস্তিতে ব্যাঘাত করা কাহারও উচিত নয়। তোমার ধরণ ধারণ ভাল। বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ। অল্প সময়ে জেরা শেষ ও দু চার কথায়

বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলে। কোন প্রকার কষ্ট দাও নাই। কালে তোমার বেশ পসার হইবে। অপরাধীকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাই কি তোমার উচিত নয় ?”

লাল মুখের প্রশংসা বড় কঠিন জিনিস। সাহেবের ধমকে যিনি বড় ভীত বা বিচলিত হন না, তিনিও সাহেবের প্রশংসা কাটাইয়া মনস্থির রাখিতে পারেন না— একেবারে গলিয়া যান! অনাথবন্ধু বাল্যাবধি কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে শিক্ষিত। কিন্তু সাহেবের মিষ্ট কথায় অনাথবন্ধুও বলিয়া ফেলিলেন,—“আপনি যেরূপ বলিতেছেন সেইরূপ করিব।”

কথাগুলি মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্রই অনাথবন্ধুর মনে খট্‌কা লাগিল। মনে হইল ‘একি প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকার আসামীর পক্ষ সমর্থন আর কখনই করিব না! এইরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণতাই কি এতদিন ধরিয়া শিখিলাম ? পিতাকে গিয়া কিরূপে বলিব যে আপনার প্রদত্ত সমস্ত উপদেশ ইংরাজের এক মিষ্ট কথায় ভাসিয়া গিয়াছে! জজ সাহেবের মনস্তুষ্টি এবং তদ্দ্বারা পসার হওয়ার সম্ভাবনা কি এতই বড়! সত্য সত্য ত পসার অর্থাৎ টাকাই সব নয়। তাহার উপরের জিনিসও ত আছে!’—মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল কথা অনাথবন্ধুর মনের মধ্য দিয়া পার হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে উকীলদের যাহা প্রকৃত কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন। কর্ত্তব্য স্থির তখনই হইল।

প্রকাশ্যে জজ সাহেবকে বলিলেন, "এবার হইতে আমি আরো বিবেচনা করিয়া তবে কোন মোকদ্দমা লইব। যে মোকদ্দমায় আসামীকে সুস্পষ্টরূপে অপরাধী বলিয়া নিজের মনে ধারণা হইবে, বা যাহাতে বাদীর কি প্রতিবাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিব, সেরূপ মোকদ্দমায় অনেক টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অন্যায়ের পক্ষে ওকালতনামা লইব না—'এ মোকদ্দমায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিব না' বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিব। তবে আপনি ত জানেন যে প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ থাকিলেই যে মোকদ্দমা সত্য হয় এমন নহে।"

অনাথবন্ধু জজ সাহেবকে খুব বিনীতভাবে সেলাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি উকীলদিগের পুস্তকালয়ে ফিরিয়া আসিলে অনেকগুলি উকীল কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জজ সাহেব কেন ডাকাইয়া ছিলেন ও এতক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সরকারী উকীল বাবুরই তখন সর্ব্বাপেক্ষা পসার অধিক। তাঁহার কবল হইতে আসামী বাঁচিয়া যাওয়ায় তিনি চটিয়াছিলেন। অনাথ বন্ধুকে শুনাইয়া বলিলেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতে কেন হইবে। খুনী মোকদ্দমায় খুনীর পক্ষে তদ্বির করায় জজ সাহেব উহাঁকে সুমধুর সম্ভাষণ করিতেছিলেন। একথা কি আর জিজ্ঞাসা করে জান্‌বার দরকার হয়!" পরে অনাথ বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন

"দেখ্‌লে ত বাবু! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কোন ফল নাই। মাঝে থেকে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ হয়ে পড়ে! অনর্থক প্রবল প্রতাপ সাহেব রাজ-পুরুষদের অসন্তোষ উৎপাদন ক'রে যে কি ফল হয় তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না; তবে উহাতে দেশ-হিতৈষিতা বা বীরত্ব যদি কিছু থাকে ত বলা যায় না!"

সরকারী উকীল বাবুর শেষ কথাগুলি ইংরাজী ভাষাতে এবং প্রথমের বাঙ্গালা কথা কয়েকটিও একটু ফিরিঙ্গি সুরে উক্ত হইয়াছিল।

অনাথবন্ধু উত্তর করিলেন, "মহাশয়! জজ সাহেব আমাকে তেমন কিছু গালি মন্দ দেন নাই। তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় আমার আজ অনেক উপকার হইয়াছে। কথা কহিতে কহিতে আমার বেশ বোধ হইয়াছে যে, যদি কোন মোকদ্দমা অসত্য বলিয়া মনে সুস্পষ্টরূপে ধারণা হয়, তবে কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমা লওয়া উচিত নহে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আসামী নির্দ্দোষ ছিল বলিয়াই মনে হয়।"

সরকারী উকীল বাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে হাসিয়া বলিলেন "ওহে! এ যে বিসমোল্লায় গলদ! আইনের নিগূঢ় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা! সত্য হউক আর মিথ্যা হউক মোকদ্দমা লওয়া এবং মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করা উকীলের কার্য্য। যার খাই তার গুণ গাই, এই হ'ল ওকালতীর মূল সূত্র। উভয় পক্ষের তর্কের সংঘর্ষে তাড়িত

প্রবাহের ন্যায় সত্যও নির্ণয় হইয়া যায়। আর তা ছাড়া সত্য নির্ণয় করিতে জজ বাধ্য। সেটা বিচারকের কার্য্য। সে কার্য্যে তোমার আমার মাথা ব্যথা কেন?"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "মহাশয় আপনার সহিত তর্ক করিতে পারি এমন সাধ্য আমার কোথায়? কিন্তু উভয় পক্ষের তর্কে সত্য নির্ণয় যে হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। মনে করুন, এক পক্ষের উকীল হইয়া আপনি বক্তৃতা করিলেন; অপর পক্ষে আমি দু কথা বলিলাম। আপনি উত্তর দিবার সময়, অসামান্য বক্তৃতা শক্তিদ্বারা আমার মিনমিনে কথাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন আমার পক্ষ সত্য এবং ধর্ম্মের পক্ষ হইলেও, আপনি যে তাড়িত প্রবাহের কথা বলিতে-ছিলেন, আপনার প্রবলতর পক্ষ হইতে সেই তাড়িত প্রবাহ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার মক্কেলের মাথায় পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবে কি না?"

বক্তৃতাশক্তির প্রশংসায় সরকারী উকীল বাবুর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতে পারেন, এই বোধে আনন্দিত হইলেন। অনাথবন্ধুর সহিত উপস্থিত তর্কে যে পরাজয় হইয়াছে তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

অনাথবন্ধু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আমার বাল্যাবধি এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সত্যাচরণ হইতেই বংশের এবং সমাজের রক্ষা হয়, এবং সেই জন্য সত্যনির্ণয় করা

সকলেরই কর্ত্তব্য; জজের উপর সে কার্য্যের ভার দিয়া—নিজেরা সমাজের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া—কোনরূপে অসত্যের প্রশ্রয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ইদানীং মোকদ্দমা পাইবার ইচ্ছা বড়ই বেশী হওয়ায় ঐ কথা যেন একটু কম ভাবিতেছিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবন-সংগ্রাম।

ষড়্‌দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

দায়রার মোকদ্দমাটিতে জিত হওয়ার পরে অনাথবন্ধু ফৌজদারীতে ছোট খাট দু একটি মোকদ্দমা প্রায় প্রতি-মাসেই পাইতে লাগিলেন। কিন্তু জজ সাহেবের মুখে কমিশন দেওয়ার কথায় যে একটু আশা হইয়াছিল তাহা সত্বরেই ত্যাগ করিতে হইল। জজ সাহেব ওটা "কথার কথা" হিসাবে বলিয়াছিলেন। অনাথবন্ধুর বিশেষ উপকার করিবার জন্য তাঁহার কোনরূপ আগ্রহ হয় নাই এবং তাঁহার কথায় যে অনাথবন্ধুর মনে আশার উদয় হইবে এবং সেই আশা-ভঙ্গে যে একটু কষ্ট হইবে, "নেটিব" সম্বন্ধে অত কথা তিনি মনে রাখেন নাই। কমিশনাদি পূর্ব্বমত অন্যান্য লোকেই পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কেন যে তাঁহারাই পান—অন্যে পান না—অনাথবন্ধুর তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি ছিল না।

অনাথবন্ধু ওকালতী ব্যবসায়ে কোন মাসে দশ কোন মাসে কুড়ি টাকা রোজগার করিতে লাগিলেন। কোন মাসে

বা কিছুই পান না। এরূপ অবস্থায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া পড়েন, কার্য্যপ্রবণতা কমিয়া যায়—হাত পা যেন গুটাইয়া আইসে। এই দোষের পরিহার জন্য অনাথবন্ধু পিতার পরামর্শানুসারে উকীলদিগের পুস্তকাগারে বসিয়া আইনের পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহার 'ডি এল' পরীক্ষা দিবার কল্পনা স্থির হইল।

এতদ্ভিন্ন, তিনি মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজের তেমন আয় না থাকায় অধ্যক্ষেরা প্রায়ই লেখকদিগকে উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক দিতে পারেন না। কেহ বা দিবার নামমাত্র করেন—দিতে পারেন না; কেহ বা টাকাটা সিকেটা কখন কখন দিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা খবরের কাগজে লিখিয়া অনাথবন্ধু মধ্যে মধ্যে দু এক টাকা পাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নিজের রচনা সংবাদ পত্রাদিতে মুদ্রিত দেখিলে যে কেমন একটু বিশেষ সুখ হয় এবং কোন বিষয়ে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান মনের মধ্যে যে সুশৃঙ্খল ও সুপরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, তাহাকেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রধান পুরস্কার বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন।

ইংরাজী কাগজে লিখিবার ইচ্ছা অনাথবন্ধুর মনে একবারও উদয় হয় নাই এরূপ নহে, কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর সার ধন সর্ব্বত্র হইতে পাইতেছেন—তাঁহার ভাষা আজ সকল জীবন্ত ভাষার

উপরে উঠিয়াছে। নিজের ক্ষীণ মাতৃভাষার পরিপোষণ চেষ্টা না করিয়া ওরূপ প্রবল বিদেশীয় ভাষার সেবা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক ও অনুচিত। তবে যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যুগপৎ আন্দোলন হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রের উপযোগিতা তিনি সুস্পষ্টই স্বীকার করিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেন—"এ দেশে ওরূপ ইংরাজী কাগজে খানিকটা করিয়া হিন্দী থাকা উচিত। হিন্দীর প্রচার বড়ই হিতকর।"

ওকালতীর আয়ে পরিবারের কোন সাহায্য হয় না দেখিয়া, অনাথবন্ধু একজন ভদ্রলোকের বাড়ী ছেলে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা করিয়া ছোট আদালতের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয়কে পড়াইয়া অনাথবন্ধু মাসিক ২০৲ টাকা পাইবেন এরূপ স্থির হইল।

ঐ ছাত্রদের মধ্যে বড়টির নাম ভোলানাথ ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়টির নাম বিনোদ বিহারী; সেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। এই নূতন কার্য্যে অনাথ বন্ধু খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। ছেলে দুইটীকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত একাগ্র হইল।

অনাথবন্ধু জানিতেন যে, বড় মানুষের ছেলেরা মাহিনা করা বাড়ীর মাষ্টারদিগকে স্বল্পই সম্মান করে; এবং ইহাও জানিতেন যে, শিক্ষকের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা

কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ভয় এবং ভক্তি দুইটি ভাব পরস্পরের অধিক দূরবর্ত্তী নয়। ছেলেদের যাহার উপর ভয় নাই তাহার উপর ভক্তিও থাকে না।

তিনি প্রথম দিনেই জজ বাবুকে বলিলেন, "আপ- ছেলেরা যাহাতে সুশীল এবং সুশিক্ষিত হয় তজ্জ যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু ছেলেরা যদি ... না শুনে, কি আমাকে অমান্য করে, তা ... দিগকে কে মারিবে?"

জজ বাবু বলিলেন, "... বলে আপনি যথেষ্ট মারপীট করিতে পা... পত্তি করিবে না। আর আপনার এই ... আমার সম্পূর্ণ ভরসা হইতেছে যে; ছেলে ... তে ভাল হইবে। সলোমন বলিয়া- গিয়া ... বেত্রাঘাতে ছেলে খারাপ হয়।"

... বলিলেন, "আমাদের চাণক্যও যথাকালে ছেলে ... ড়না করিতে বলেন।"

... ক ওকালতীর জন্য আলীপুরেই দিনের বেলা অধি... সময় থাকিতে হইত। কিন্তু সেখানেও সময় বৃথা ... ইত না। আইনের বই পড়া, সংবাদপত্র পড়া, বাঙ্গা... বন্ধ লেখা প্রভৃতি কার্য্যেই সময় কাটিত।

... অনাথবন্ধুর মাতার কঠিন পীড়া হয়। এত কার্য্য ... বন্ধু মাতার সেবায় যথেষ্ট যত্ন করিতে অবসর ... ফলতঃ কাজের লোকদিগের সময়ের অসদ্ভাব হয় লোকদিগের স্নান আহারেরও সময় জুটে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষক ও ছাত্র।

প্রাচেতসো মুনিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং,
যৎপাবনং রঘুপতেঃ প্রণীনায় বৃত্তং।
ভক্তস্য তস্য সমরঃ মত মেহপিবাচঃ,
তৎপ্রত্যাসন্নমনসঃকৃতিনা ভজন্তাং।
প্রতি মন্বন্তরং ভূতৈর্গীয়মানচরিষ্যতঃ,
প্রাতঃ পবিত্রং লোকানামিয়ং চরিত্রপঞ্জিব

অনাথবন্ধুর দ্বিতীয় ছাত্রটিকে বাঙ্গালা পড়াইতে পড়াইতে একদিন মনে হইল যে, সাবেক কালের পাঠশালে ছেলেদের যে দাতাকর্ণ প্রভৃতি এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়ান হইত, তাহাই এ দেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট শিক্ষার পদ্ধতি। বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারতের বীরচরিত্র গুলির কথা মনে বসিলে চরিত্র সুগঠিত হয়।

অনাথবন্ধু নিজে শিশুবোধক রামায়ণাদি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, আজকালকার পাঠ্য পুস্তকের গর্দ্দভ, বাঁদর প্রভৃতির বিবরণ ছাড়া দু একখানি ভাল বই ছাত্রদের দেখিতে দেন।

দুইটি ছাত্রের জন্য "শিশু রামায়ণ" ও "শিশু মহাভারত" কিনিয়া আনিয়া দিলেন। বলিলেন "এই দুইখানি তোমরা পড়িও। এ ছাড়া পদ্যে বড় রামায়ণ ও মহাভারত একটু একটু করিয়া আপনারা পড়িয়া ফেলিবে।"

ভোলানাথ দু দিনের মধ্যে "শিশু রামায়ণ" খানি পড়িয়া শেষ করিল। তখন অনাথবন্ধু "শিশু রামায়ণ" হইতে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃত অংশ ভোলানাথকে বারবার পড়িতে উপদেশ দিলেন।

—"বালকের পক্ষে জন্মদাতা এবং শিক্ষা দাতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করা এবং ভাই ভগিনীর প্রতি এমনি সস্নেহ ব্যবহার করা যে যাবজ্জীবন কখন পরস্পরের প্রেম বন্ধন শিথিল না হয়, যৌবনে কোন একটী গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের অভিলাষ মনে মনে পোষিত করিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যথারীতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে অগ্রবর্ত্তী হওয়া এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নিজ হস্তে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রভুশক্তির একপে নিয়োগ করা যে তদধীন সকলেই সুখী হইতে পারে, এই সকল বিষয় রাম চরিতে অতি সুপরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, কি বাল্য, কি যৌবন, কি প্রৌঢ়, সকল বয়সেই বিনীত, নির্ভীক এবং সত্যনিষ্ঠ হইতে হয়, এই কয়েকটি কথাও রামচরিত হইতে দৃঢ়রূপে শিখিতে পারা যায়। আর সকল ধর্ম্মের সার কথা অন্যের শুভ উদ্দেশ্য করিয়া এবং বিধি প্রতিপালন করিয়াই চলিতে হয়, নিজের সুখ দুঃখে উদাসীন হইতে হয়, ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয়।"

পড়া শেষ হইলে অনাথবন্ধু বলিলেন, "দেখ! তুমি বড় লোকের ছেলে, তোমার মূর্খ হওয়া বড়ই বিসদৃশ হইবে।

লোকে বলিবে এত বড় লোকের বংশে কি মূর্খই জন্মিয়াছে! তুমি বিদ্বান্ হইলে তোমার পিতার মুখ উজ্জ্বল হইবে—তাঁহার পরম পরিতোষ হইবে। খুব পড়া শুনা করিব—খুব বিদ্বান্ হইব—ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য কর। চাণক্য শ্লোকে আছে,—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনংসর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।

এই শ্লোকটি মুখস্থ রাখিও।”

অনাথবন্ধু শ্লোকটির মানে বুঝাইয়া দিলেন।

এইরূপ উপদেশ দিয়া অনাথবন্ধু ভাবিলেন “আমার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি? ধনার্জ্জনের ইচ্ছা খুবই প্রবল হইয়াছে। ধনার্জ্জন না হওয়ায় সাংসারিক অসুবিধা ঘটিতেছে। কিন্তু ধনার্জ্জনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে বড়ই ছোট উদ্দেশ্য হইবে। এইমাত্র ছাত্রকে পড়িয়া শুনাইলাম যে জীবনের উদ্দেশ্যটি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। আমি বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণ করিব। সে কার্য্য করিতে গেলে ইংরাজী বিজ্ঞান ও ইতিহাস এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করা আবশ্যক—আমি ঐ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইব।”

কিন্তু তখনি নিজের সামান্য ক্ষমতার কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন,” “আমি আবার লেখক হইব আর তাহাতে আবার ভাষার পুষ্টি হইবে!”—কিন্তু অভ্যস্ত কার্য্য-প্রবণতা গুণে অনাথবন্ধুর মন অধিকক্ষণ দমিয়া রহিল না।

মনে হইল, "আমার লেখা যদি স্থায়ী হইবার উপযুক্ত না হয়, নাই হইল! আমি ব্যারিষ্টার বোসের ন্যায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিব না বলিয়া ত ওকালতীর ইচ্ছা ত্যাগ করি নাই! ক্রোরপতি হইতে পারিব না বলিয়া ত ধনার্জ্জন ইচ্ছা ছাড়ি নাই! চিরস্থায়ী পুস্তক লিখিতে পারিব না বলিয়া কি মাতৃ ভাষার চর্চ্চা পর্য্যন্ত করিব না?"

আরও মনে হইল, "খবরের কাগজে একটু যত্ন ও চিন্তা সহকারে লিখিলেও ত উপকার আছে। দুই দিনে খবরের কাগজখানি মসলা বাঁধা কাগজে পরিণত হইবে সত্য, কিন্তু কোন ভাল কথা যদি দশজন পাঠকের মনে এক মিনিটের জন্যও ভাল লাগে তাহাতেই কি কম উপকার হইল? "বঙ্গবাসী" দেশীয় শিল্প রক্ষার জন্য বলিয়াছিল যে, দেশীয় শিল্পজাত বৈদেশিক জিনিসের অপেক্ষা দেখিতে নিরেশ হইলেও আপনার পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতির ন্যায় অবশ্য পোষ্য। সেই সুন্দর কথাটি কি কেহ কেহ যাবজ্জীবনের লক্ষ্য করিয়া ফেলেন নাই? সকল কার্য্যের ফলই চিরস্থায়ী বলিয়া ত শুনিয়াছি এবং বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি! আর সৎ চেষ্টার ফল ত অন্ততঃ পরজন্মেও পাওয়া যাইবে।"

——x——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কন্যা ও পুত্রবধূ।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

অনাথ বন্ধুরা তিন ভাই এক ভগিনী। ভাই দুইটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভগিনীটী সকলের ছোট, নাম "নলিনী"। তিন বৎসর হইল উহার বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় শ্বশুর বাড়ী।

একমাত্র কন্যা নলিনীকে সুপাত্রে দান করিবার জন্য অনাথ বন্ধুর পিতা অনেক দিন ধরিয়া পাত্রান্বেষণ করিয়াছিলেন এবং শেষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। —"অনাথ বন্ধু মানুষ হইয়া উঠিতেছে, আমার অবর্ত্তমানে সেই কোন প্রকারে সংসার চালাইতে পারিবে" ইহা মনে করিয়া তিনি সঞ্চিত তিন হাজার টাকার প্রায় সমস্তই ঐ বিবাহের খরচে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।—"এখন সমাজে যেরূপ নিয়ম পড়িয়াছে তাহাতে সচ্ছল ঘরে এবং সুপাত্রে কন্যা দিতে গেলে খরচ করা একান্তই আবশ্যক। আমরা তিন ভাইয়ে উপার্জ্জন করিলে টাকা আবার হইবে, কিন্তু নলিনী ভাল ঘরে না পড়িলে তাহার জন্য শোধ দুঃখ ও

আমাদের চিরকাল মনস্তাপ ঘটিবে।” এই কথা বলিয়া অনাথবন্ধুই এরূপ অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে মাতার আপত্তি খণ্ডন করেন। অনাথ বন্ধুর মাতা বলিয়াছিলেন, “যাহাতে সমস্ত সঞ্চিত অর্থ যায় সে কাজ করা কি ভাল?”

এক কন্যার বিবাহে প্রায় সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি ব্যয় করা সাধারণতঃ অসঙ্গত হইলেও অমন ভাল ছেলে এবং ভাল ঘর হাত ছাড়া করিতে অনাথবন্ধুর পিতার ইচ্ছা হইতে ছিল না। এ দিকে পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীর বার বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইল।

নূতন আইনের দোহাই দিয়া কন্যাকে বড় জোর বার বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা যায়, তাহার অধিক দিন রাখা বাল্য-বিবাহের একান্ত পক্ষপাতী রামজয় চট্টোপাধ্যায় কোন মতেই সঙ্গত মনে করিলেন না। শীঘ্রই বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, সুপাত্রও পাওয়া গিয়াছে,—কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় না করিলেও বিবাহ দেওয়া ঘটে না—এ অবস্থায় কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। উপযুক্ত পুত্রের কথায় মাতা পিতা উভয়েরই মনে শান্তি সুখ আইসে এবং তাঁহারা তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

এখন নলিনী পনর বৎসরে পড়িয়াছে। জামাইএর নাম আনন্দ নাথ—এইবারে বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় জাহাজী আফিসে ক্যাশিয়ারি কাজ করেন এবং নিজেও একটা চালানী কারবার

করিয়া থাকেন। কারবারে খুব লাভ হয়। হালের বড় মানুষ—কলিকাতায় আট দশ খানি বাড়ী ও দক্ষিণ দেশে এক খানি তালুক হইয়াছে।

বিবাহের পর হইতেই নলিনী অধিকাংশ সময় শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। মাতার বেশী অসুখের সময়ে বাপের বাড়ী আসিয়াছে এবং মাতার খুব সেবা ও যত্ন করিতেছে। এখন সেই রন্ধন করে। অনাথ বন্ধুদের বাড়ীতে এক ঝি ভিন্ন অন্য চাকর চাকরাণী নাই।

এক বৎসর হইল অনাথ বন্ধুর বিবাহ হইয়াছে। বৌটির নাম মহামায়া, বয়স ১১ বৎসর।

রামজয় স্থির করিয়াছিলেন যে, বার বৎসর পার না হইলে, এখন আর মেয়ে পাঠান কি বৌ আনা ভাল নয়। কিন্তু পত্নীর অধিক অসুখের সময় তাঁহার বৌ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় এবং সেবা শুশ্রূষার কতক সাহায্য জন্যও বৌ আনিতে হইয়াছে।

অনেক দিন ধরিয়া কবিরাজী চিকিৎসার পর অনাথ-বন্ধুর মাতা ক্রমশঃ একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অনাথ বন্ধুর মাতা কন্যা নলিনীকে বলিতেছিলেন, "বড় ব্যারাম হয়েছিল বলেই মাকে আমার দু মাস দেখিতে পাইতেছি। আজ কদিন ধরে উঠে বস্‌তে পার্‌ছি। আর কি তোমাকে দেখ্‌তে পাব? শীঘ্রই বোধ হয় তোমার শাশুড়ী তোমাকে নিয়ে যাবেন।"

নলিনী একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া রোগে শীর্ণা মাতার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মাতা বলিতে লাগিলেন, "তুমি শ্বশুর বাড়ী গেলে বৌমা একা পড়্‌বে। আজ বল্‌ছিল যে, এখন রাঁধিতে শিখিয়াছে—আমাকে আর কখন রাঁধিতে হইবে না। সব রকম কাজ শিখিবার জন্য যেন পাগল। তোমার কাছে সেলাই শিখ্‌ছে। আর বড় ইচ্ছা যে তোমার মতন মুখে মুখে সব রকম হিসাব কর্ত্তে শেখে।"

নলিনী বলিল, "বৌ সময় পেলেই শ্লেট নিয়ে ধরে ধরে লেখে। দাদা একদিন হেসে বলে ছিলেন যে, লেখার সৃষ্টি হয়েছে পড়্‌বার জন্য। সেই অবধি চেষ্টা করে হাতের লেখা অনেকটা ভাল করেছে। অক্ষরের ধরণটা অনেকটা দাদার অক্ষরের মতনই করেছে। ওর হিসাব শিখ্‌তে দেরী হবে। একশ-র বেশী গুন্‌তে জানে না। আমাদের বাড়ীতে যেমন করে শেখান হয়, তেমন কজনে জানে, না করে।"

নলিনীর মাতা বলিলেন, "ওঁর কাছে তুই যেমন শুভঙ্করী শিখেছিলি, অনাথ বলে, অনেক ডাগর ডাগর পাশ করা ছেলেও তাহা জানে না।"

নলিনীর মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল। মনে পড়িল যে, তাহার শাশুড়ীর প্রশ্নে স্বামী আনন্দনাথ তাহার সাক্ষাতে কাগজ ও পেন্‌সিল লইয়া একটা সাংসারিক বিষয়ের হিসাব করিয়াছিলেন। নলিনী তাহার অগ্রেই তাহা মুখে মুখে করিয়াছিল। কিন্তু নিজের বাহাদুরী প্রকাশে

নৈসর্গিক সংকোচ বশতঃ এবং স্বামীর পাছে লজ্জা হয় এই ভয়ে, নিজের হিসাব করার কথা কাহাকেও বলে নাই। মনে করিয়াছিল যে সবাই কি, "বাবার মত অত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ছেলে মেয়েদের শিখাইতে জানেন!"

—নলিনী প্রকাশ্যে বলিল, "আমাদের বৌকে তার বাপের বাড়ীতে রান্না, সেলাই, হিসাব কিছুই না শিখাইয়া —এখন কলিকাতায় যেমন চলন হইয়াছে—কেবল কার্পেট বোনা, একটু ইংরাজী পড়া আর গোটাকতক খৃষ্টানী গান শিখান হইতেছিল। আমাকে যখন তুমি দুমাস মেমেদের কাছে সেলাই আর কয়েক রকম রেসমের বোনা শিখাইয়াছিলে, তখন তুমি কাছে উপস্থিত থাকিতে, আর বাড়ীতে গান হওয়া বাবা দেখিতে পারেন না বলিয়া খৃষ্টানী গান বন্ধ করিতে। ওরা খৃষ্টানীর কথা তুলিলেই বলিতে 'এই দেখ উল বোনার সেই ফাঁশটা ভুলিয়া গিয়াছি—মেম! সেইটা আবার একবার দেখিয়ে দাও না।' দিন কতক বাদেই মেম সব বুঝিতে পার্‌লে; তখন মিছে খাটুনি বাড়িয়ে কি হবে বলে আর খৃষ্টানী কিছু বলিত না। একদিন হেসে হেসে আমাকে বলিয়াছিল, সত্যি সত্যি কি তোমার মার এত ভোলামন, না, আমাদের ধর্ম্মের কথা হলেই উনি উলের ও রেসমের সব কাজ ভুলে যান, আর ফিরে শেখ্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি পড়ে, ?"

এই সময়ে মলের শব্দে জানা গেল যে বৌ রান্না ঘরের দিক হইতে আসিতেছে।

নলিনী বলিল, "ওর তরকারি এক এক দিন বাবা খুব ভাল বলেন, কিন্তু ভাত রাঁধিতে এখনও শেখে নাই, মাজ থাক্‌তেই বল্লে 'এর বেশী হলে গলে পাঁক হয়ে যাবে। মা খেতে পার্‌বেন না।'—ওর ইচ্ছা যে আমি যোড়াসাঁকোয় গেলে ভাতের হাঁড়ি নামাইবার জন্যও কাহাকে ডাকিতে না হয়। আজ আমি বৌকে বলিলাম 'মা বেশ সারিয়া না উঠিবার আগেই যদি আমাকে যেতে হয় তবে দাদারা কেউ একজন ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া দিবেন।' ওর তা ইচ্ছা নয়।—"আমি ত পারি,— এই বলে ভাতের হাঁড়ি নামাইবার জন্য 'আমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে হাতে একটু ছেঁকা লাগিয়েছে।"

বৌ আসিয়া ননদের গা ঘেঁসিয়া বসিল এবং হাতে ছেঁকা লাগার কথা বলিয়া দিতেছে শুনিয়া,ননদকে অলক্ষ্যে একটা চিমটি কাটিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে,ও কথা মাকে বলিতে বার বার বারণ করিয়াছিল।

অনাথবন্ধুর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখি মা কত লেগেছে। তুমি ভাল ঘরের মেয়ে। শীঘ্রই রাঁধ্‌তে পার্‌বে। বুড় শ্বশুর শাশুড়ীকে তুমিই ত খাওয়াইবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন মা! তোমার হাতে লেগেছে শুন্‌লে তোমায় শ্বশুর কত দুঃখ কর্‌বেন। বামুন কি বাম্‌নীর হাতে খাইতে ভাল বাসেন না তবু এখন একজন রাঁধুনি রাখ্‌বার কথা তুল্‌বেন।"

নলিনী বৌয়ের চিমটিতে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিল এবং মাতার কথায় বিশেষ ব্যস্ত হইয়া বলিল "বাবাকে কোনমতে বলিও না। আমিত কখন হাত পোড়াই না, তবু তিনি আমাকেও সব্ রান্না রাঁধ্‌তে দিতে চাহেন না।—আর ছেঁকা তেমন বেশী নয়। নারিকেল তেল ও চূণে লাগিয়ে দিয়েছি,—সেরে গ্যাছে।"

বৌএর কাপড়ের ভিতর হইতে হাতটি বাহির করিয়া দেখিবার জন্য নলিনীর মাতা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সেজন্য বৌকে নিকটে আসিতে বলিলেন—কিন্তু বৌ দেরী করিতে লাগিল।

এমন সময় নলিনীর শ্বশুর বাড়ী হইতে ঝি আসিল—উপস্থিত সব কথা থামিয়া গেল, নচেৎ বৌএর হাতে অল্প একটু ফোস্কা উঠিয়াছে দেখিয়া নলিনীর মাতা দুর্ব্বল শরীরে বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং আপনি অশক্ত হইয়া পড়ার জন্য আরও অধিক খেদ করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:◯*◯:•—

কুটুম্বতা।

নারীনাং দর্শনং প্রায়োঽক্ষমং সর্ব্বদিগীক্ষণে।
অতস্তাঃ সর্ব্বদা লোকেঽযোগ্যাঃ কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মণি॥

বেহাই বাড়ীর ঝিকে দেখিয়াই নলিনীর মার মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহার বেয়ান নলিনীকে তাহার বাপের বাড়ীতে রাখিতে ভাল বাসেন না। বৌকে খুব যত্ন করেন, এবং বৌ তাঁর নিজের কাছে সর্ব্বদা থাকে, এই ইচ্ছাই করেন।

নলিনীর মায়ের বাড়াবাড়ি ব্যারামের মধ্যেই তাঁহার শাশুড়ী একবার বৌ লইয়া যাইবার জন্য ঝি পাঠাইয়া জিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু নলিনীর শ্বশুর তাহা শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করায় তখন বৌ লইয়া যাইতে পারেন নাই।

নলিনীর মা পথ্য পাইয়া অবধি কেবল ভাবিতেছিলেন, এই বারে বেয়ান নলিনীকে লইয়া যাইবেন। তখনও তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল থাকায় মনও সহজে ব্যাকুল হইতেছিল।

সহজ অবস্থায় মনে করিতেন—'যখন মেয়েকে জামাই,

বেয়ান ও বেহাই সকলেরই মনে ধরেছে, তখন আর কন্যা সম্বন্ধে অন্য প্রার্থনীয় কিছুই নাই। সময়ে ছেলে মেয়ে হোক, সকলে সুস্থ ও সুখে থাক। মেয়ে ত আর কাছে থাকিবার জন্য হয় না। —বেয়ান যে নলিনীকে আমার কাছে একবারও পাঠান না, তাহাতে দুঃখ করিব না।'

এখন অসুস্থ অবস্থায় সেরূপ মন ছিল না। এখন সহজেই দুঃখের আবেগে অবশ হইয়া পড়িতেন।

নলিনীর মা অনেক চেষ্টায় বেয়ানের ঝির সাক্ষাতে চক্ষে জল আসা নিবারণ করিলেন, এবং ঝি সন্দেশের হাঁড়ি এবং বেদানা আঙ্গুর মিছরি প্রভৃতি রোগীর উপযোগী আহার্য্যের ডালা নামাইলে, বাড়ীর সকলে কেমন আছেন, একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ঝি বলিল, "আহা! সে রং সে শ্রী সব গিয়াছে! শরীর আধখানি—রং কালি! সেবারে এসে যে রকম দেখে গিয়াছিলাম, মনে কর্‌তেও ভয় হয়। তবু উঠে যে বস্‌তে পেরেছেন, এই আমাদের ভাগ্যি। তোমার অসুখে তোমার বেয়ান সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এক দিন দেখ্‌তে আস্‌বেন বলে সব ঠিক হয়েছিল। তবে তাঁরও ত শরীর ভাল নয়। দেখ্‌তে মোটা সোটা হলে কি হয়। সুখী মানুষ গায়ে ত এক কড়ার বল নাই! আর অত বড় গৃহস্থ! নানান্ ঝঞ্ঝাট! আস্‌তে পার্‌লেন না। সে জন্যে কত দুঃখ কর্‌ছিলেন।"

কুটুম্বতা।

ঝিকে বসিবার জন্য বালান্দে মাদুর পাতিয়া দেওয়া হইল। কলিকাতার বড় মানুষের বাড়ীর অনেক কালের ঝি। তাহার গলায় দানা। পরণে তসর।

ঝিকে মুখে হাতে জল দিতে বলা হইল। কলের কাছে মুখে হাতে জল দিতে দিতে ঝি দেখিল যে, তাহার জলযো-গের ব্যবস্থা হইতেছে। পরে তাহার জন্য আনীত কচুরি দুই খানা, ভাল রসগোল্লা দুইটা, সন্দেশ দুইটী ও কমলালেবু একটা উদরস্থ হইয়া গেলে ঝির মনটা বেশ সুস্থ হইল।

ঝি বলিতে লাগিল. "দেখ কলিকাতায় না হইলে কুটুম্বি-তায় সুখ নাই। সে দিন জগদ্দলে বাবুর ভগিনীপতির বাড়ী গিয়াছিলাম। সে আবার রেল থেকে প্রায় আধ ক্রোশ হেঁটে যেতে হয়। সে দেশের লোকে কি খেতে পায়, না খেতে জানে! সন্দেশগুলা যেন চিনির ঢেলা। এখানে ট্রামগাড়িতে এসে একবারে দোয়ারের কাছে নামিলাম। কোন কষ্ট নাই। আবার এখনি ট্রামগাড়িতে চলিয়া যাইব।"

গিন্নি বলিলেন, "হাঁ কলিকাতায় অনেক সুবিধা বই কি। কিন্তু তুমি এখনই যাবে কি বলে? স্নান কর, ভাত খাও, একটু সুস্থ হও। ছেলেদের স্কুলের ভাত হয়েছে। দেরী হবে না।"

ঝি সন্তুষ্ট হইল, বলিল "এদিকে তোমার বেয়ান যে বৌ বৌ করে একেবারে হেদিয়েছেন। আমাকে আজ সকালে বলছিলেন যে, 'দরওয়ান ও সরকার আর বাড়ীর গাড়ি

নিয়ে যাও, বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।' কর্ত্তা বল্লেন, 'আজ ঝি একবার বেয়ানকে দেখে আসুক আর বলে আসুক; কাল দিন ভাল। ওঁদের মত হলে কাল আনা যাবে। বেহাই দিন ক্ষণ বাছ্‌তে ভাল বাসেন, আর অমন সজ্জন, এক দিনের জন্যে তাড়াতাড়ি করে কাজ নাই।' তা তোমার বেয়ানও বল্লেন, 'দিনক্ষণ বাছ্‌তে হবে বই কি? কাল যদি খুব ভাল দিন, তবে কালই আনা ভাল। তবে এক সহরের ভেতরে বলেই আজকের কথা বলছিলুম।' তার পর আমাকে বল্লেন, 'তুই এখনই যা। বেয়ানকে বলে আয়।'—কি জান, তোমার বেয়ানের বৌ-অন্ত প্রাণ। এক দণ্ড চখের আড়ালে রাখ্‌তে পারেন না। তা হবেই ত, ঐ এক ছেলে এক বউ, তাঁর ত আর নেই। আর বৌও যেমন রূপে, তেমনি গুণে, তাঁর ছেলের উপযুক্তই

নলিনীকে লইয়া যাইবার কথায় মায়ের চক্ষে জল আসিয়াছিল। ঝির মুখে মেয়ের প্রশংসায় সুখী হইলেন; বলিলেন, "এখন বেয়ানই নলিনীর মা। তাঁর কাছে বই আর কোথায় থাক্‌বে। রোগে পড়ে মাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হয়েছিল। তা মা আমার এসে যতদূর সেবা কর্‌বার কোরেছে!—আমিও যা' হোক্ অনেকটা সেরেছি, এখন আবার তাঁর জিনিস তিনি কাছে রাখিবেন।"

সে দিন ঝিয়ের খুব সমাদরে আহারাদি হইল।

নলিনীর মা বলিলেন, "উহাঁদের একেবারে বলিয়া দেওয়া আছে যে, বেয়ানের ইচ্ছা মাত্রেই তাঁহার বৌ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। বেয়ান যে দিন বলিবেন, সেই দিনই পাঠাইব। তবে আনন্দের পরীক্ষা কাল শেষ হইয়াছে, শুনিতেছি। ইচ্ছা হইতেছে যে, যদি বাঁচিয়াই উঠিলাম, ঝি জামাইকে দু দিন এখানে দেখি, তার পর নিয়ে যাবেন। যদি মত হয়, আনন্দকে আজ বিকালে পাঠাইয়া দিবেন। বেয়ানকে আমার এই কথাটা একটু ভাল করে বোলো। বেহাইকে বলিবার জন্য অনাথকে পাঠাইয়া দিব।"

ঝি বলিল, "তাত বটেই—বল্‌ব বই কি—দাদা বাবুকে অবশ্য পাঠিয়ে দেবেন।"

নলিনীর শ্বশুর যে আফিসে কাজ করেন, তথায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অনাথবন্ধু মাতার প্রার্থনার কথা জানাইলে, নলিনীর শ্বশুর বলিলেন, "আচ্ছা বাড়ী গিয়া আনন্দকে বলিব। ক দিন পরীক্ষার খাটুনি গেছে, যেতে পার্‌বে কিনা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে তোমার সহিত একবার আনন্দের দেখা হ'লে ভাল হয়। কেমন পরীক্ষা দিলে, বেশ করে জেনে নিয়ে আমাকে বোলো।"

নলিনীর শ্বশুর খুব ঠাণ্ডা লোক। পরিশ্রম ও ক্ষিপ্রকারিতা গুণে তেজারতী ও মহাজনী কারবারে নিজেই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু উন্নতির মূল সাহেবদের আফিস ছাড়েন নাই। আজও নামে কেরাণী। একান্ত

আনন্দনাথের পিতা বন্ধুর কথায় সুখী হইলেন, বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় আনন্দকে আপনাদের সারদা বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি আজ সকালে বেড়াতে এসে ব'লে গেলেন যে, যে রকম লিখেছে, তাহাতে পাস হবে, তবে খুব ভাল হবে না। আনন্দ নিজে বল্‌ছে যে, পাস হবে না, কিছুই ভাল লিখিতে পারে নাই। কিন্তু সারদা বাবু বলিলেন যে 'আনন্দের মনের মত ভাল লেখা না হলে যদি পাস না হয়, তবে কাহাকেও পাস হইতে হয় না। ওর খুঁত খুঁতে মন। ভাল লেখা বল্‌তে ও প্রকৃত নিখুঁত ভাল লেখার কথা ভাবে, অর্থাৎ 'ভাল' যে কি হওয়া উচিত, তাহার একটা জ্ঞান আছে। ও সেই জন্যে কখনই 'ভাল হইয়াছে' বলিতে পারে না, অথচ অনেকের চেয়ে ভাল হয় বলিয়া পাস হয়—কতক পাস ত করিতেই হইবে। অন্য কত ছেলে বলে, 'হাঁ মন্দ লেখা হয় নাই, পাসের মতন হবে।' আর পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই দেখা যায় ফেল হয়েছে। ও তেমন নয়।'—সারদা বাবু ত এইরূপ সাহস দিলেন, কিন্তু আমার এখনও ভয় ভয় করিতেছে।"

বন্ধু বলিলেন "আমাদের সারদা যখন পাস হবে বলেছে, তখন পাস হবে। অমন বুদ্ধিমান ছেলে দেখা যায় না। কখন কোন পরীক্ষায় প্রথম বই দ্বিতীয় হয় নাই।"

এ দিকে নলিনীর শাশুড়ী ঝিএর কাছে বেয়ানের প্রার্থনায় নিজের মতলবের বিপরীত কথা শুনিয়া বিরক্ত

হইয়া বলিলেন, "আহা! বেয়ান আমার কতই জানেন। কেন কাল বিকালে আনন্দের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে—ওঁর সব কালেজে পড়া ছেলে রয়েছে—ওঁর ত সে কথা জানা ছিল। তবে আমার লোক যাবার পর উল্টো চাপ না দিয়া একবার কাল বিকালে সোয়ামীকে কি ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠাতে পারেন নি। আনন্দ আমার কদিন ভাল করে খেতে পায় নি। রাত্রি দিন পড়ে রোগা হয়ে গেছে। এখন ওঁর বাড়ী কি খেতে পাঠাব।"

নলিনীর শাশুড়ী মন্দ লোক নহেন, কিন্তু নিজের মতলব না চলিলেই বিরক্ত হন, আর কুটুম্বের উপর একটু "সতেজ" ব্যবহার করিতে হয় বলিয়াই শিখিয়াছেন।

নলিনীর শ্বশুর আফিস হইতে আসিবামাত্র নলিনীর মাতার প্রার্থনার কথা গিন্নির কাছে পুনর্ব্বার শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "কি বল? বেহানের ইচ্ছা ত অসঙ্গত বোধ হয় না। দু দিনের জন্য আনন্দ শ্বশুর বাড়ী যাউক না কেন? শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে আসুক।"

গিন্নির রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—"তোমার কথায় বৌ পাঠিয়ে দিয়াছি। ঝি এসে যা বল্লে, তাতে বোঝা গেল, অসুখ টসুখ এখন কিছুই নাই। বেস বসে রয়েছে—হাস্‌ছে, কথা কইছে। এখন বৌ আনার বদলে ছেলে পাঠাতে হবে!"

কর্ত্তা বলিলেন, "আনন্দ সেবারে যখন গিয়াছিল, তখন

ওর শাশুড়ীর বড়ই সঙ্কটাপন্ন ব্যারাম, এখন সারিয়া উঠিতেছেন, একবার না যাওয়া অভদ্রের কাজ হইবে। আমি বেহাইকে অনেকবার বলিয়াছি যে, পরীক্ষার সময় বলিয়া আনন্দকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, নহিলে এত বড় ব্যারামে তাহারও আসিয়া সময়ে ঔষধাদি দেওয়ার জন্য ছেলেদের সঙ্গে রাত্রি জাগরণে সাহায্য করিবার কথা। ছেলেকে দু-দিনের জন্য পাঠাইয়া দাও। দেখ ভাল কর্ম্ম করিলে কখন কোন ক্ষতি হয় না। তুমি বেয়ানের অসুখের সময়ে বৌ পাঠিয়ে দিলে, তাইতেই হয় ত ছেলে পাস হবে।”

গিন্নি বলিলেন, “তুমি বই ছেলের নিন্দে আর কেহ করে না। বিবাহ দেওয়ার আগেও পাস হয়েছে, পরেও একবার পাস হয়েছে। আবার এবারেও হবে। এতে বেয়ানের গুণ কি হোল বুঝতে পারি না। আমি দেখতুম, বাছা বই নিয়েই আছে। বৌমা যখন এখানে ছিলেন, তখনও শোবার ঘরে রাশি রাশি বই নিয়ে যেত।”

শেষের কথাটা গম্ভীরভাবে বলিতে শুনিয়া কর্ত্তার একটু হাসি আসিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

গিন্নি বলিতে লাগিলেন, “তুমিই কেবল বল্‌তে যে, পড়ায় মন নাই। এই দু-মাস ধরে বাছা সমস্ত রাত্রি জেগেছে। তা তোমার যখন জেদ উঠেছে, তখন ছেলেকে পাঠাতেই হবে। আমার কথা ত থাক্‌বে না।”

কর্ত্তা বলিলেন, “দেখ দু-মাসে ছ মাসে আমার এক আধটা কথা থাকুক। সেই বৌ পাঠানর সময় একবার

বলিয়াছি। আর এই বলিলাম। মধ্যে আর কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের গরমিল হইয়াছে কি?"

গিন্নি। "আমি ছেলের মা হইয়া অতি হীন হইয়া থাকিব; আর তিনি মেয়ের মা হইয়া যা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। তোমার এমনি বিচার বটে। বলরাম সরকারের স্ত্রী বল্‌ছিলেন 'তোমার মতন কুটুমের গোলাম কখন দেখি নাই'—আমি এই রকম লোক সমাজে অপমান সহ্য করি, ইহাই যখন তোমার অভিমত, তখন আর আমি কি বলিব?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এই বিষয়ে বলরাম সরকারের স্ত্রীর কথাটী শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছে!—ওঁর অন্য কোন কথা কি ব্যবহার কখন ভাল মনে কর কি? বলরাম সরকারের ব্যারামের সময় উনি যে রকম করেছিলেন তাতে ওঁর মন যে কত কঠিন তা কি জান্‌তে পার নাই? তবু তুমি যে দেড় বৎসর একাদিক্রমে বৌ পাঠাও নাই তাহা একান্ত অন্যায় জেনেও তোমার জেদই বজায় রাখিয়াছিলাম। বেহাই আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—'মেয়ে ডাগর হইয়াছে, পোড়ো ছেলের কাছে অত রাখিলে পড়া হইবে কি? সাবেক কালে পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেকে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হইত। পড়া শেষ ক'রে গুরু গৃহ থেকে এসে তবে বিবাহ হইত। এখন সে ব্যবহার নাই, তবু যতটা সেইদিকে থাকা যাবে ততই

ভাল। যতটা মুনিঋষিদের ব্যবস্থার বিপর্য্যয় করা যাইবে ততই লেখা পড়া শিক্ষার পক্ষে অসুবিধা। দেখাও যায় যে পোড়ো ছেলের কাছে সর্ব্বদা বৌ রাখিলে পড়া শুনা ভাল হয় না।'—বেহাই আমাকে আর কখন কিছু ও বিষয়ে বলেন নাই, কিন্তু কথাগুলি আমার মনে বসিয়া গিয়াছে। আনন্দ পাস না হলে মনে হবে আমিই উহার লেখা পড়া নষ্ট করিলাম।"

গিন্নি তর্কের অনুরোধে বলিয়া ফেলিলেন, "বার বছরের বাড়ন্ত মেয়ে কি আমি দেখে পছন্দ করে এনে ছিলাম?"

গিন্নি নলিনীকে ভাল বাসেন, কর্ত্তা যে বৌএর নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না তাহাও জানেন—তখনি আবার বলিলেন,

"আমি বৌএর নিন্দা করিতেছি না। বৌমা আমার খুব মনের মতন হইয়াছেন—কিন্তু তোমাদের ত বৌ দেখিবার সাধ নাই! বেয়ানের জিদই বড়।"

কর্ত্তা দেখিলেন আর অধিক বলায় সুবিধা হইবে না—আবশ্যকও নাই। বলিলেন, "সে কথা যাউক, বেয়ানের কথায় ক্ষুধাতৃষ্ণা যায় না। আনন্দকে বোলো যে আজ সে তাহার শ্বশুর বাড়ী যাবে। আর আমি এখন হাত মুখ ধুই—কিছু জল খেতে দাও।"

গিন্নি আর কি বলিতে যাইতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে।"

গিন্নির আর কিছু বলা হইল না। গিন্নি জানিতেন এখন সত্বরে জলযোগের ব্যবস্থা করিতে না গিয়া অন্য কোন কিছু বলিলে কর্ত্তার এত অভিমান হইবে যে সেদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াও আর কেহ তাঁহাকে জলবিন্দু স্পর্শ করাইতে পারিবে না।

—x—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং ন চৌর্য্যৈ বর্দ্ধতে হি তৎ।
ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে সাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চন॥

আনন্দনাথ শ্বশুর বাড়ী যাইতে অনুমতি পাইলেন। শ্বশুর বাড়ীর যেরূপ ধরণ বুঝিয়া ছিলেন তাহাতে বিলাতি উগ্র সুগন্ধি, চকচকে বগলশ দেওয়া জুতা, চিত্র বিচিত্র করা কামিজ, সেই কামিজের হাতা টানিয়া রাখিবার বগলশ, আলবার্ট ফেশানের টেড়ি, মোটা হারের ন্যায় সোনার চেন, রঙ্গিন লতা পাতা কাটা ফুল মোজা, হাতে পাতলা ছড়ি প্রভৃতি জামাই-বাবু-সাধারণ সজ্জা তাঁহার কিছুই করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সকল করিলে সম্বন্ধীরা কিছু না বলুক মনে মনে হাসিবে। কিন্তু 'মিহির উপর থাপ'ওত এক রকম আছে। তাহাতেও বড় পরিশ্রম কম নয়! দেখিতে সাদা সিধের মধ্যেই একরূপ প্রচ্ছন্ন—সুতরাং উঁচুদরের—বাহার হইয়া গেল। চুল আঁচড়ান হইল, কিন্তু স্পষ্ট টেড়ি নাই। এত অল্প পরিমাণে আতর লাগান হইল যে হঠাৎ বুঝা যায় না।

ধুতি চাদর পিরান সাদাসিদে ধরণের কিন্তু খুব দামি জিনিস। এই রূপ ধরণে ভব্যযুক্ত হইয়া নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দনাথ শ্বশুর বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

নলিনী তাহার শাশুড়ীকে যত্নে ও বিনীত ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়াছিল। স্বামীর মন এরূপ বুঝিয়া চলিতে পারিত যে আনন্দনাথের হৃদয় একেবারে অধিকার করিয়াছিল। অনেক বিষয়ে তাহার শাশুড়ী এবং আনন্দনাথ তাহার ইচ্ছা অনুসারেই কার্য্য করিতেন।

নলিনী আনন্দনাথ সম্বন্ধে কি ভাবে চলিত তাহা সামান্য সামান্য দুই একটি পূর্ব্ব ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

আনন্দনাথের পিতা কলিকাতার ইংরাজী-ওয়ালা নব্য বিষয়ী লোকেদের ধরণ অনুসারে সন্ধ্যা আহ্নিক করা বহু-কাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। আনন্দনাথও উপনয়নের পর আট দশদিন মাত্র সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়াছিলেন। নলিনীর বাপ ও ভাই সকলেই নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। আবার উহার মা এবং শাশুড়ী দুজনেই বেশ ভক্তিভাবে পূজা আহ্নিক করেন।

"সন্ধ্যা আহ্নিক করায় কোন কাজ কখন আটকায় না বরং উহার অভ্যাস থাকিলে মানুষ সময়ে বিছানা থেকে উঠে; উহা দ্বারা শরীরের ও মনের জড়তা দূর হইয়া মানুষ সকল কার্য্যে তৎপর থাকে, নীচ প্রবৃত্তি মনে কম তেজ করিতে পারে। মানুষ কদিনের জন্য? দিনান্তেও ভগবানের চিন্তা করিবে না?—সন্ধ্যা আহ্নিকে ইহকাল পরকাল সব

দিকে ভালহয়।” পিতাকে এইরূপ কথা বলিতে নলিনী অনেক সময়ে শুনিয়াছিল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল যে স্বামী সন্ধ্যা আহ্নিক করেন।

শ্বশুর বাড়ীতে ঠাকুরঘরের কাজ নলিনীই করিত। তাহার দাদারা যে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন তাহা মধ্যে মধ্যে স্বামীর কাছে কথায় কথায় জানাইত। ‘কবে আমাদের তুজনের মন্ত্র হইবে? একসঙ্গে স্ত্রী পুরুষে জপ করিলে নাকি অনেক ফল হয়?’—এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিত। ‘গায়ত্রী মন্ত্র তোমার পৈতার সময় হইয়া গিয়াছে—পুরুষ-মানুষের বড় সুবিধা। আমার এমন মন্ত্র পাওয়া থাকিলে রোজ নিয়মিত জপ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না’—নলিনী একদিন এইরূপ বলিলে আনন্দনাথ নিয়মিত গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নলিনী সবে ১৫ বৎসরের, কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধি ঐ বয়সে বড় শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ১৪।১৫ বৎসরের মেয়ে ২২।২৪ বৎসর বয়স্ক সুশিক্ষিত স্বামীর সহিত সকল বিষয়েই প্রায় সমকক্ষের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারে।

নলিনী দেখিল শ্বশুর সন্ধ্যা করেন না। স্বামীর সন্ধ্যা করা আরম্ভ “তাহার” কথায় হইতে পারিবে না। ‘পিতা যাহা করেন না, স্ত্রীর কথায় তাহা প্রকাশ্যে আরম্ভ করিব,—লোকে কি মনে করিবে’—স্বামীর এইরূপ মনে হইবে এবং একটু হওয়াও উচিত। যাহা করিতে পারিবেন না বৃথা সে অনুরোধ করিব না, এই মনে করিয়া নলিনী একদিন

তাহার শাশুড়ীর কাছে অল্পে অল্পে উহার কবে মন্ত্র হইবে এই কথার আরম্ভ করিয়া, সন্ধ্যা আহ্নিকের কথা তুলিল এবং ক্রমশঃ শাশুড়ীর নিজের ইচ্ছা এরূপে উদ্রেক করিয়া ফেলিল যে, তিনি আনন্দনাথকে নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য অন্য এক সময়ে অনুরোধ করিলেন।

আনন্দনাথের মা আনন্দনাথকে বলিলেন, "আজ বৌমা তার ভাইয়েদের সন্ধ্যা আহ্নিকের কথা বলিতেছিল। আমার শুনিতে শুনিতে বড় সাধ হইল তুইও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিস্।"

আনন্দনাথ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন 'মা বলিতেছেন বটে, তবু শ্বশুর বাড়ীর ধরণ বলিয়া যাহা তাঁর মুখে উল্লেখ হইল, আর যাহা পিতা করেন না, তাহা কি বলিয়া সুরু করিব? যদি পৈত্যার সময় হইতে করিতাম তাহাতে দোষ হইত না। নূতন আরম্ভ কিরূপে করি?' এই সময়ে আনন্দনাথের পিতা আফিস হইতে বাটীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন 'ছেলেকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বল।' আনন্দনাথের পিতা বলিলেন "আমি নিজে নিয়মিত করি না, সেই জন্য জিদ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন এ রকম ভাল কাজ ও কি তোমার তুষ্টির জন্য তোমার কথাতেই করিবে না?" আনন্দনাথের সাক্ষাতেই এই কথা হইল। আনন্দনাথ সেই

দিন থেকে সন্ধ্যা আহ্নিক আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রগুলা সড়গড় হইলে দেখিতে পাইলেন যে,সন্ধ্যা করিতে বাস্তবিক বেশী সময় যায় না। সেই অবধি নলিনী বড়ই খুসী হইয়া ঠাকুর ঘরে তাঁহারে আহ্নিকের যায়গা করিয়া দিত।

অদ্য সায়ংসন্ধ্যার পর আনন্দনাথ পূর্ব্বোক্তরূপ বেশ ভূষা শেষ করিয়া বাড়ীর গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছেন। কোচমান যেন অত্যন্ত অন্যায় রূপে বিলম্ব করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। দরজার কাছে গাড়ি এলে তিনি ঐ ঘর হইতেই জানিতে পারিবেন। 'ততক্ষণ কি করি' ভাবিতে ভাবিতে তিনি তাঁহার বাক্স হইতে দুই খানি চিঠি বাহির করিলেন।

চিঠি দুই খানি নলিনীর লেখা। নলিনী বিবাহের পর হইতে অধিকাংশ সময় শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। তবে প্রথম প্রথম এক একবার অল্পদিনের জন্য বাপের বাড়ী যাইত। শেষে দেড় বৎসর একাদিক্রমে বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নাই। প্রথম চিঠিখানি বিবাহের চারি মাস পরে আনন্দনাথের পত্রোত্তরে লেখা। দ্বিতীয় খানি নলিনী এবারে বাপের বাড়ী গিয়া লিখিয়াছিল।

প্রথম চিঠি খানিতে পাঠ "প্রণামা শতকোটী নিবেদন"— শেষে "সেবিকা নলিনী"। নলিনী মাতার কথামত ঐরূপ লিখিয়াছিল। আনন্দনাথ অমন ধরণের চিঠিতে আপত্তি করেন—হৃদয়েশ্বর, প্রাণবল্লভ প্রভৃতি লেখা হয় নাই! দ্বিতীয় পত্র খানি পুনর্ব্বার পড়িতেছিলেন। তাহা এইঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা

১৩ই ভাদ্র রবিবার
রাত্রি ১০টা।

পরমারাধ্য পরমপ্রিয়তমেষু——

এখানে আসিয়া অবধি তোমাকে পত্র লিখি নাই। মা যে রকম অসুস্থ ছিলেন তাহাতে কি করিয়া কি লিখিব বলিয়া লিখিতে পারি নাই।

তুমি সে দিন ঠাকুরের সঙ্গে মাকে দেখিতে আসিয়াছিলে। ঠাকুর তোমাকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া গেলেন। ডাক্তার ও বৈদ্য সব ছিল বলিয়া আমি তখন সে দিকে ছিলাম না। তোমাকে জানালার পাকি তুলিয়া উঠান দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইয়া ছিলাম।

মার অসুখ বৈদ্যের ঔষধে একটু একটু কমিতেছে। বৈদ্য এখন বলিতেছেন এ যাত্রা নিশ্চয় রক্ষা পাইবেন তবে এখনও দুই মাস ঔষধ খাইতে হইবে। এখনও উঠিয়া বসিতে পারেন না।

এই অসুখের ভিতর সকলকার খবর নিচ্ছেন। তোমার এবারে ভাল পাস হয় এজন্য পূজা মাননাও করেছেন। আমাকে সে দিন বলিলেন, "স্বামীর ভালর জন্য স্ত্রী যদি ব্রত উপবাস না করে তবে তার বৃথা জন্ম।" এবারে শিবরাত্রি করিয়া কুড়ি হাজার বটুক মন্ত্র জপ করিয়াছি।

আজ ঠাকুর আফিসের ফেরত এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেছেন যে বদ্যির অসুধই খাওয়ান চলুক।

তিনি আজ বাবাকে বল্‌ছিলেন যে তুমি আজ কাল অনেকটা রাত জেগে পড়্‌ছ। আমি মার কাছে রাত্রে যখন জেগে বসে থাকি, তখন আগেকার হিসাব ধরিয়া নটার পর হোলে মনে করিতাম 'তুমি এখন ঘুমুচ্ছ'। এখন ১০টা রাত্রি। আজকের কথা শুনে মনে কর্‌ছি এখনও শোও নাই। যদি দুটা বাড়ী কাছাকাছি পাসাপাসি হইত! দিনে একবার করিয়া তোমাকে দেখিতে পাইতাম—তাহা হইলে খুব ভাল হইত না? না তার চেয়ে যদি আমি এখান থেকেই তোমাকেদেখিতে পাইতাম! সেই যে এক দিন তুমি গল্প করেছিলে যে ধ্যান ধারণা করে নাকি কাহার কাহার এমন ক্ষমতা হয় যে, কোন দূরের লোক কে কখন কি কর্‌ছে মানস চক্ষে তাহা সব দেখিতে পান। আমার সেই বিদ্যাটা হয় বড় ইচ্ছা করে। তাহ'লে তুমি আমার কাছে এক রকম নজরবন্দী হও। তা হয়ত তোমার ভাল লাগিবে না!

তোমার পরীক্ষা হইতে হইতে মা আরও একটু সেরে উঠ্‌বেন। তখন আস্‌তে পার্‌বে না? সে এখনও ঠিক এক মাস।

এই দেখ চিঠির চার পিঠ, লেখা হইল। মা ও বাড়ীর আর আর সবাই কেমন আছেন? এই চিঠির উত্তরে তুমি আমাকে খুব প্রশংসা ও আদর কোরে একখানি চিঠি লিখো।

তোমার

নলিনী——

আনন্দনাথ তদ্গত চিত্তে চিঠি পড়িতে ছিলেন। অল্প বয়স্কা স্ত্রী তাঁহার পরীক্ষা ভাল হয় এই সংকল্পে একটা দিন রাত উপবাসী থাকিয়া কত হাজার মন্ত্র জপ করিয়াছে, চিঠিতে প্রথম যে দিন পড়িয়াছিলেন, সে দিন বড়ই লজ্জা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল 'আমি নিজে তেমন চেষ্টা কি করিতেছি? পাস না হইলে পিতার বড়ই কষ্ট হইবে, স্ত্রী এত করিতেছে তাহার মনক্ষোভ হইবে, শ্বশুর বাড়ীতে লজ্জা পাইব—মার এত বিশ্বাস যে পাস হব সেটা ভাঙ্গিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হইবেন।'

নলিনী বাপের বাড়ী গিয়া অবধি আনন্দনাথ বেশ মন দিয়া পড়িতে ছিলেন—শেষের এক মাস আরও অধিক পরিশ্রম করিয়া ছিলেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে গাড়ি যে ফটকের নিকট আসিয়াছে আনন্দনাথ সে শব্দ শুনিতে পান নাই। চাকর আসিয়া বলিলে বাক্সে চিঠি দুখানি বন্ধ করিয়া আনন্দনাথ গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

-***-

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জামাতা।

সুপাত্রমিতি দত্তেহ সুতা স্যাৎ সুখিনী ধ্রুবং।
সুপাত্রমথ জামাতা তদ্‌লোকোতি মোদতে॥

নলিনীর মাতা কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছেন। আজ তাঁহার বাড়ীতে জামাই আসিবার কথা হইতেছে। এ সংবাদ পাড়ার গেজেট, আরাধ্যা ঠাকুরুণের মুখে পরিচিত কয়েক ঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রী মহলে পৌঁছিলে নিকটের কেহ কেহ নলিনীর মাতার সহিত দুপুর বেলা দেখা করিতে আসিলেন। কেহ কেহ বলিয়া গেলেন সন্ধ্যার সময় আসিবেন, একজন বা থাকিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নানা শ্রেণীর লোকের এক পল্লীতে বাস। আবার সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও খবর রাখেন না। কিন্তু আজও কলিকাতা লণ্ডন সহর হয় নাই। এখনও তথাকার বাঙ্গালীরা পূর্ণ ফিরিঙ্গি হন নাই। সুতরাং এখনও দেশীয় রীতি কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে। এখনও অনেকের বোধ আছে জামাই লইয়া আমোদ করিবার জন্য শালী ও দিদি শাশুড়ী সম্পর্কের দু এক জন

উপস্থিত রাখিতে না পারিলে যেন জামাইয়ের অভ্যর্থনা কম হয়, যেন গৃহস্থের একটু ত্রুটি হয়। দু একজন মুখরা স্ত্রী-লোক কিছু কড়া রসিকতা করেন, তাহা রুচি বিরুদ্ধ এবং পরিত্যজ্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু জামাইকে এক প্রকার একা বসাইয়া রাখাও বাড়ীর কর্ত্রীর পক্ষে এক প্রকারের ত্রুটি বলা যাইতে পারে।

নলিনীর মাতার বিনয় ও সকলের প্রতি সহানুভূতিহেতু প্রতিবেশিনীরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। দু এক ঘরের মধ্যে যাওয়া আসাও ছিল।

নলিনী দেখিতে বেশ সুশ্রী, বড় মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, অনেক গহনা হইয়াছে, ইহাতে সমবয়স্কাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে একটু ঈর্ষ্যা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু নলিনীর ধরণ ধারণ বরাবরই তাহার মাতার মত বিনীত থাকায় কেহ সুস্পষ্ট ঈর্ষ্যা প্রকাশ বা সাক্ষাতে মর্ম্মভেদী কথা ঠারে ঠোরে বলিত না। তবে "এমনই কি সুন্দর?—এমনই কি বড় মানুষ?"—অসাক্ষাতে এ সকল কথা অবশ্যই হইত। হাজার হোক বাঙ্গালীর মেয়ে ত!

আনন্দনাথ শ্বশুর বাটীতে পৌঁছিয়া বহির্বাটীতে শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। আনন্দনাথ বেশ সুপুরুষ। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শ্বশুরের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

নলিনীকে বেশ সুপাত্রে দিয়াছেন, তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নলিনীকে মনে ধরিয়াছে—এই সকল কথার সহিত

অতীতের সেই কতটুকু নলিনী, সেই টলিয়া টলিয়া প্রথম চলিতে শিখিতেছে—সেই চিত্র, এবং এখনকার কোমল হৃদয়, প্রফুল্ল মুখ, মাতার সেবায় নিমগ্ন চিত্ত, সকলের সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে অবিরাম দৃষ্টি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা, নলিনীর চিত্র মনের ভিতর আসিল—জগন্মাতার বাপের বাড়ী আসার ন্যায় তাঁহার কন্যার বাপের বাড়ী আসা কয়েক দিন মাত্র স্থায়ী, একথাও মনে হইল।—মনুষ্যের মনের ভিতরে নানা প্রকার ভাব ও চিত্রাদি এমন অচিন্তনীয় রূপে দ্রুত ভাবে চলিতে পারে যে আনন্দ-নাথকে দেখিয়া এত সব মনে হইল অথচ আনন্দ-নাথকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতে কিছু মাত্র বিলম্ব লক্ষিত হইল না; স্বর একটু গাঢ় হইয়াছিল মাত্র।

অনাথবন্ধু তখন তাঁহার ছাত্রদের পড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ভাই দুজনেই বাহিরের বাটিতে পড়িতে ছিল। আনন্দনাথ আসিলে উহারা বই বন্ধ করিয়া নিকটে আসিয়া বসিল।

***

নবম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ ◯ *ঃ০—

শ্বশুরালয়ে।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারেণ জ্ঞায়তেঽন্তর্গতো মনঃ॥

বাড়ীর ভিতরে গিয়া কেহ খবর দিবার পূর্ব্বেই জামাই আসার সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। গাড়ি আসিয়া দাঁড়ান আর কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু হঠাৎ নলিনীর মুখ রক্তাভ হইতে দেখিয়া আরাধ্যা ঠান্‌দিদি অনাথের স্ত্রীকে বলিলেন, "কনে বৌ! জানালার ধারে গিয়া দেখ্‌ত গাড়ি বুঝি দাঁড়াল।"

বৌ জান্‌লার কাছে গিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ঠান্‌দিদি উপস্থিত রমণীবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখেছ, যার খবর সেই আগে পায়।"

আরাধ্যা নলিনীকে এত ভালবাসিতেন যে, নলিনীর স্বামীর আগমন সকলের আগে জানিতে পারিবার কথা উপস্থিত সকলকে বলিয়া দিয়া উহাকে লজ্জিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তবে যখন কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল "কে বলে ঠান্‌দিদির বয়েস হয়েছে—চোক কান কেমন সজাগ" তখন ঠান্‌দিদি বলিলেন "বয়েস হয়েছে

বলেই ত কান খাড়া করে আছি! কম বয়েসী হোলে কত সময় আছে জেনে নলিনীর মতনই খাতির নদারত হয়ে থাক্‌তাম।”

নলিনী ঠান্‌দিদির চাউনিতে স্পষ্ট দেখিল যে, তাহার কান খাড়া করে থাকা জানতে পেরেই ঠান্‌দিদি ঠাট্টা করে অমন বলিতেছে।

আরাধ্যা ঠান্‌দিদি কলিকাতার “গেজেট”। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। তিনকুলে কেহ নাই। প্রায় সকল ভদ্র বাড়ীতেই যাতায়াত আছে। তাঁহার পবিত্র স্বভাব, আমুদে ধরণ, সকলের সুখে দুঃখে সমানুভাবিতা জন্য তিনি সকলের কাছেই আদৃত। কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে সকলে বড় রোগে ভুগিতেছে, শুশ্রূষা করিবার অসুবিধা ঘটিতেছে—আরাধ্যা ঠান্‌দিদি যেমন করিয়াই হউক সংবাদ পাইবেন এবং কেহ ডাকিতে না ডাকিতে গিয়া দশ দিন সে বাড়ীতে থাকিয়া রাঁধিয়া দিবেন। রোগে শোকে সান্ত্বনা দিতে এবং সর্ব্বপ্রকার আমোদ আহ্লাদের দিনে সকলের অপেক্ষা অধিক আমোদ আহ্লাদ করিতে আরাধ্যা ঠান্‌দিদি সর্ব্বদাই এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান।

তাঁহার বয়স এখন ৫০ বৎসর, কিন্তু পরিশ্রম নিয়মিতাচরণ, এবং পূজা আহ্নিক প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যের গুণে ব্রাহ্মণের বিধবাদিগের শরীর সহজে অপটু হয় না। কোন “জগ্যিতে” নিরামিষ তরকারির রন্ধনও যেমন আরাধ্যা

ঠান্‌দিদি না থাকিলে খুব ভাল হয় না, তেম্‌নি তাঁহার অভাবে বাঁসর ঘরের আমোদও পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হয় না—মেয়ে মহলে একথাটা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত।

তাঁহার নিজের একখানা ঘর পর্য্যন্তও নাই—কোন প্রকার বাঁধা আয় একবারেই নাই, অথচ তাঁহার অন্নবস্ত্র ও আহারের কখন অভাব হয় না। কখনও কাহার কাছে কিছু চাহিতে হয় না। সকলেই আদর করিয়া ডাকে ও বাড়ীতে রাখিতে যত্ন করে এবং না চাহিতেই কাপড় প্রভৃতি দিয়া থাকে। তিনি বস্ত্রাদি এত পান যে নিজেও গরীব দুঃখীকে দুই এক খানা দিতে পারেন।

৺ পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন, কাশী, পুষ্কর, হরিদ্বার, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থ আরাধ্যা ঠান্‌দিদি ভিন্ন ভিন্ন মেয়েদের দলের সহিত একাধিক বার ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

বাসর ঘরে আরাধ্যা ঠান্‌দিদি পুরুষ বেশ করিয়া এবং গোঁফ দাড়ি লাগাইয়া বগলে বোতল—মাতাল সাজেন। বরকে জিজ্ঞাসা করেন "চিন্‌তে পার? আজ আর চিন্‌তে পার্‌ছ না বুঝি? সেই যে সে দিন তোমার বোন কে এনে আমার কাছে দিয়ে গেলে! আজ এত লোকের সাক্ষাতে বুঝি স্বীকার কর্‌তে লজ্জা হচ্ছে? তার লজ্জা কি? এঁরা সবাই সে কথা জানেন!" এই নকলটি মেয়ে মহলে বড়ই সমাদৃত—এ ছাড়া আরও কত আছে এবং উপস্থিত উক্তির সীমা নাই।

আনন্দনাথ বাড়ীর ভিতর আসিলে এহেন আরাধ্যা ঠান্‌দিদি প্রমুখ ঠান্‌দিদি ও শালী সম্পর্কিত দিগের দ্বারা কিরূপ সম্ভাষিত হইয়াছিলেন, কিরূপে ঠাট্টা তামাসায় মেয়ে মহল—ইদানীন্তন কালের "মার্জ্জিত রুচি" বিরুদ্ধ কিন্তু চিরপ্রথা অনুরূপ—আমোদ করিয়াছিল তাহার বর্ণন চেষ্টা করিব না। তবে খুব বাড়াবাড়ি হয় নাই এবং বহির্ব্বাটী পর্য্যন্ত শব্দ যায় নাই।

আনন্দনাথ হাসি মুখে ঠাট্টা সহ্য করিতেছিলেন। উত্তর মনে উঠিলেও তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। মাঝে মাঝে সোজা কথায় জবাব দিতে ছিলেন—তাহার উপরও ঠাট্টা। তিনি জানিতেন যে তামাসার জবাব দিলে তখনকার মত ঠান্‌দিদিদের কাছে বাহবা পাইবেন বটে, কিন্তু পরে মেয়েদের অন্তরে এবং তাহাদিগের নিভৃত সমালোচনায় নিরেশ জিনিস বলিয়াই ধার্য্য হইবেন।

এই সকল আমোদ আহ্লাদ জামাই-জাতীয়দিগের অগ্নিপরীক্ষা। মন খুব পরিষ্কার না হইলে জামাই অবশ্যই ধরা পড়েন। মেয়েদের চক্ষু হইতে মুখের এবং কথার ভঙ্গি একটুও এড়ায় না, সুতরাং মনের ভাবও ছাপা থাকে না।

নলিনীর মাতা আহারাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার তামাসা করিতে দেন নাই। সেরূপ করিলে যদি জামাইএর আহারে একটুও অপ্রবৃত্তি হয়—তাহার অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

পাড়ার মেয়েরা নলিনীর মাতার কাছে জামাইএর সুখ্যাতি করিয়া চলিয়া গেলেন। আরাধ্যা ঠান্‌দিদি—যিনি কলিকাতার মধ্যে ও বাহিরে অনেক জামাই লইয়াই আমোদ করিয়াছিলেন—নলিনীর মাতাকে বলিলেন "তোমার ছেলেদের মতন নিখুঁত ছেলে এই তোমার জামাইকে দেখিতেছি আর বড় দেখি নাই।"

মুখের উপরে এমন অবস্থায় কেহই কখন মন্দ বলে না—সকলে "বেশ জামাই" বলিয়াই থাকে—কিন্তু "আন্তরিক কথার" এবং "কথার কথার" স্বর অনেক চেষ্টা করিয়াও একপ্রকার করিতে খুব কম লোকেই পারে।

দশম পরিচ্ছেদ।

-০✱✱✱০-

আট বৎসর পরে।

জনঃ স্বভাবেন চ শিক্ষয়া কৃতী।
র্বহ্বী র্বিভিন্না কুরুতে ভবেদ্ যথা॥
পরং স্বদেশীয় শুভং তথোদ্যমং,।
লোকে দ্বিলোকী শুভ মাবহেদ্ধ্রুবং॥

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা জানাইয়াছি তখন হইতে আট বৎসর পার হইয়া গিয়াছে।

আট বৎসরে কতই পরিবর্ত্তন হয়! এক বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকার ততদিনে বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হয়—দশ বৎসরের বালক ততদিনে বিভিন্ন মূর্ত্তি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক হইয়া দাঁড়ায়। প্রৌঢ়ের বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া পড়ে। ততদিনে কলমের বাগানে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। কত নদ নদীর তট পরিবর্ত্তন, কত নূতন নূতন বাটীর নির্ম্মাণ, কত পুরাতন বাটীর ধ্বংশ সাধন হইয়া যায়!

কালস্রোতে আট বৎসর ভাসিয়া আমাদের পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহারা কে কোথায় পৌছিয়াছেন—একবার দেখা যাউক।

অনাথবন্ধুর পিতা প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধাবস্থাপন্ন, এবং

শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। আহারাদি অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন বিশেষ রোগ নাই।

অনাথবন্ধুর মাতা চিররুগ্নাবস্থাপন্ন এক প্রকার শয্যাগত, কিন্তু স্বামীর এবং পুত্র ও পুত্রবধূদিগের যত্নে এবং আর্য্য-নারী-সুলভ স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার বলে মনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা আছে। এক একবার রোগের যাতনায় মেজাজটা খিটখিটে হয়, কিন্তু তখনি তাহা বুঝিতে পারেন এবং যথাসাধ্য বিরক্তি দমন চেষ্টা করেন।

অনাথবন্ধুর স্ত্রী এক্ষণে উনবিংশবর্ষীয়া বাড়ীর বড় বৌ। তিনিই শাশুড়ীর পরামর্শ অনুসারে গৃহস্থালীর কার্য্য সমস্ত চালাইতেছেন। শাশুড়ীর সেবায় সকলের অপেক্ষা অধিক যত্নপর। একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। সেটি এখন তিন বৎসরের।

অনাথবন্ধুর মধ্যম ভ্রাতা রজনী বিএ পরীক্ষায় পাস হইয়া মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দুই বৎসর হইল ডাক্তারী পাস হইয়াছেন। পিতা রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের বরাবর ইচ্ছা যে, রজনী উত্তমরূপ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। রজনী পিতার অভিপ্রায় অনুসারে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের নিকট যাতায়াত করিয়া এবং বাড়ীতে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া কালেজে পড়িবার সময়েই হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছেন এবং একটু নৈসর্গিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকায় তাঁহার রোগ নির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সহজেই কতকটা পারদর্শিতা জন্মিয়াছে।

রজনী অতিশয় পরিশ্রমশীল। যখন যাহার চিকিৎসার জন্য আহূত হইতেন, তখনি তাহার বয়স, রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, প্রভৃতি এক খানি বাঁধান খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। যে যে ঔষধ খাওয়াইতেন, এবং পূর্ব্বে খাওয়ান হইয়াছে বলিয়া শুনিতেন, তাহাও লিখিত থাকিত। চিকিৎসা শেষ হইলে মনে মনে চিকিৎসাটার সমালোচনা করিতেন। কোন্ ঔষধটা ভাল খাটিল, তাহাতে রোগীর ধাতু কি প্রকৃতির বলিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এ সমস্ত ঐ খাতায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেন। সেই রোগীর কোন সময়ে আবার অসুখ হইলে ঐ বিবরণী হইতে চিকিৎসার অত্যন্ত সুবিধা হইবে—এই জন্যই এত পরিশ্রম করিতেন। ক্রমে ক্রমে যখন লিখিত খাতার বিভিন্ন বিবরণীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে তখনও আবশ্যকমত রোগীর বিবরণ সহজে খুঁজিয়া পাইবার জন্য বর্ণমালা অনুক্রমে নির্ঘণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত করিতেন।

এইরূপে রোগীসম্বন্ধে সকল কথা লিখিতে গেলেই কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কোন্ ঔষধটা প্রথমে দেওয়া ভুল হইয়াছিল, এ সকল বিষয়ও সুস্পষ্টরূপে মনে আসিত এবং তদ্দ্বারা নিজের চিকিৎসা সম্বন্ধে পারদর্শিতার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল।

রজনী চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পরেই কয়েকটি উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপকৃত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ

লেখক—তিনি রজনীকে টাকা অতি সামান্যই দিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধব অনেক। সকলেই রজনীর চিকিৎসা নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতে লাগিলেন এবং সহজেই রজনীর পসার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। এখন রজনীর একটি বড় ডিস্‌পেন্সারি হইয়াছে।

চিকিৎসা কার্য্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়ায় রজনী অধিক সময় পান না, তথাপি প্রত্যহ কতকটা সময় কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষায় অতিবাহিত করেন। রজনীর একান্ত অভিলাষ যে, দেশীয় ঔষধের মধ্যে কতকগুলির পরীক্ষা বিধান করিয়া উহাদিগকে হোমিওপ্যাথিতে সংযুক্ত করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, বিশ পঁচিশটা উৎকৃষ্ট দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে ঐ কার্য্য করিতে পারিলে অবশ্যই পাঁচ সাতটা সমস্ত পৃথিবীময় গ্রাহ্য হইবে। তদ্দ্বারা অপর দেশের লোকেরত উপকার হইবেই, মুখ্যতঃ স্বদেশের সম্মান বৃদ্ধি ঘটিবে।

তিনি মনে করিতেন, যদি পরীক্ষা বিধান করিয়া পরীক্ষার ফল প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া পরে ইংরাজী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রে "বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত" বলিয়া ছাপান এবং ঐ সকল বাঙ্গালা মতের ঔষধের যদি বাঙ্গালা নামও বিদেশে পরিগৃহীত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা বাহিরে কতকটা জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং দেশীয় মোহান্ধ অনেক লোকের

কবিরাজীর উপর অশ্রদ্ধা কমিতেও পারে। অন্ততঃ হোমিওপ্যাথির মধ্যে দিয়া আসিলে তাহাদের এবং উৎকৃষ্ট কবিরাজ যে সকল স্থলে নাই তথায় অনেকের—উপকারে লাগিতে পারে।

অনাথবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংসার, সংস্কৃত ভাষায় এম এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কলিকাতায় একটি প্রাইভেট কালেজে ৫০৲ টাকা মাহিনায় মাষ্টারী করিতেছেন। অবসর কাল তন্ত্র পুরাণাদি পাঠে অতিবাহিত করেন। শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যে ব্যাপৃত কোন যন্ত্রাধ্যক্ষের সহিত বন্দোবস্ত হওয়ায়, সংসার সম্প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া একখানি অপ্রকাশিত তন্ত্রের পাঠ মিলাইয়া মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

অনাথবন্ধু এখন আর আলীপুরে যান না। কয়েক বৎসর ধরিয়া সিয়ালদহের আদালতেই ওকালতী করিতে-ছেন। কাছারী তাঁহার বাসার নিকটে। যাতায়াতে সময় নষ্ট খুব কমই হয়। তথায় এখন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পসার। মাসে তিন চারি শত টাকা আয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত বুঝিতে পারিলে মিথ্যা মোকদ্দমায় ওকালত নামা লয়েন না। পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারিলে মিথ্যা সাক্ষী কাহাকেও জবানবন্দী করিতে তোলেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পসারের অধিক ক্ষতি হয় না। বেশী দামী দু চারটা মোকদ্দমা মধ্যে মধ্যে হাত ছাড়া হয়— কিন্তু সকলেরই নিকট সেজন্য তিনি সম্মানিত। বক্তৃতায়

খুব কম সময় লয়েন—আসল কথা কয়েকটি মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হয়েন—ইহাতে হাকিমদিগের বড়ই সুবিধা হয়। তাঁহার ঐরূপ বক্তৃতায় কাজও বেশী হয়—এমন কি অনেক রায়েই তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনার কথা অনেক অবিকল বসিয়া যায়।

জেরার সময় অপর কোন উকীলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দস্তুর মত হাত মুখ নাড়িয়া সামান্ত বিষয়ে প্রবল আপত্তি এবং গোলযোগ করিতে গেলে অনাথবন্ধু একটু মুচ্‌কি হাসেন এবং আদালতকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আছে কি না? প্রায়ই প্রয়োজন হয় না—আদালতই মীমাংসা করিয়া গোলযোগ থামাইয়া দেন। মুন্সেফিতে এবং ফৌজদারীতে মোকদ্দমা করিয়াও অনাথবন্ধুর মনে ও ব্যবহারে একটুও বাজে মোক্তারী ধরণ সংক্রামিত হয় নাই।

এখন যেরূপ আয় দাঁড়াইয়াছে অনাথবন্ধু তাহাতেই সন্তুষ্ট। হাতে বেশী কাজ থাকিলে বরং মক্কেল ছাড়িয়া দেন, তথাপি এখানে দুমিনিট অপর এক আদালতে দুমিনিট দাঁড়াইয়া মক্কেলের পয়সা কুড়াইয়া মোকদ্দমার ভার ক্ষণে ক্ষণে অপরের উপর ফেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান না।

অনাথবন্ধু এখনও ছেলে পড়ান ছাড়েন নাই। জজ বাবুর পরামর্শেই তিনি সিয়ালদহে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহার পর শীঘ্রই পসার ভাল হইয়া আসিলে জজবাবু দেখিলেন, অনাথবন্ধুর আর ছেলে

পড়াইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অনাথবন্ধু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সময় দিয়া তাঁহার ছেলেদের পড়ান। ইহা দেখিয়া তিনি ভদ্রতা পূর্ব্বক বলিলেন “অনাথ বাবু! আপনার সময়ের অপ্রতুল হয়। বিশ্রামের সময় থাকে না। ছেলেদের পড়াইবার জন্য ভাল দেখিয়া আর কাহাকেও জুটাইয়া দিন।”

অনাথবন্ধু একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন “আপনি এমন বলিতেছেন কেন? আমার দু পয়সা আসিতেছে বলিয়া আমার অজ্ঞাতসারেই কি পড়াইতে অযত্ন ঘটিয়াছে? যদি এমন হইয়া থাকে সেজন্য আমি বড়ই লজ্জিত হইব। আমার অসময়ে এই কার্য্য টাকার জন্য লইয়া ছিলাম, কিন্তু আপনার ছেলেদের উপর আমার এখন স্নেহ জন্মিয়াছে। উহারা এল এ পাস করিলে—অথবা তৎপূর্ব্বেই যদি আমার সাহায্য আবশ্যক বোধ না হয়—তবে ছাড়িব মনে করিয়া ছিলাম। আপনার পরামর্শেই আমি সিয়ালদহে ওকালতী আরম্ভ করি। সাবেক মুন্‌সেফ বাবু আপনার পরিচিত বলিয়া প্রথম দিন হইতেই আমার প্রতি বিশেষ সযত্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং আমার বিশ্বাস যে তাঁহার যত্নেই সিয়ালদহে আমার এত সহজে ও শীঘ্র পসার হইয়াছে। আমার বরং আপনার নিকট কিছু না লইয়াই পড়ান উচিত। কিন্তু সে কথা অনেকবার মনে হইলেও পাছে অন্য লোক রাখেন এই ভয়ে প্রস্তাব করিতে পারি নাই।”

অনাথবন্ধুর যতদিন ইচ্ছা তিনি ছেলেদের পড়াইবেন, এই কথাই স্থির রহিল।

অনাথবন্ধু এখন অতি সুন্দর বাঙ্গালা লেখেন। জলকষ্ট নিবারণ এবং দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের আবশ্যকতা দিন দিন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেছেন। ঐ দুই বিষয় এবং ভারত ইতিহাস হইতে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান মহাত্মাদিগের জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

রামজয় চট্টোপাধ্যায় এখনও সেই সিয়ালদহের বাসা বাটীতেই আছেন, তবে পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় পাশের সংলগ্ন বাটীটীও ভাড়া লইয়াছেন। দুই বাড়ীই এক মালিকের। উপর তালায় দ্বার ফুটাইয়া দেওয়ায় দ্বিতীয় বাটীটীরও উপরতালা অনেকটা অন্দরের সামিল হইয়া গিয়াছে। উহার নীচে তালায় রজনীর ঔষধালয়।

রজনীর বিবাহ কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় হইয়াছিল। বৌটীর নাম কিরণশশী—দুই বৎসর হইল একটি ছেলে হইয়াছে। এই মেজবৌই সকলের অপেক্ষা সুন্দরী।

সংসারের বিবাহ তারকেশ্বরের নিকট একটি পল্লীগ্রামে হয়। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কন্যা। বয়স এখন ১১ বৎসর।

নলিনীর দুইটী মেয়ে হইয়াছে। ছেলে হয় নাই বলিয়া নলিনীর শাশুড়ী মনে মনে বড়ই দুঃখিত। নলিনীর হাতে ও গলায় ঠাকুরদের মাদুলী চারি পাঁচ রকম বাঁধিয়া দিতেছেন। পুত্র সন্তান হইলে সমারোহে ৺ কালীঘাটে পূজা দিবেন,

মানত করিয়াছেন। বৌয়ের উপর ভালবাসা সমানই আছে। 'হয়ত আবার মেয়ে হবে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি তেমন বিরক্ত হইব না। বৌমার সেজন্য ভয় নাই'—ইহা জানাইবার জন্য মাঝে মাঝে বলেন "তিন ভাইএর পরে আমার বৌমা তাঁর মায়ের এক মেয়ে এই জন্য তার পাল্‌টায় তিন মেয়ে না হলে বুঝি বৌমার ছেলে হবে না!" কখন বলেন "আমি যখন আনন্দের বিবাহের পূর্ব্বে বৌমার তিন ভাইএর কথা শুনিলাম তখনি মনে করিয়াছিলাম যে, ওবংশ ভাল, সুধু মেয়ে হওয়া গোষ্ঠী ভাল নয়। তখন থেকে আনন্দের অনেক ব্যাটা ছেলে হবে মনে মনে সাধ করিয়াছিলাম বলিয়াই বুঝি ঠাকুর দর্পচূর্ণ করিতেছেন!"

আনন্দনাথের পিতা আফিসের কার্য্য হইতে কিছু পেন্‌সন পাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সওদাগরী আফিসের বড় সাহেব তাঁহার উপর বড়ই তুষ্ট ছিলেন।

আনন্দনাথ এমএ বিএল হইয়া হাইকোর্টের উকীল হইয়াছেন। আনন্দনাথের পিতা কলিকাতার বাড়ীগুলি এবং তালুকখানি আনন্দনাথের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাম দিয়া দুদশটা চাঁদায় টাকা দিয়াছেন। অনেক বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন এবং আনন্দ নাথকে মিউনিসিপাল কমিসনর, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট, এবং ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি, জুওলজিকেল গার্ডেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন,

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েসন, প্রভৃতি দু দশটা সভা সমিতির মেম্বর করিয়া তুলিয়াছেন। এ সমস্ত কার্য্যে আনন্দনাথের বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না এবং বিষয় আশয় এবং চাঁদা দান নিজের নামে হওয়ায় বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু যখন পিতা বলিলেন যে "আনন্দনাথের" এইগুলি হওয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন কাজেই ঐ সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্বীকৃত, ব্রতী ও চেষ্টিত হইতে হইয়াছিল।

এখন আনন্দনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বর এবং রায় বাহাদুর উপাধি এই দুইটি হইলেই তাঁহার পিতার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সে জন্য চেষ্টাও হইতেছে।

আফিসের বড় সাহেবের গবর্ণমেণ্টে খুব খাতির আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ মত গোটা কতক "গোছাল" দানে হাজার পাঁচ টাকা খরচ করিতে পারিলেই তিনি রায় বাহাদুর পদটী হাসিল করিয়া দিতে পারিবেন। অন্য লোকের পক্ষে অন্ততঃ দশ পনর হাজার লাগে। তবে যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন মান্যগণ্য লোক, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াও কোন প্রধান রাজপুরুষের খেয়াল মিটাইবার সাহায্য করিলে—এমন কি ঐরূপ বিষয়ে সুধু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেই খেতাবের অপ্রতুল থাকে না। কিন্তু আনন্দনাথের পিতা তেমন নামজাদা লোক নহেন এবং তাঁহার স্বদেশদ্রোহী বলিয়া নাম বাহির করিতেও ইচ্ছা নাই। ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে ১০০০৲, ফুট বল সোসাইটিতে ১৫০০৲, মেয়ে হাঁসপাতালে ১০০০৲,

এবং ডায়মণ্ড হারবার সবডিবিজানে—যেখানে তালুক আছে—লাট সাহেবের ১৫ মিনিটের জন্য শুভাগমন উপলক্ষে প্রচুর দেবদারুর গেটের, সালুর পতাকার এবং কিছু জলযোগের ব্যবস্থার সমস্ত খরচ একা বহন করিয়া ১০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন লণ্ডন রাজধানীর পূর্ব্ব অঞ্চলে বা কানেডায় বা অষ্ট্রেলিয়ায়—বিদেশে যেখানে হউক—একটু দুর্ভিক্ষের সংবাদ এবং কোথাও একখানা ইংরাজী জাহাজ ডুবি হইয়াছে এই সংবাদ আসার প্রতীক্ষায় বাকী ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিবার জন্য মজুদ রাখা হইয়াছে।

ইউনিভার্সিটীর ভিতরে প্রবেশ জন্যও বন্দোবস্ত চলিতেছে। কয়েকজন বড় বড় সাহেব আনন্দনাথের পিতার একান্ত অনুরোধে কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দনাথ তাঁহাদের পরামর্শমত ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থির হইয়াছে যে, ঐ প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন পূর্ব্বক কলিকাতা রিভিউ বা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে সাহেবেরা আনন্দনাথের নামে ছাপাইয়া দিবেন এবং ইংরাজ সম্পাদিত কয়েকখানি খবরের কাগজে আনন্দনাথের ইংরাজী লেখার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সহজেই সেনেটে ঢুকাইয়া দিবেন। ভোট জোগাড় করার কষ্ট পাইতে হইবে না।

আনন্দনাথের পিতা হীন-মস্তিষ্ক ব্যক্তি নহেন। এ সকল যে কিছুই নহে তাহা বুঝেন। এই সব চেষ্টায় যে অনেক

টাকা ও পরিশ্রমের অপব্যয় হয় তাহাও বুঝেন। কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্যের সাংসারিক ব্যবহার এবং ভিতরের মতবাদে সকল সময়ে "নিখুঁতভাবে" মিল পাওয়া যায় না। কাহার কাহার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তত উঁচুদরের লোক ভাল লোকের মধ্যেই বা কয়জন?

আনন্দনাথের পিতা আনন্দনাথকে বলেন, "আমি তোমার বয়সে কি অবস্থায় ছিলাম, আর তোমাকে আমি সমাজের কিরূপ উচ্চপদে বসাইতেছি ইহা মনে করিলে আমার বড়ই সুখ হয়। আমার কাজ আমি করিলাম। এখন তোমার কাজ তুমি কর। এখন তুমি টাকা রোজগার কর, দান ধ্যান কর, দেশের লোকের সকল দিকে ভাল কর। ভাল করিবার কতকটা ক্ষমতা করিয়া দিলাম। এখন সাক্ষীগোপাল হওয়া বা দেশের একজন মুখপাত হওয়া তোমার ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিবে। এতটা টাকা অপব্যয় করা আমার উচিত হইল কি না এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে। আমার একটু গর্ব্ব পরিতৃপ্তির জন্য কয়েক সহস্র টাকা অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া অন্যায় করিয়াছি এ কথা কেহ বলিলে আমার উত্তর নাই। সে কথার কতকটা সত্য। কিন্তু তোমার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধীরভাবে চলিলে স্বদেশীয়দিগের অনেক বিষয়েই কিছু কিছু উপকার করিতে পারিবে। তুমি যদি আমার মুখ রাখ—তুমি যদি এখন নিজের মানসিক উন্নতি

এবং স্বদেশীয়দিগের হিত চেষ্টাতেই জীবন যাপন কর—তাহা হইলে আমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। তুমি যদি উল্টা পথে যাও তাহা হইলে আমার কৃত কার্য্য আরও দোষের হইয়া দাঁড়াইবে। পুত্রের কার্য্যেই পিতার সুযশ বা কুযশ। ছেলে অন্যায় ব্যবহার করিলে লোকে তাহার পিতৃ পুরুষদিগকেই গালি দেয়।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীতে।

অসিবরণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরং।
অমরা মৃত্যু মিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ।।

রজনীর কবিরাজী শিক্ষা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা-বিধান কার্য্যের জন্য অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয়—এ দিকে পসার এরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, দিন রাত্রের মধ্যে বিশ্রাম করিবার সময় নাই। মাসে প্রায় হাজার বার শত টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে।

রজনীর স্ত্রী বাপের বাড়ীতে বাপে খুড়ায় পৃথগন্ন ভাব দেখিয়াছেন। তাঁহার বাপের বাড়ীতে ইহাও বলাবলি শুনিয়াছেন, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইত হবেই। আর হওয়াই উচিত। মনে কর, এক ভাই হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার করিতেছে, আর এক ভাই তিন চারি শত টাকা রোজগার করে, অপর এক জন পঞ্চাশ ষাট টাকা মাত্র পায়। এরা সকলে একত্রে থাকিয়া উহাদের ছেলেরা যদি উদ্বৃত্ত টাকার সমান অংশ পায়, সেটা কি উচিত?"

এক দিন রজনীর স্ত্রী এইরূপ কথায় নিজের শ্বশুর বাড়ীর অবস্থার যেন ছবি তোলা দেখিয়া ভাবিল 'আমার স্বামীর এত টাকা রোজগার, তাহাতে আমার গহনা ও

আমার ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ হওয়াই উচিত। সংসার যে কাজে গিয়াছেন, কখনই তাঁহার আয় বেশী হইবে না। এখন মাসে মাসে টাকা জমিতেছে, কিন্তু এর পর যখন বিষয় ভাগ হবে, তখন সকল ভাইয়ের সমান অংশ হইবে। ইহা হওয়াত উচিত নয়!'

এরূপ কথা কখনই রজনীর মনে হয় নাই। কিন্তু কতক ইংরাজী পড়ার দরুণ আর নিজের আয় কম বলিয়া এ কথা একবার সংসারের মনে হইয়াছিল। কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে ভাইয়েরা যদি কখন পৃথগন্ন হয়েন, তাহা হইলে সঞ্চিত ধনের বণ্টন সময়ে তাহার অল্প অংশ লইতে চাহিলেই চলিবে। এখন হইতে এত দুর্ঘটনার কথা উত্থাপন করিয়া বাপ মার মনে বা ভাইয়েদের মনে কষ্ট দেওয়া কোন মতেই উচিত নয় এই বোধে চুপ করিয়াছিল। তা ছাড়া সংস্কৃত চর্চ্চার দরুণ সংসারের মনে টাকাই পৃথিবীর সারাৎসার এরূপ বোধ ছিল না—কোন্ ভাইয়ের কত আয় - কে কত খায়—কার কটি ছেলে, কে কোন জিনিস পছন্দ করার জন্য কাহার সখে বেশী খরচ, এ সব দিকে দৃষ্টি না করিলে পৃথিবী উল্টাইয়া যায় তাহার এ বিশ্বাস ছিল না। শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে শিক্ষিত সুবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণসন্তান নিঃসঙ্কোচে অপরের কাছে দশ টাকা লইতেও পারে—অনায়াসে দশ টাকা অপরকে দিতেও পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা তাহার চক্ষে অন্যায্য বলিয়া বোধ হইতেই পারে না।

একবার সমস্ত রাত্রি কোন রোগীর নিকটে থাকিয়া রজনী প্রাতঃকালে বাটী আসিলেন। খুব বড় মানুষের বাড়ীতে কঠিন রোগ। অপর কয়েক ঘর রোগী দেখিয়া আটটার মধ্যেই আবার উক্ত রোগীর কাছে যাইবেন, রোগীর পুত্রের নিকট এইরূপ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

রজনীর স্ত্রী বলিল, "এমন করিয়া কত দিন শরীর টিঁকিবে? কত টাকাই বা দিবে?"

রজনী বলিলেন, "এক শত টাকা দিবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের একান্ত জিদ অবহেলা করিতে পারিলাম না। রোগী নিজে থাকিতে বলিলেন, আমি থাকিব স্বীকার করাতেই যেন তাঁর মন একটু ঠাণ্ডা হইল। সুবিধায় সুবিধায় টাকা লইব, এমন সব সময়ে থাকিব না—এটা কি করা যায়? কাজেই থাকিতে হইল। রোগী রাত্রি টা থেকে ঘুমাইতেছেন। আমিও তখন পাশের ঘরে ইজি চেয়ারে ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়াছিলাম।"

রজনীর স্ত্রী। এইরূপ সমস্ত রাত জেগে যে টাকা আনিবে, তাই কি তোমার থাকিবে? কেনই বা এত কষ্ট করে রোজগার কর?

রজনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। মনে করিলেন, বুঝি 'সংসারের অনিত্যতা' সম্বন্ধে কথা হইতেছে। স্ত্রী জ্ঞানী ও বিরাগী আর নিজে সংসারে মুগ্ধ, এরূপ দশা বিপর্য্যয় ব্রাহ্মণের ঘরে কাহারও ভাল লাগে না।

রজনী একটু বিরক্তির স্বরেই বলিলেন, "টাকা কি মানুষ নিজের জন্য রোজগার করে? নিজে ক দিনের জন্য! সঙ্গে কেহ কিছু নিয়ে যায় না। তবে বাপ মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র এদের জন্যই লোকে রোজগার করে।"

রজনীর স্ত্রী একটু অপ্রতিভ হইল। পরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ছেলের কথাই ভাবিতেছিলাম।"

রজনী আরও দু একবার স্ত্রীর নিকট তাঁহার টাকা কড়ির সম্বন্ধে তাঁহার বাপ মা ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক্ ভাবে ছেলের কথার উল্লেখ শুনিয়াছিলেন। অন্য লোকে নিজের রোজগার বিষয়ে কেমন সেয়ানা—রজনীর মত হাবা নয়—এইরূপ ধরণের আভাষ।

রজনী স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অত সঙ্কীর্ণতা ভাল নয়। তাঁহার স্ত্রীর বাপ খুড়ারা একত্রে যখন ছিলেন তখনই সমাজে আদৃত ও পরিবারের মধ্যে সুখী ছিলেন। পৃথক্ হইয়া সুবিধা হয় নাই। তাঁহার নিজের পরিবারের মধ্যে ভক্তি ও ভালবাসা থাকায় যে কি সুখ রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া মনে হইয়াছিল বুঝি স্ত্রীকে বুঝাইতে পারিয়াছেন। আজ বোধ হইল যে স্ত্রীর মনের সঙ্কীর্ণতারূপ রোগের বৃদ্ধি বই কম হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী বাপের বাড়ীতে শিক্ষিত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি তাঁহার নিজ পরিবারের মধ্যেই যথেষ্টরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক!

রজনী বেশ সচকিত লোক, অথচ একান্ত ধীর প্রকৃতিক। তিনি যথার্থই বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক।

সহজাত রোগ যাপ্য হয়—দমনে থাকে। কিন্তু কোন প্রকার অসাধারণ ঘটনায় ধাতু পরিবর্ত্তন না হইলে নিঃশেষ হয় না, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। যে বাড়ীর মেয়ে তাহাতে তাঁহার স্ত্রীর মনে তাঁহার নিজ পরিবারের সহিত সমানুভূতি কখনই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পূর্ণমাত্রায় হইবে না। যদি তাহার আশা করেন তবে সে আশা অবশ্যই নিষ্ফল হইবে, রজনী প্রথম হইতেই একান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে মনে মনে এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। নিজে সতর্ক থাকিয়া যাহাতে তাঁহার নিজের মনে কখনও দোষ স্পর্শ না হয় এইটি দেখা এবং যত দূর সাধ্য বুঝাইয়া উদাহরণ দিয়া একটু একটু কাজ করাইয়া লইয়া তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভাতৃ জায়া ভ্রাতুষ্পুত্রাদির উপর স্ত্রীর ক্রমশঃ কতকটা স্নেহ উদ্রেক করা মাত্র সম্ভব বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। তবে এ সকল চেষ্টায় যে অনেকটাই উপকার হইবে এ আশা তাঁহার যায় নাই। সকলেইত আশার দাস!

রজনী আজ স্ত্রীকে বলিলেন, "ছি! ওকথা মনে আনিতে নাই। আমার প্রদোষ আর সত্যনাথ কি ভিন্ন? আপনার লোক আপনার, না দু দশ খানি খোলামকুচি বা টাকা আপনার? মানুষের অদৃষ্টে কখন কি আছে তাহা কে বলিতে পারে? আজ আমরা দুজনেই যদি হঠাৎ মারা যাই, তাহা হইলে আমি বেশ বলিতে পারি যে বড় বৌ ও দাদা আমাদের প্রদোষকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশী যত্ন করে প্রতিপালন কর্‌বেন। কত দিন

আমাদের জন্য চোকের জল ফেলিবেন। সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা গুলি কি আমাদের জন্য কাঁদিবে, না ছেলের লালনপালন করিতে পারিবে? ব্রাহ্মণের ঘরে দুটা টাকা আসিলেই যদি ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বদলাইয়া বণিক বৃত্তি পরায়ণ ফিরিঙ্গির ন্যায় বুদ্ধি হয়, তবে টাকাই সকল অনর্থের মূল বলিতে হইবে! বোধ হয় সেই জন্যেই শাস্ত্রে বলিয়াছে টাকা দানের জন্য। তোমাদের মন ভাল না হয় আমরা কয় ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া শেষে সমস্ত টাকাটা না হয় দান করিয়াই যাইব!"

রজনীর স্ত্রী আর কিছু বলিল না। স্বামীর স্নানের জন্য তৈল আনিয়াছিল, ধীরে ধীরে ছল ছল নয়নে তাহা নিকটে রাখিল। কিরণশশীর মাতা তাঁহার জামাইকে "হাবা" বলিতেন সেই কথাই মনে পড়িল। কচি মেয়েদের কাছে বাপ মার জামাই সম্বন্ধে নিন্দা করার যে কত দোষ তাহার শেষ নাই!

কিরণশশী মাতার নিকট সকল কথাই বলিত। তিনিও খুঁটিনাটির সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। এক সময় বলিয়া ছিলেন যে 'জামাই যদি হাবাই হয় তবুত তোর দেখা উচিত যে তোর বাছার উপর অন্যায় না হয়।'

কিরণশশীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা খুব প্রগাঢ়। ভক্তিও কম নয়। কিন্তু "টাকাকড়ি রোজগার করা এক—আর রাখা এক। স্ত্রী ভাগ্যে ধন কথার মানে কি জান?—স্ত্রীরাখিলেই টাকা থাকে।" এই সকল কথা

মাতার নিকট শুনিয়া শুনিয়া ঐ বিষয়ে নিজের কোনরূপ চেষ্টা করা উচিত—ঐদিকে স্বামীর অক্ষমতা আছে, কিরণশশীর এইরূপ বোধ জন্মিয়াছিল।

নিজে তেমন ডাকা বুকো নয়—স্বামীর নিকট তাড়া পাইলেই চুপ করিতে হয়—তিনি রাগ করিবেন এই ভয়ে কাহারও সহিত সুস্পষ্ট ঝগড়া বিবাদ করিতে পারে না, অথচ শিক্ষার দোষে "যা"দিগকে একান্তই পর ভাবে—কিরণশশীর মনের ভাব এইরূপ।

স্বামীর নিকট মুখ তাড়া পাইয়া কিরণশশী লজ্জিত হইয়াছিল। রজনী চলিয়া গেলে অভিমানে নীরবে রোদন করিল। ছেলের প্রতি স্বামীর ভাল বাসা বড়ই কম বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাহাকে যে কি করিতে হইবে এ অবস্থায় তাহা স্থির করিতে পারিল না।

মাতার নিকট যাইবার ইচ্ছা হইল। মাতার উপর খুব ভাল বাসা এবং মাতার মুখেই তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া মাতাকে বড়ই বুদ্ধিমতী বলিয়া বিশ্বাস। কিরণশশী সেই দিনই বাপের বাড়ীতে পত্র লিখিলেন যে অনেকদিন তাঁহাদের দেখেন নাই। 'মা ভুলে যেতে পারেন কিন্তু মেয়ে তা পারে না।'

পরদিন রজনীর শ্বশুর নিজে আসিয়া মেয়েকে তিন দিনের করারে বাড়ী লইয়া গেলেন। রামজয় বলিয়া-দিলেন, "রজনীর ছেলেই এখন তাঁহার প্রধান খেলুড়ে। বেশী দিন না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

কিরণশশীর মাতা কন্যার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া পরামর্শ দিলেন—"কান্নাকাটি এবং যত্ন আদর করিয়া ক্রমে ক্রমে জামাইএর মন বদলান আবশ্যক। এত লোকে পারে আর তুই পারবি না? ওই ওবাড়ীর নবৌ রোজগারী স্বামীকে বাপের সঙ্গেই পৃথক্ করেছে।"

কিরণশশী বলিল, "ওঁদের মন বদল হবার সম্ভব নাই। বড় রাগী নিজে যা ভাল বলেন তাহা আমি না করিলে কখন বলেন বিবাগী হয়ে চলে যাব—কখন বা বলেন দেশ বিদেশে আরও চিকিৎসা শিখিতে যাব। আমার ভয় করে।"

কিরণশশীর মাতা বলিলেন "তুই বড় অপদার্থ। তোর হতে কিছু হবে না—তবে কৌশলে কার্য্য উদ্ধার হতে পার্‌বে। তোর শাশুড়ী যে কাশীবাস কর্‌বার কথা বল্‌তেন তার কি হইল?"

কিরণশশী বলিল "যাবার কথা সর্ব্বদাই হয়। অসুখের জন্য হচ্ছে না।"

মাতা পরামর্শ দিলেন। রজনীকে কিছু না বলিয়া পাকতঃ কার্য্য উদ্ধারের পরামর্শ হইল।

কিরণশশী এবারে বাপের বাড়ী হইতে ননদপুত্র ও ভাসুর পুত্রের জন্য খেলনাদি লইয়া গেল। রজনীকে দেখাইল যে ভাসুরের জন্য কমফর্টর বুনিতেছে। স্বামীকে বলিল "মা ও বাবা দুজনেই এখন পৃথক হওয়ার জন্য দুঃখ করেন। বলেন সময় অসময়ে দেখিবার কেহই রহিল না। যদিও এক বাড়ীতে থাকিলেই

যে সবাই দেখে তাহা নহে—তবু লাঞ্ছনা ও ক্ষতি স্বীকার করে একত্রে থাকাই ভাল। ভিটে ছেড়ে এসে অবধি ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হইয়াছে। ঝগড়া কচ্‌কচি রেষারিষি নাই। কিন্তু তেমন ভাল কই হইতেছে?”

রজনী বুদ্ধিমান হইলেও আসলে সাদা সিদে লোক। সকলেরই ভাল দিক দেখিতে উন্মুখ। মনে করিলেন স্ত্রীর এবারে বাপের বাড়ী গিয়া উপকার হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী ঠেকে শিখে মেয়েকে সদুপদেশ দিয়াছেন। আরও মনে করিলেন যে তবে ঝগড়াঝগড়ির পরে যে একটু ঝাল থাকিয়া যায়, সেই জন্যই এবারের বাড়ী ভাল এবং এখন আর ঝগড়া কচকচি নাই এরূপ কয়েকটী কথা স্ত্রীর মুখে শুনিলেন।

কিরণশশীর যেরূপ লজ্জাভয়প্রণোদিত মৃদু স্বভাব আর রজনী যেরূপ রাসভারী উচ্চপ্রকৃতির পুরুষ তাহাতে কিরণশশীর মনের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। বাপের বাড়ী খুব নিকটে, সঙ্কীর্ণমনা মাতার সহিত সর্ব্বদা দেখা হওয়া, তাঁহার কুপরামর্শ, বাপের বাড়ীতে ভাই ভাইয়ে বিবাদ, তথা কার গালাগালি মোকদ্দমা প্রভৃতির সংবাদ আসা—এই সকলই প্রধান কারণ। ছেলেটী হইয়া কিরণশশীর সন্তান বাৎসল্য প্রবল ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। ঐ সন্তান বাৎসল্যের সহিত মাতৃপ্রদত্ত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জড়াইয়া যাওয়াতে

স্বামীকে বিষয় বুদ্ধিহীন বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং "বাছার জন্তে" নিজের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল।

একদিন কিরণশশী শাশুড়ীকে বলিল, "আমার মাসিমারা এবারে গ্রহণের সময় কাশী যাবেন। মথুরা বৃন্দাবন সব দেখে আসবেন। আমি নাকি খুব ছেলেবেলা মার সঙ্গে এক বার কাশী গিয়াছিলাম—কিন্তু তথাকার কিছুই মনে নাই।"

অনাথবন্ধুর মায়ের কাশীবাস করিবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল; কিন্তু ছেলে, বউ, মেয়ে, নাতি প্রভৃতির মায়ায় কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কল্পনায় মনস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে কয়েক দিন রোগ কম থাকায় কাশী যাইতে পারা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলনা। বিশেষতঃ কেহ তীর্থস্থানে যাইতেছে শুনিলেই বাঙ্গালীর মেয়েদের তথায় যাইতে প্রবল ইচ্ছা হয়।

স্বামীকে বলিলেন, "আমাকে এইবারে কাশী লইয়া চলনা কেন? আবার যখন অসুখ বাড়িবে তখন আর যাওয়া হইবে না। তবে এদের ছেড়ে কি করে যাই?"

রামজয় বলিলেন, "আমারও মনে হইতেছিল এইবারে কাশী যাই। ঠাঁই বদলে তোমারও শরীর সারিতে পারে, আর কাশীতে গেলে মনে কেমন একটা শান্তি আসে; মায়া মোহ অনেকটা যেন কমে যায়। ছেলেরা সব মানুষ হইয়াছে, অনাথ ভাইদের নিয়ে থাকুক, আমরা কাশী গিয়ে থাকি।"

অনাথের মা বলিলেন "মেজ বৌমার বড় কাশী দেখ্‌বার সাধ, সে যেতে চায়।"

রামজয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যেতে চাইবে না কে?"

অনাথের মা। "এবারে আমার যাওয়া হইতে পারে শুনে যেতে সবাই চাচ্ছে। আমার যে সেবার দরকার বড় বৌমা তাহা কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন 'আমি কখনও কিছু দেখি নাই। মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।' আমার বোধ হয় কাশী যাওয়া ঘট্‌বে না। বড় বৌমাকে ছেড়ে, ছেলে নাতিদের ছেড়ে, আমি স্থির থাক্‌তে তো পার্‌বো না।"

এই সময়ে অনাথবন্ধু সেই স্থানে আসিলেন। শেষের কতকগুলি কথা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। বলিলেন "আমাদের পরশু থেকে এক মাসের জন্য দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইবে। তার মধ্যে বার দিনের জন্য ফৌজদারী আদালতও বন্ধ হইবে। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে এক মাস ধরে সেখানেই থাকিতে পারিব। সকলেই এখন আমাদের সঙ্গে চলুক না। ও দেশের ভাল হাওয়ায় সকলে বেশ সারিবে।"

এ প্রস্তাবে সকলেরই মত হইল। রজনী চিকিৎসা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তাঁহার ছাড়া সকলেরই কাশী যাওয়া স্থির হইল। সংসার ভাবিলেন, 'কাশীতে কালেজের ছুটীর একমাস দণ্ডীদের কাছে উপনিষদ পড়িব।' কার্য্যও এই সকল ব্যবস্থার অনুসারে করা হইল।

———***———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:○*:০—

পারিবারিক ব্যবস্থা।

করোতি নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং কিন্তু তদেবস্যাৎ যদ্ বিধের্মনসি স্থিতং ॥

৺কাশীধামে যাওয়ার পর অনাথবন্ধুর মাতা দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট বাসা লওয়া হইয়াছিল। রাস্তার উন্নতি জলের কল প্রভৃতি হইয়া কাশী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। একমাস পরমসুখে মন্দিরাদি এবং পরম সাধু ও পণ্ডিতদিগকে দর্শন করিয়া অনাথবন্ধু ও সংসার কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। পশ্চিমে শীত কালটা স্বাস্থ্যকর এই জন্য সংসার ও অনাথ ভিন্ন সকলেরই তথায় থাকিয়া যাওয়া হইল।

মাসখানেক পরে অনাথের মাতার একটু অসুখ বোধ হয়। অসুখ তেমন বেশী নয়। কিন্তু তিন দিন বাদেই অনাথ, সংসার ও রজনী কাশীতে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মায়ের অসুখ কমিয়া গিয়াছে। রজনী পিতাকে বলিলেন যে, মাতার অধিক অসুখ হইয়াছে এরূপ পত্র পাইয়া তিন জনে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঔষধেই মায়ের উপকার অধিক হয়।

রজনীর স্ত্রী শাশুড়ীকে তখন বলিল, “আমার কেমন ভয় হইয়াছিল, তাই লিখিয়াছিলাম।” পরে কোন সময়ে অন্তরালে স্বামীকে বলিল, “তুমি কাছে থাকিলে মা যেন সুস্থ থাকেন এবং আমাদেরও ভয় কম হয়। তোমরা কেহ একজন না থাকিয়া এত ছেলে পিলের ভার মা ও বাপের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সেটা কি ভাল? বাবা কি আর ছুটাছুটী ক’রে ব্যারাম সারামের জন্য বেড়াতে পারেন? তোমার ত আর চাকরী নয়। রোগ সব দেশে আছে। ডাক্তারও সব দেশেই দরকার। কলিকাতায় বেশী টাকা হয়, এখানে না হয় কম টাকা হবে। টাকা উপায়ের জন্য কি মা বাপের সেবা করিবে না?”

স্ত্রীর প্রকৃত যুক্তিযুক্ত কথায় রজনী আন্তরিক প্রীত হইলেন। নিজে স্ত্রী পুত্র বাপ মায়ের কাছে থাকিবেন, এবং এক ভাইও কাশীতে না থাকায় সাংসারিক বন্দোবস্তে যে ত্রুটি ছিল, নিজে কাশীতে থাকিলে তাহাও সারিয়া যাইবে, সুতরাং ভাল কথা আরো ভাল ভাবিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হইল, ‘দাদা এবং সংসারের কলিকাতায় আলাদা থাকিবার দরকার কি?’

অনাথবন্ধুকে পরে বলিলেন, “দাদা! আমাদের এক জনের এখানে না থাকিলে চলে না। আমি এখানে চিকিৎসারম্ভ করিতে পারি। আপনিও এখানে ওকালতি করিতে পারেন। সংসারের যে রকম চাকরী তাহা

এখানেও জুটিতে পারে, বিশেষ তাহার কাশীতে থাকিয়া পড়া শুনা করার একান্ত ইচ্ছা। আমরা সকলেই কেন এখানে থাকি না?"

কথাটা অনাথবন্ধু ও সংসার দু-জনেরই মনোমত হইল। কিন্তু অনাথবন্ধু 'ইচ্ছা মাত্রের বশবর্ত্তী হইতে নাই' —এই তথ্য শিখিয়াছিলেন। সমস্ত বিষয়টি একটু ভাবিয়া দেখিয়া বলিলেন, "রজনী তুমি কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিলে তোমার জন্য অনেক বাড়ীতে দুঃখ হইবে। হয় ত বাবার মত হবে না। আর যদি তিন জনে চলিয়া আসি, আর এখানে কিছু দিন আয় না হয়, তাহা হইলে অসুবিধাও ঘটিতে পারে। তুমি মার জন্য এখানে থাকিয়া যাও। সংসারও থাকিতে পারে, আমি এবারে কলিকাতায় যাই। তোমার একটু পসার হইলে দু চার মাস পরে আমিও আসিব। দেখ, বাবার কি মত হয়। হয় ত তিনি সংসারের ছাড়া অন্যের থাকায় মত করিবেন না।"

রামজয় পুত্রদের ইচ্ছা শুনিয়া প্রীত হইলেন, কিন্তু উহাদের ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন না। বলিলেন, "রজনী এখন কলিকাতায় অনেক বাড়ীর ছেলেদের ধাত ভাল বুঝিয়াছে বলিয়া তাহারা আর কাহাকেও ডাকে না। রজনী চলিয়া আসিলে তাহাদের বড় কষ্ট হইবে। আপন পরিবার ছাড়া সমাজ সম্বন্ধেও মনুষ্যের ত কর্ত্তব্য আছে। মা বাপের জন্য রজনীর আসিতে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক ও উচিত। কিন্তু "আমাদের"

আবার উচিত যে সাধারণের সুবিধার দিকে একটু দৃষ্টি রাখি। আমার মনে হয় যে, সংসার এখানে সংস্কৃত পড়ুক। তোমরা দুভাই কলিকাতায় থাক। বৌমারা এখানে আরও কিছু দিন থাকুন, পরে যাইবেন।”

সেইরূপ কার্য্য হইল, এবং তিন চারি মাস কাল এইরূপে বেশ চলিয়া গেল। রজনীর স্ত্রী একটু মনমরা হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পত্র লেখে যে, তাঁহার কাশীতে পসার চেষ্টা করাই উচিত। বাপ মাকে ছেড়ে থাকা ভাল নয়। কিন্তু পিতা মাতা কাশীতে কতকটা সুস্থ আছেন, এবং তাঁহার কলিকাতা ত্যাগে পিতার ইচ্ছা নাই, সুতরাং রজনী সে কথা আর তুলিতে পারেন নাই।

মধ্যে একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত কাশীতে আইসেন। তিনি সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সংস্কৃতভাষায় এবং ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়। কালেজের অধ্যক্ষের কাছে সংসার কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া তথাকার পুস্তকালয় স্থিত দু একখানি পুঁথি দেখিতেছিলেন। কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রীত হইয়া অধ্যক্ষ সাহেব সংসারকে একটু ভালচক্ষে দেখিতেছিলেন। তিনি সংসারের নাম করায় জর্ম্মণ পণ্ডিত সংসারকেই তাঁহার সহিত নেপাল কাশ্মীর এবং দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান মঠও পুস্তকালয়াদিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সংসারেরও খুব ইচ্ছা হইল। কথা স্থির হইল যে, সাহেব পাথেয় খরচ সমস্ত দিবেন, নগদ কিছু দিতে হইবে না। সাহেব যখন

শুনিলেন যে, বিধর্ম্মী বলিয়া সংসার ভৃতি স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহে, তবে একত্রে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সহপাঠীর খরচে ভ্রমণে আপত্তি নাই—তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না। প্রত্যুত প্রাচীনকালের ন্যায় তেজস্বী একজন ব্রাহ্মণকে সহকারী পাইয়াছেন বুঝিয়া প্রীত হইলেন এবং ভ্রমণান্তে অনেক টাকায় ভাল ভাল বই কিনিয়া দিবেন মনে মনে স্থির করিয়া রখিলেন। সংসার সাহেবের সহিত এক মাস কাল কাশীতে রহিলেন। পরে চারি পাঁচ মাস কাল ব্যাপিয়া তাঁহার সহিত ভারতভ্রমণে বহির্গত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল।

তখন অনাথবন্ধুর বা রজনীর কাশী আসিবার কথা উঠিলে রামজয় বলিলেন, "রজনীর কলিকাতায় পসার রহিয়াছে, এবং কলিকাতায় নিজের নানা বিষয়ে শিক্ষার সুবিধা অধিক। কাশীতে আসিলে চিকিৎসা বিষয়ে নিজের বিদ্যোন্নতি তত সহজে হইবে না। অনাথই আসুক। ওরা একজন কাছে না থাকিলে একা আমাহইতে আর চলে না।"

অনাথবন্ধু ও রজনীকে এই কথা লেখা হইল। রজনী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া, দাদাকে বলিলেন"দুজনেই যাই না কেন? সেখানেপড়া শুনা করিলে উন্নতি কেন হইবেনা? মার অসুখে সেবা করিব না?"কিন্তু পিতার ব্যবস্থায় দ্বিরুক্তি করিলেন না।

যাহা হউক, পিতার কথা অনুসারে ছাত্র দুইটির জন্য একজন ভাল লোক জুটাইয়া দিয়া অনাথবন্ধু কাশীতে চলিয়া গেলেন।

একা রজনীর কলিকাতায় থাকা যে দিন স্থির হইল, সেই দিন হইতে কিরণশশীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। অনাথবন্ধু আসিবার দুই তিন দিন পরেই অনাথের মাতা স্বামীকে বলিলেন, "রজনী যাহোক এত দিন অনাথের কাছেও ছিল, এখন বাছার খাওয়া দাওয়া কে দেখিবে? মেজ বৌমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও।"

রামজয় মত করিলেন। রজনী আসিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন বটে, কিন্তু পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া তাঁহার কাশী হইতে কোন মতেই যাইতে ইচ্ছা ছিল না। হোমিওপেথি ঔষধ আর ভাল খাটিতেছিল না বলিয়া তখন মাতার কবিরাজী ঔষধ সেবন হইতেছিল।

কলিকাতায় যাইবার সময় রজনীর স্ত্রী শাশুড়ী ও "যা"য়ের নিকট অনেক কাঁদিয়া গেল, কিন্তু কলিকাতায় আলাদা থাকিবার বন্দোবস্তে সে যে বড়ই প্রীত হইয়াছে, তাহা রামজয় বা তাঁহার পত্নীর অগোচর ছিল না। নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতেই মেজবৌএর মনে তাঁহাদের সহিত একটু ছাড়াছাড়ি ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেবর সকলে কাশীতে বদ্ধ হইয়া পড়িলে এবং তাহার স্বামীর কলিকাতায় আলাদা থাকিবার ব্যবস্থা হইলে রজনীর স্ত্রী বড়ই সুখী হইল। এই ব্যবস্থায় বাপের বাড়ীর কাছে এবং স্বামীর পসারের স্থানেই তাহাদের আলাদা থাকা হইয়া গেল। রজনীর শাশুড়ী কন্যাকে বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মের স্থান পৃথক্

সুতরাং আহার পৃথক্ হইয়া কিছুকাল চলিলে সম্পত্তি পৃথক্ সহজেই ঘটিয়া যাইবে। কোন ঝি চাকরের মুখ দিয়া একটা শক্ত গোছ কথা বলাইলে রজনীর ভ্রাতারা কেহ রজনীর আয়ের এক পয়সাও লইবে না।

কিরণশশী সেই জন্যই স্বামীর কাশীতে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মাতা স্থির করিয়াছিলেন যে রজনীর একবার কাশীতে পসার দাঁড়াইলে, কালক্রমে যখন কিরণশশীর শ্বশুর শাশুড়ীর ৺কাশী প্রাপ্তি হইবে তাহার পরও কন্যা জামাতার সেখানেই পৃথক্ থাকা হইয়া যাইবে। কিরণশশী এক্ষণে মনে করিল যে তাহার নিজের চেষ্টাতেই সে উদ্দেশ্য অধিকতর সুন্দররূপে সাধিত হইতে চলিল।

কিসে কি হয় কে বলিবে? কিন্তু দুই দিনের কীট মনুষ্য, আপনাকেই কার্য্য পরম্পরার নিয়ন্তা মনে করে, এবং অতি ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম উদ্দেশ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে!

অনাথবন্ধুও যে এ সকল বুঝিতেন না তাহা নহে। তবে রজনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ এত প্রগাঢ় ছিল এবং রজনীর পিতা মাতা ও ভ্রাতার প্রতি স্নেহপূর্ণ মন তিনি এরূপ সুন্দর বুঝিতেন, যে তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল কিরণশশী নিজের মতলব মত কার্য্য যত অধিক করিতে পারিবে ততই রজনী অসুখী হইবে। অনাথবন্ধু মনে করিতেন, 'রজনী তাহার সঙ্কীর্ণচিত্ত স্ত্রীকে চিরকালই দমনে রাখিবে। সকল বৌ সমান হয় না। সকল ছেলেও

সমান হয় না। কিন্তু সেজন্য হাল ছাড়িয়া দিয়া বৌকে তাহার মতলব মত কার্য্য করিতে দিলে সংসার চলে না। রজনীর মন অন্যরূপ হইলে স্বতন্ত্র কথা হইলেও হইতে পারিত।'

অনাথবন্ধু দেখিয়া ছিলেন যে তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার পিতা মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সকলেরই সহিত পূর্ণ-স্নেহ-সম্পন্ন। কোন জিনিস আলাদা করিয়া সংগ্রহের প্রবৃত্তি তাহার স্বভাবতঃই একান্ত কম। থান কতক কাপড় ও গহনা ছাড়া "নিজের" বলিয়া অন্য কোন জিনিসই নাই। খেলনা, বই প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে পাইয়াছিল বা কখন ক্রয় করিয়াছিল, তাহা দেবর পুত্র বা 'যা'দিগকে মুক্তহস্তে বিলাইয়া দিয়াছেন। পরের বাড়ীর ছেলে কেহ বেড়াইতে আসিলে যখনই তাহার হাতে কিছু দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় তখনই দিয়া থাকে।

এইরূপে বাঙ্গালী গৃহস্থের বড়বৌ হইবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত, গৃহস্থালীর সকল কার্য্যে নিপুণ, সকলের প্রতি স্নেহ পরিষিক্ত হৃদয়, গুরুজনে এবং দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ স্ত্রীর সহিতও সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ে যে মতের অমিল হয়, তাহা অনাথবন্ধু দেখিয়াছিলেন। সে সকল সময়ে ত স্ত্রীর মত চলিতে দেন না এবং না দেওয়াতে ত উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কমি হয় না! যে বারে কোন

বিষয়ে নিজের ভুল হইয়াছিল, জিদ করা উচিত হয় নাই বলিয়া পরে বুঝিয়াছেন সেবারেও তাঁহার স্ত্রীই তাঁহার কার্য্যের যে অংশ ভাল তাহাই দেখাইয়াছেন। ভুলের জন্য যে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই তাহা বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া অনাথবন্ধুর মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামীর ও সংযুক্ত পরিবারের শাসনে থাকায় নিজের মতলব চালাইতে না পারিলেই যে অসুখী হন তাহা নহে। পুরুষানুক্রমিক বশ্যতার ফলে স্বেচ্ছাবৃত্তির প্রতিরোধে উহাঁদের তেমন কোন কষ্ট হয় না। বরং এইরূপে "সংযম অভ্যস্ত থাকায়" উহাঁরাই পুরুষদিগের অপেক্ষা মনের কষ্ট কম পান। ইচ্ছাবৃত্তির প্রয়োগে যে স্থায়ী সুখ নাই, পরার্থে ঐ বৃত্তির নিরোধ অভ্যাসেই যে অধিকতর শান্তি, ইহাতে অনাথবন্ধুর স্থির বিশ্বাস।

কিরণশশীর সম্বন্ধে রজনীর মন কিরূপ তাহা বুঝিয়া অনাথবন্ধু কখনও তাঁহাদের মেজ বৌয়ের কার্য্যের নিন্দা করিতেন না। সকল সময়েই উহার মধ্যে ভাল অংশটুকুই দেখাইতেন। তাহার গুণগুলিরই উল্লেখ করিতেন। দোষের কথা রজনী বলিলে "ক্রমে সারিয়া যাইবে" বলিতেন। তিনি জানিতেন যে সাধ্বী ও পুত্র প্রসবিতা স্ত্রীর যত দোষই থাকুক তাহার প্রতি স্বামীর মন সম্পূর্ণ রূপে বিরূপ হইতে পারে না এবং পরিজনেরও কখন তাহা হওয়া উচিত নহে। স্ত্রীর দোষ উল্লেখ করিলে লোকে প্রথম প্রথম লজ্জিত

হয়। স্ত্রীকেই বকে। সুধু দোষের উল্লেখ ক্রমশঃই চলিতে থাকিলে ভাবে "দোষের কথা আমি জানি। অত বলে কি হয়? আর কখনও কোন বিষয়ে ভাল বলেন না কেন? অতটা বিরূপতা ভাল নয়।"

অনাথবন্ধু ভ্রাতার মানসিক সুখের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিতেন।

রজনী তাহার স্ত্রীকে কখন কোন দোষের জন্য বকিয়াছে ও রাগ করিয়াছে—কিন্তু তাহার ভাসুর তাহার সেই কাজের মধ্যে ভাল ভাগটুকু দেখাইয়া ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন এরূপ দুই একবার হওয়ায়, রজনীর স্ত্রীর তাহার ভাসুরের উপর একটু ভিতরে ভিতরে ভক্তি ছিল। মাতার পরামর্শেও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

-***-

মাতৃ বিয়োগ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ইহার পর এক বৎসর কাল অনাথবন্ধুর মাতা কাশীতে রোগ ভোগ করিলেন। প্রাচীন বয়সের রোগ দু দশ দিন খুব বাড়ে, আবার দু দশ দিন কিছু ভাল যায়—কিন্তু ক্রমশঃই শরীর ক্ষয় হইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরের পর খুব অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় অনাথের মাতা ক্ষীণ স্বরে অল্পে অল্পে অনাথবন্ধুকে বলিলেন. "রজনী সাত আট দিন ধরে এখানে ছিল, দুদিন একটু ভাল বোধ হওয়ায় জেদ করিয়া কলিকাতায় ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। কিছুতে যেতে চাইলে না—বৌমাকে রেখে গেল। সে ডাক্তার মানুষ বুঝ্‌তে পেরেছিল। আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। তাকে আস্‌তে তারে খবর দাও; তোমাদের সকলকেই একত্রে দেখে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে!"

অনাথবন্ধু কিছু পূর্ব্বে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া রজনীর আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। খবর দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া রোগীর মুখে একটু সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিল।

সেই দিন বৈকালে অনাথের মাতা বড়ই ছট্ ফট্ করিতে করিতে বলিলেন "আমার বড় প্রাণ কেমন করিতেছে। রজনী কতক্ষণে আসিবে?"

অনাথবন্ধু বলিলেন যে পরদিন বেলা দুই প্রহর নাগাদ আসিবে।

ইহার পরক্ষণেই অনাথবন্ধুর মাতা চক্ষু বুজিলেন। একটু তন্দ্রা আসিল। কিছু পরে হঠাৎ সুস্পষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তোমরা সবাই আমার রজনীকে তোল। রজনী জলে জাহাজের তলায় পড়িয়াছে—উঠিতে পারিতেছে না!"

রোগী সবলে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুখে জল দিতে দিতে চৈতন্য হইল। চক্ষু চাহিয়া অনাথকে বলিলেন "কৈ রজনী? সে যে আমার মাথায় হাত বুলাইতে ছিল।"

অনাথ বলিলেন, রজনী কাল দুপুরের মধ্যে আসিবে। অনাথের মাতা বলিলেন "না, রজনী যে এইমাত্র আমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া হাত বুলাইতেছিল।"

কবিরাজ হাত দেখিয়া একটু মৃগনাভি ও মকরধ্বজ দিলেন, রোগী আবার তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিটা কোনরূপে কাটিয়া গেল। কিন্তু শেষ রাত্রি হইতেই শ্বাসে ও নাড়ীতে বিশেষ দোষ দেখা গেল। পরদিন প্রাতে অনাথের মাতা অনাথের স্ত্রীকে ইশারা করিয়া কানের কাছে মুখ আনিতে বলিলেন। স্বর বড়ই অস্পষ্ট।

বলিলেন, "সকলকে ডাকাও।" রামজয়, অনাথ, সংসার, নলিনী, আনন্দনাথ, (তিনি চারিদিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন) সকলেই নিকটে আসিলে অনাথের মাতা সকলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখ হর্ষযুক্ত হইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "রজনী"। অনাথ কথা শুনিতে পাইলেন না কিন্তু ঠোঁট নড়াইতেই বুঝিতে পারিলেন যে মাতা রজনীর কথা বলিতেছেন। উত্তর দিলেন "আজই খানিক বাদে আসিবে।"

কবিরাজ হাত দেখিয়া বাহিরে গেলেন। অনাথ সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেলে বলিলেন "এ সময়ে গঙ্গাতীরে লইয়া যাও। এখন যেন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রুটী হয় না।"

স্নেহময়ী মাতার সম্বন্ধে এরূপ সংবাদে অনাথবন্ধুর মনে যে কি হইল এবং পরিবার বর্গের মধ্যে যে কিরূপ ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, তাহা বর্ণনা করা বড়ই কষ্টকর এবং বাঙ্গালী পাঠককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা বাহুল্য মাত্র।

সকলকে কথঞ্চিৎ থামাইয়া গঙ্গাযাত্রা করা হইল। রামজয়ও যষ্টিতে ভর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন। পত্নীর চিরকালের সাধ যে তাঁহার পা ছুঁইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরে পুত্রপৌত্র কন্যা জামাতা দৌহিত্রাদি পরিবৃত হইয়া মৃত্যু হয়। বহু সহস্র বার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীর্ণদেহ বৃদ্ধ মর্ম্মান্তিক কষ্ট গোপনে রাখিয়া আজ সেই আযৌবনের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাইতেছেন !

গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে সেই পবিত্র বায়ু স্পর্শে মুমূর্ষু যেন একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন। আবার একবার তন্দ্রা পরিষ্কাররূপে কাটিয়া গেল। গঙ্গোদক মুখে দেওয়ার পর মনে মনে ইষ্টমন্ত্র বলিলেন। ইঙ্গিতে পতির পাদোদক মস্তকে দিতে বলিলেন। তৎপরে যেন কাহারও মস্তকে হাতদিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এইরূপ ভাবে কম্পিত হস্ত তুলিয়া ক্ষীণজড়িত স্বরে বলিলেন "রজনী বাপ আমার!"

রজনী আসিয়া পৌঁছিবার সময় হইল না দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতার ঐ কথা যে মনে একান্তই লাগিয়াছে, শেষ সময়ের এই কথায় অনাথবন্ধুর তাহা আরো বেশী বোধ হইল। কিন্তু এই প্রলাপ বাক্যের পরক্ষণেই মুমূর্ষু অনাথের দিকে চাহিয়া স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেন যে দেখা গেল যে জ্ঞানের ত্রুটি হয় নাই। ভগ্ন হৃদয় জীর্ণ শরীর স্বামীকে এই আঘাতের পর বিশেষ করিয়া দেখিতেই জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর আদেশ করিলেন।

মুমূর্ষুর পক্ষে উপযুক্ত দৈব ক্রিয়া সমাধা হইল। অনাথের মাতা তখন সেই হরিধ্বনির মধ্যে বুকে হাত জোড় করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, এবং সহজে যেরূপ নিদ্রা আইসে সেইরূপে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

——X——

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শোকের উপর শোক।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসার মিয়মতীব বিচিত্র ॥
কস্যত্বং বা কুতো আয়াত তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

দাহ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবার জন্য অনাথবন্ধু মাতার মৃত শরীরের নিকট রহিলেন। ভগ্ন শরীর ভগ্ন হৃদয় পিতাকে ও মেয়েছেলেদের বাটিতে ফিরাইয়া লইয়া সংসার বাসার দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। ঘাট হইতে বাসা খুবই নিকট।

সেইদিন বৈকালে অনাথবন্ধু পিতার পার্শ্বে সময়োচিত বেশে বসিয়া অছেন। রামজয় বলিলেন,"ওত ভালয় ভালয় গেল, আমার অদৃষ্টে আরও কি আছে? কাল যখন রজনী জাহাজের তলায় পড়িয়াছে এবং উঠিতে পারিতেছেনা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল সে কষ্টের শব্দ তোমার মনে আছে? আর তার পর হইতেই রজনী আসিয়াছে, ওর কাছে কাছে আছে এইরূপ দুতিন বার বলিয়াছে তাহাও দেখিয়াছ? সেই চীৎকারের পর হইতেই আমার বুকের মাঝখানে কি একটা বেদনা হইয়াছে। আজ যাহা হইল তা যে হইবে, আজ কয়েক বৎসর হইতেই সকলেরই জানা কথা। তবে অনেক বার অসুখ কমে কমে আসে, এবারে অসুখটা যেন একটু বেশী কমে ছিল, তাই কলিকাতা থেকে

রাজবাড়ীর টেলিগ্রাম আসিলেও রজনী যথন কলিকাতায় ফিরে যেতে চাইলে না আমি তথন জিদ করে রজনীকে পাঠাইয়াছিলাম। ভাল কাজ করি নাই। রজনী দেখিতে পাইল না।—ওর বিশ্বাস যে, রজনী আসিয়াছিল।"

এই কথার পর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা অনাথ! আজ ত রজনীর আসিবার কথা! রজনী আসিল না কেন?"

অনাথবন্ধু এই সমস্ত কথাই ভাবিতেছিলেন। পিতার কাতর বাক্যে তাঁহারও সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। রজনী কেন আসিয়া পঁহুছিল না, তাহার কোন সদুত্তর মনে হইতেছিল না। বিষম বিপদের আশঙ্কাই মনে উদিত হইতে লাগিল।

পিতার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধোপরি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিয়া রামজয় মাথা তুলিলেন। বলিলেন, "সংসার সবাইকে থামাইতে পারিতেছে না। তুমি একটু দেখ। সে গেছে কিন্তু তোমাদেরই আছে। স্বর্গে গিয়াও তোমাদেরই কল্যাণ প্রার্থনা করিবে। আমি একটু চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি। আমার পনর বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পিতামাতা যান। তাহার পর আজ ষাট বৎসর আমি কোন প্রকার শোক পাই নাই। প্রথম বয়সে কিছু দারিদ্র্য কষ্ট পাইয়াছিলাম মাত্র। চাকরী করিতে

করিতে কিছু অধিক বয়সে বিবাহ করি। সেই অবধি বোধ হয় আমার মত সুখী কেহ কখন ছিল না।”

বৃদ্ধ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই বিবাহ দিনের দশম বর্ষীয়া বালিকা পত্নীর ছবি দেখিতে পাইলেন। আর এই সুদীর্ঘকালের শত শত সহস্র সহস্র ভক্তি ভালবাসার কথা কয়েক মিনিটের মধ্যে মনের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণে বৃদ্ধের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল।

তিনি অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া অনাথবন্ধুকে বলিলেন, “তুমি ওঘরে যাও। আর সবাইকে দেখ।”

অনাথবন্ধু মাতৃবিয়োগের ও পিতার অসুস্থ শরীরের কথা ভাবিতে ভাবিতে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। পিতার এবারের স্বর তত শুষ্ক নয়—পিতার কাঁদিবার ক্ষমতা হইয়া তিনি কিছু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং ভগিনী স্ত্রী প্রভৃতির নিকট পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গেলেন।

বলিলেন,“সবাই তোমরা বাবাকে দেখ। বাবা তোমাদের কান্নায় যেন আরও বেশী কষ্ট পাইতেছেন। চক্ষে মুখে জল দিয়া বাবার কাছে যাও। মা এখনও আমাদেরই আছেন। স্বর্গে গিয়া আমাদের সকলকে দেখিতেছেন।”

বলিতে বলিতে অনাথবন্ধু মাটিতে বসিয়া পড়িলেন ও নিজে কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে সে রাত্রি গেল।

ট্রেনের সময় পার হইলেও রজনী আসিল না দেখিয়াই অনাথবন্ধু কলিকাতায় রজনীর শ্বশুরকে, আনন্দনাথের

পিতাকে টেলিগ্রাফ করিলেন—"মাতা আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াছেন। পিতা রজনীর সংবাদের জন্য বড়ইব্যাকুল। অবিলম্বে যেন উত্তর দেন।" রজনীকে ও পুনর্ব্বার টেলিগ্রাফ করিলেন।

পর দিন আনন্দনাথের পিতার নিকট হইতে জবাব আসিল, "এখানকার সংবাদ বড়ই ভয়ানক। রজনী সাঁকরাইলে একটি চিকিৎসায় গিয়াছিলেন। 'টগ' ষ্টীমারের ধাক্কায় উলুবেড়িয়ার ষ্টীমার ডুবি হইয়াছে। ঐ ষ্টীমারে রজনী সাঁকরাইল হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গের চাকর তীরে উঠিয়াছে। রজনীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বেহাইকে দেখিও। আনন্দকে কাশীতে রাখিয়া নিজেই বরং কলিকাতায় আইস।"

অনাথবন্ধু দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া গিয়া টেলিগ্রাম হাতে লইয়াছিলেন। উহা পড়িয়া অনাথবন্ধুর মাথা ঘুরিল। তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা যে ভয়ানক ছবি দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, সেই চিত্র মনে উঠিল। 'স্নেহের ভ্রাতা ষ্টীমার ডুবিতে জলে পড়ায় সাঁতার দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জাহাজের তলায় পড়াতে উঠিতে পারিল না!'

টেলিগ্রাম আসিয়াছে এই সংবাদ রামজয়ও পাইয়াছিলেন—মেয়ে ছেলেরাও শুনিয়াছিল। চাকর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমরা দৌড়ে এস, বড় বাবুর মুখে জল দাও, তিনি ভ্রমি গিয়াছেন।"

অনাথবন্ধুর মাথা ঘুরিয়া তিনি বসিয়া পড়িয়াছিলেন। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু চাকরের চীৎকারে সকলেই দৌড়িয়া আসিল এবং তারের খবর যে বড়ই ভয়ানক তাহা বুঝিয়া সকলেরই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনাথবন্ধুর মুখে জল দিতে হইল না। সংসার টেলিগ্রাম হাতে লইয়া একটু পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের একি হোল! বাবার কি হবে!"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "বাবা একলা রহিয়াছেন"। এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ পিতৃ সমীপে গেলেন। বৃদ্ধ অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় দুই হাতের উপর মুখ দিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছিলেন। পদ শব্দে মুখ তুলিয়া অনাথবন্ধুর রক্তহীন বিশুষ্ক মুখ দেখিলেন। শুষ্ক অথচ স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার জাহাজ?"

অনাথবন্ধু পিতার স্থৈর্য্যে বিস্মিত হইলেন এবং তাহা হইতে নিজেও যেন মনে একটু বল পাইয়া উত্তর করিতে পারিলেন, "সাঁকরাইল গিয়াছিল—উলুবেড়িয়ার জাহাজ।"

রামজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার কাছে তোমার মা স্বপ্নেও কথন মিথ্যা বলেন নাই। মৃত্যুকালে সবই তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন। সেই দিন থেকেই আমি এইরূপ সংবাদ কখন আসে কখন আসে তোলাপাড়া করিতেছি। মনের ভিতর কোনমতেই আশা হইতেছিল না। আমাকে এই ভয়ানক খবরের জন্ম তিনি অনেকটা প্রস্তুত করে গেছেন।

কখন কোন কাজে কি তাঁহার ত্রুটি হইত? বাবা রজনী!! আমার এ কি করে গেলি!"

অনাথবন্ধু পিতাকে ঘেঁষিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন। কণ্ঠ শুষ্ক, দেহ কম্পিত, চক্ষে জল আসিতেছে না, যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমনি বোধ হইতে লাগিল। রজনী নাই একি সম্ভব!

অনাথবন্ধুর কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়া রামজয় বলিলেন তেমন "ঝড় ঝাপ্‌টার কথা কিছু কাগজে দেখা যায় নাই ত?"

অনাথবন্ধু। "টগ ষ্টীমারের ধাক্কায় জাহাজ ডুবি হয়েছে।"

রামজয় সোজা হইয়া বসিলেন, চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি! মাতাল গোরা কাপ্তেনের গোঁয়ারতুমিতে আমার অমন রত্ন গেল! দেশের যে বিচার তাহার অবশ্যই কিছু হইবে না"।—পরক্ষণেই মৃদুস্বরে বলিলেন "ভগবানের মার। কত পাপই করিয়াছিলাম তাই এমন হইতেছে। বাবা অনাথ! আমার সব চেয়ে আশা যে রজনীর উপর ছিল! রজনী বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে বলিয়া যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল! সেই অহঙ্কারের জন্যই কি ভগবান আমার এমন করিলেন!"—

রামজয় আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উদরাময় রোগ সম্বন্ধে যে অতি সুন্দর চিকিৎসা গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিতেছিল, এই সেদিন যে তাহা আমাদের

শুনাইয়া গেল। বাঙ্গালাটা দশজন ডাক্তারে যদি ভাল বলেন তবে ইংরাজীটা, বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত বলিয়া পরে ছাপাইবে! বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্ট—আর আমি মহাপাতকী বেঁচে রইলাম, আমার অদৃষ্ট। সে সতী সাবিত্রী সবাইকে রেখে গেছে। একষ্ট পেলেনা—জুড়িয়েছে!”

চারিদিকে রোদনের ধ্বনি। রজনীর মত পুত্র, রজনীর মত ভ্রাতা—রজনীর মত দেবর—রজনীর মত স্বামী যে পরিবার হইতে হঠাৎ এরূপে গিয়াছে সে পরিবারের যে কি শোক তাহা বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমে সংবাদটা যেন স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ণ বিশ্বাসই হয় না। তাহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি যে হইয়াছে তাহা যেন বুঝিতে পারা যায় না!

মাতার স্বপ্ন দেখার পূর্ব্বদিন বৈকালে অনাথবন্ধু রজনীকে এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে, ‘মাতা অনেকটা সুস্থ আছেন।’—ডাক্তারেরা তাহাই বলিয়াছিলেন। নিজেরও পরিজনবর্গের দেখিয়া শুনিয়া তাহাই বোধ হইয়াছিল। কেবল কবিরাজ মাথা নাড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে কবিরাজ মহাশয় সহজেই মন্দ দেখেন এবং অন্যে যাহা বলিবে তাহার বিরুদ্ধ মত খ্যাপন করিতেই ভাল বাসেন। যে অপ্রিয় সংবাদ দেয় তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে সহজেই প্রবৃত্তি কম হয়।

অনাথবন্ধুর এক্ষণে মনে হইতেছিল যে কবিরাজের মতে বিশ্বাস করিয়া যদি সেই দিনই রজনীকে আসিবার জন্য

টেলিগ্রাম করিতেন—'মাতা একটু ভাল আছেন' বলিয়া ভরসা দিয়া না পাঠাইতেন, তাহা হইলে রজনী সেই রাত্রেই চলিয়া আসিত—সাঁকরাইল যাওয়া হইত না। তাহা হইলে তাঁহার অমন ভাই এরূপে এ বয়েসে যাইত না! সকল সময়ে অনাথবন্ধু নিজের ত্রুটি দেখিতেই উন্মুখ।

কথায় বার্ত্তায় কার্য্য ক্ষমতায় রজনীই বাড়ীর সেরা। মনের উদারতায়, প্রীতি প্রবণতায়, চরিত্রের উৎকর্ষে, কাহারও অপেক্ষা কম নয়। নিজে ভাল ডাক্তার, মাতার চিকিৎসায় এবং সেবায় বরাবরই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার কাশীতে আসা সম্বন্ধে পিতার মত না হওয়ায় মাতার সেবায় অনেকটা বঞ্চিত হইয়াছিল। মাতার এবারের অসুখে কোন চিকিৎসাতেই যে অধিক ফল কিছু হইবে না রজনী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তবে "কবিরাজী ঘি তেলে যদি কিছু উপকার হয়" তাহার এই রূপ একটু আশা ছিল এবং সেই জন্যই সেই রূপ চিকিৎসার অনুমোদন করিয়াছিল। এবারে কলিকাতায় ফিরিতে চায় নাই, শেষে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, প্রত্যহ বৈকালে যেন মাতার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছে, আবশ্যক হইলে সেই রাত্রেই রওয়ানা হইবে। কার্য্যও সেইরূপ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ রোদনাদি হইলে রামজয় অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন "সংসার এখানে থাকিল, তুমি কলিকাতায় যাও। যদি তাহার শরীর দেখিতে পাওয়া যায় দেখিবে

না? চাকর বাকরে বাসা লুঠপাঠ করিবে কিন্তু তাহার বহি এবং যন্ত্রাদি তাহার বড় যত্নের জিনিস ছিল। সেগুলি রক্ষা করা আবশ্যক। তাহার নিজের লিখিত কাগজ পত্র অমূল্য—সেগুলি বাঁচান উচিত। আর কোন জিনিস পত্রই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সেদিকে যতদূর সম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া আসিবে। মানুষ কোন সময়েই কর্ত্তব্য ছাড়া নাই।”

একটু পরে বলিলেন, “ভগবানের মার কত শক্ত মার—পৃথিবী যে কি তাহা এতদিনে আমি সুস্পষ্ট বুঝিতেছি। তোমাদের, বৌমার, আর আমার প্রদোষের বড়ই অল্প বয়সেই জানিতে হইল! ভগবান এ বুড়া হাড় কতদিনে যে জুড়াইতে দিবেন তাহা জানি না! তোমার মার কাছে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই কি হইবে না? আমি তাহাকে বরাবর বলিতাম ‘তুই আগে যাস, কিন্তু আমার যেন তারপর মাস পার না হয়।’ তার ইচ্ছা মত সব হোল। আমি রজনীকে তার মার সেবা করিবার জন্ত এখানে থাকিতে দি নাই, কিন্তু সে দেহ ছেড়েও (শোকে রামজয়ের স্বর ভগ্ন ও বাক্য রুদ্ধ প্রায় হইয়া আসিল) এসে তার মাকে নিয়ে গেছে।—রজনী! আমাকেত তুই কার চেয়ে কখন কম ভালবাসিস্ নাই—আমাকেও নিয়ে যা বাপ!”

সেই দিনই অনাথবন্ধু সজল নেত্রে ভগ্ন হৃদয়ে কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। পিতা সঙ্গে একজন হিন্দু-

স্থানী চাকর দিলেন। কাশীতে লোকজন কম আছে প্রভৃতি অনাথবন্ধুর কোন আপত্তি শুনিলেন না। সংসারকে দিয়া অনাথবন্ধুর রওয়ানা হইবার কথা আনন্দনাথের পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন।

এই গভীর শোকের মধ্যেও সাবেক কালের ধরণে শিক্ষিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ, অনাথবন্ধুর এবং পরিবারস্থ অন্য সকলেরই যন্ত্রণা লাঘব চেষ্টা এবং সর্ব্ব প্রকারের তত্ত্বাবধান ত্যাগ করেন নাই!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলং ;
বিদ্ধিব্যাধিব্যালগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং॥

অনাথবন্ধু মেল ট্রেণ হইতে ভোরবেলা হাবড়া ষ্টেসনে নামিয়া দেখিলেন যে, আনন্দনাথেদের বাড়ীর একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছেন।

আনন্দনাথের পিতা সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি অনাথের পিতার টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য নিজেই ভোরবেলা ষ্টেসনে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার এ বয়সে অসুখ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বাড়ীর সকলে বিশেষ আপত্তি করায় একজন ভাল লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন, "এমন বিপদের সময় যদি একটু ওদের না দেখিব, তবে বেঁচে আছি কেন? আহা! রজনীকে দেখ্‌লে যেন চক্ষু জুড়াইত। কলিকাতার সকল ভদ্র লোক যেন তাহার জন্য কাঁদিতেছে। কেবল জন কয়েক ডাক্তার তাহার পসারটা মনে করে হয় ত তত দুঃখিত নয়। × × × ডাক্তার নাকি বলেছে—'অত বেশী বাড়্‌লে সইবে কেন?'—এমন পাষণ্ডও বাঙ্গালীর ঘরে জন্মায়!"

অনাথবন্ধু নলিনীর শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া পঁহুছিলে আনন্দের পিতার নিকট সমস্ত শুনিলেন। রজনীর দেহ পাওয়া যায় নাই। পাইবার সম্ভাবনাও আর নাই। আনন্দনাথের পিতা জল পুলিসের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরে গ্রামে গ্রামে সন্ধান লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ ষাটটী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, আরও বোধ হয় ততগুলিই পাওয়া যায় নাই, এই রূপই অনেকে আন্দাজ করিতেছে। জাহাজ ডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ভদ্রলোকের বাড়ীর।

আনন্দনাথের পিতা রজনীর বাসায় রজনীর দরোয়ান ছাড়া নিজেরও দরোয়ান রাখাইয়াছেন, এবং ভিতরের ঘর-গুলি বন্ধ রাখাইয়া বাহিরে নিজেরও একটা ভাল, তালা দেওয়াইয়াছেন। রজনীর শ্যালক মাতাল অবস্থায় আসিয়া পূর্ব্বদিন বৈকালে যে অভদ্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছিল, আনন্দ নাথের পিতা অনাথবন্ধুকে সে কথা কিছু বলিলেন না।

সে আসিয়া আনন্দনাথেদের সরকারকে বলিয়াছিল, "এখন বাসার সব জিনিস আমার ভগিনীর, তুমি চাবি দিবার কে? আমরা হেপাজত করিব। জিনিস যদি খোয়া যায় তবে তার দায়ী কে হইবে?" কথার জবাব কেহ দেয় নাই। কিয়ৎক্ষণ চেঁচাচেচি করিয়া অগত্যা চলিয়া গিয়াছিল। ছোঁড়ার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, এই সময়ে দু দশ বোতলের রেস্ত সংগ্রহ করিয়া লয়!

কলিকাতার অনেকস্থলে আচারভ্রষ্ট লোকেদের মধ্যে যে কত স্বার্থ-পরতা বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং শিষ্টাশিষ্ট আচারের বোধ যে কত কমিতেছে, তাহা মনে করিলে ইংরাজী শিক্ষা হইতেই এত কালের পর বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে বলিয়া ভয় হয়। এখন কলিকাতায় বেতনভোগী ফিরিঙ্গি নর্স (শুশ্রূষাকারিণী) রাখিয়াই রোগীর সেবা আরম্ভ হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনে 'কার্ড' রাখিয়াই সেবা সারিতে ইচ্ছুক ! আত্মীয় কাহার মৃত্যু হইলে জিনিস পত্র রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে কতক চুরি ও কতক জিনিসপত্র নিলামে চড়াইয়া সস্তাদরে নিজেরাই কেনার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। তথায় কোন কোন স্থলে মৃতের সৎকার করিতে এখন আর আত্মীয়েরা যাইতে চাহে না। "শ্মশানধূমের" গভীর শিক্ষা কলিকাতার বাঙ্গালী ভদ্র লোকেরাও কেহ কেহ ত্যাগ করিতে উন্মুখ ! খৃষ্টানদের "সোয়ারিস কোম্পানির" ন্যায় দেশীয় অন্ত্যেষ্টি কোম্পানির প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে !

হাত মুখ ধুইয়া অনাথবন্ধু রজনীর বাসায় গেলেন। আনন্দনাথের পিতা তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন। অনাথ বন্ধু বলিলেন, " আপনার গিয়া কাজ নাই, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

আনন্দনাথের পিতা বলিলেন, "এখন কলিকাতার বাসা তুলিয়া দাও। আমি লোকজন দিতেছি। সমস্ত জিনিস-পত্র এ বাটীর দুইটা খালি ঘরে আনিয়া বন্ধ করিয়া

রাখা যাইবে। খুজরা জিনিসপত্র দুটা বড় সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া তুমি কাশীতে লইয়া যাইও। যদি স্নেহটী পাওয়া যায়, এই ভরসায় আমি তোমাকে আসিতে বলিয়াছিলাম। আহা! অমন ছেলে কি হয়। কি সর্ব্বনাশই হ'ল! আমার আনন্দের ছোট ভাই যেন গিয়াছে, এমনি মনে হইতেছে। আমার মাঝে অসুখ হইলে কি যত্ন ও সেবাই করিয়াছিল! কলিকাতা সুদ্ধ সকলেই হায় হায় করিতেছে। বেয়ান সকলকেরেখে গেছেন বলেই জেনেছেন। কিন্তু বেহাই কি যন্ত্রণাই পেলেন! কচি বৌটীর কি দশাই করে গেল!"

রজনীর বাসায় গিয়া তথাকার দৃশ্য অনাথবন্ধুর হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কাপড় চোপড়, জুতা চিঠিপত্র যেখানকার যাহা ঠিক রহিয়াছে। কেবল সেই স্নেহের ধন, অনেক আশার স্থল, গৃহের উজ্জলরত্ন, বাল্যাবধি লেখা পড়া কথাবার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ সুখ দুঃখের সহচর প্রাণের ভ্রাতা নাই! 'রজনী নাই' অনাথবন্ধুর যেন বিশ্বাসই হইল না। মনে হইল 'জলে ভাসিয়া গিয়া কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে কি উঠিয়া থাকিতে পারে না?' পরক্ষণেই মাতার স্বপ্ন দর্শন ব্যাপারের স্মৃতি সে আশা টুকুকে যেন দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

'রজনী নাই' এমন অবস্থা ত অনাথবন্ধু কখন একবারও ভাবেন নাই! নিজের শরীর অপটু নয়, কিন্তু রজনীর স্বাস্থ্য তিন ভ্রাতার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। রজনীই সকলের অপেক্ষা অধিক দিন থাকিবে। অনাথবন্ধুর অবর্ত্তমানে রজনীই

তাহার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—অনাথবন্ধু এমন কথাও অনেক সময়ে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু রজনীর অবর্ত্তমানের কথা কখন ভাবেন নাই!

রজনী যে চেয়ারে বসিত তাহার নিকটে গিয়া অনাথবন্ধু মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাতৃ বিয়োগাশৌচ জন্য সঙ্গের চাকর একখানি কম্বল আসন পাতিয়া দিল। অনাথবন্ধু উঠিয়া তাহাতে বসিলেন এবং মাতৃবিয়োগ এবং পিতার অসাধারণ যাতনার কথা রজনীবিয়োগজনিত দুঃখের ভিতরে তাঁহার মনে আবার স্থান পাইল।

অনেকক্ষণ হেঁট মাথায় গালে হাত দিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

আনন্দনাথের পিতা যে সকল লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহারা সেই ঘর ছাড়িয়া অপর সকল ঘরে জিনিস পত্র যাহা ছিল তাহার ফর্দ্দ করিলেন। অনাথবন্ধু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া সে ঘরের আসবাবেরও ফর্দ্দ করিলেন। চিঠিপত্র, লেখা খাতা, হাতবাক্স প্রভৃতি দুইটা সিন্ধুকে—পূর্ব্বেই যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন সেই মত—বন্ধ করা হইল। অপর সমস্ত জিনিস নলিনীর শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হইবে বলিয়া আনীত গোরুর গাড়িতে বোঝাই হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যেই বাহিরে রজনীর বাসার চাকরদিগের মাহিনার হিসাব করিয়া আনন্দনাথের পিতার কথামত তাঁহার সরকার সমস্ত চুকাইয়া দিলেন।

রজনীর যে হিন্দুস্থানী দরোয়ান তাঁহার সঙ্গে ছিল এবং ষ্টীমার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে আসিয়া অনাথবন্ধুর সম্মুখে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছিল। অনাথবন্ধু অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল "কি মনিবকে কোথা রেখে ফিরে এলাম বড় বাবু?"

অনাথবন্ধুর কণ্ঠ যেন বদ্ধ হইয়া যাইবার মত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু দিয়া জলধারা নির্গত হওয়াতে অসহ্য যন্ত্রণা যেন কিছু কমিল।

অনেকক্ষণ নীরবে রোদনের পরে দ্বারবানকে একে একে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে কি হইল; কবে কোন সময়ে সাঁক্রাইলে গিয়াছিল, কখন ফিরিতেছিল, ধাক্কার সময়ে রজনীকে দেখিয়াছিল কি না?—

উত্তরে দরোয়ানের কথায় জানিলেন যে ষ্টীমারে উঠিয়া ঔষধের বাক্স ও পুস্তকাদি রজনীর কাছে উপর তালায় দিয়া আসিলে রজনী দরোয়ানকে বলিয়াছিল, 'পাঁড়েজি! আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে, মা কাশীতে কেমন আছেন জানি না, সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ টেলিগ্রাম পাই। আজ যদি খুব ভাল বলিয়া না লেখা থাকে, তবে আজ রাত্রের গাড়িতেই কাশী যাইব। যার মার এত অসুখ তার কি পরের বাড়ী চিকিৎসা করিয়া বেড়াইবার সময়?' দরোয়ান বলিয়াছিল, 'মা ভাল না থাকিলে যাইবার জন্য তারে খবর আসিত।

বাবু একদিন কলিকাতায় না থাকিলে ডাকিতে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক কত আফ্‌সোশ করিয়া ফিরিয়া যায়।” তার পর আর কোন কথা হয় দরোয়ান নামিয়া আসিয়া “ডেকে” বসিয়াছিল। স দিকে ছিল। অপর ষ্টীমারকে দেখেও নাই। এক প্রচণ্ড ধাক্কা—এঞ্জিনের হুস্‌ হুস্‌ শব্দ— লোহা ও কাঠ ভাঙ্গার ভীষণ মড় মড় শব্দ এবং শত লোকের যুগপৎ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে একটা বি ধ্বনি। পরক্ষণেই দরোয়ান জলে পড়িয়া গিয়াছি জলের ভিতরে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম! কিন্তু শে সাঁতার দিয়া ভাসিয়া উঠিতে পারিয়াছিল। উঠিয়া জলের উপর মাথা তুলিয়া, চক্ষু হইতে নদীর জল এক হাতে মুছিয়া সাঁতার দিতে দিতে দরোয়ান দেখিল যে প্রকা একখানা ষ্টীমার বেগে যাইতেছে। নিজেদের ষ্টীমারের মুখের দিক একটু জাগিয়া আছে তাহাও অল্পক্ষণ মধ্যে ডুবিয়া গেল। চারিদিগে জিনিসপত্র ভাসিতেছে এবং কতক লোক সাঁতরাইতেছে, এবং কতক আর্ত্তনাদ করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। দরোয়ান সাঁতার দিয়া তীরে গিয়া উঠিল। বাবুকে আর দেখিতে পায় নাই। বাবু উপর ছাদে হালের নিকটে ছিলেন। শুনিয়াছে ষ্টীমারের পিছন দিকে যাহারা ছিলেন, তাহারা প্রায় কেহই উঠিতে পারেন নাই। দরোয়ান তখনই একটা ডিঙ্গি লইয়া বাহির হয়। ডুবু ডুবু একজন বাবুকে তুলিতে পারিয়াছিল। বিশ পঁচিশ জন মাত্র সাঁতরাইয়া উঠিয়াছিল।

আর কেহই উঠিতে পারে নাই। তাহার পর নদীর তীরে তীরে অনেকক্ষণ অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিয়াছিল।

দরোয়ান এই সমস্ত সংবাদ দিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল, "আমাকে জবাব দিবেন না। আমি আপনাদের বাড়ী ভিন্ন আর কোথাও চাকুরি করিব না। এখানকার অন্য সব বাবুরা বড় ভ্রষ্ট।" পরক্ষণেই বলিল "আমি কর্ত্তা বাবুর কাছে মুখ দেখাইব কি করিয়া। যখন বলিবেন, বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছ্‌লি, কোথায় রেখে এলি! তখন কি বলিব?" দরোয়ান আবার কাঁদিতে লাগিল।

আনন্দনাথেদের সরকার বলিলেন, "দরোয়ানটি বড় ভাল লোক। এখনকার কালের অনেক চাকর বাকর এমন অবস্থা পাইলে মনিবের সব লুটে পুটেই লয়। তবে সবাই অবশ্য মন্দ নয়।"

সরকার আরও বলিলেন, "দরোয়ান কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর বামুন সকলেই কাঁদিল। সকলেই বাবুকে ভাল বাসিত। কিন্তু খানিক বাদে চাকরটা বলিল, 'বাবুর শ্বশুরবাড়ীতে ও ভগিনীপতির বাড়ীতে খবর দেওয়া চাই।' দরোয়ানও বলিল, তাহাই করা যাউক। তখন চাকরটা বলিল, 'তোমরা দুজনে যাও, আমি ঘর আগ্‌লাই।' দরোয়ান তখনই বলিল 'না', সকল ঘর দ্বার বন্ধ করে আমরা বাহিরে তালা লাগাই। তুমি বাহিরে বসিয়া থাক, আমি বাবুর ভগিনী-

পতির বাড়ীতে যাই। ব্রাহ্মণঠাকুর বাবুর শ্বশুরবাড়ীতে খবর দিতে যাউন।' চাকরটার ইচ্ছা ছিল যে সেই "হেপাজতের" সম্পূর্ণ ভার লয়। কিন্তু দরোয়ান উহার স্বভাব জানে; চরিত্র মন্দ হইলে লোকের টাকার বড়ই দরকার। সেরূপ লোক বিশ্বাস্য নয়। দরোয়ান চাবিটী আমাদের বাবুকে দিয়াছিল।"

খানিকক্ষণ পরে আনন্দনাথেদের সরকার বলিতে লাগিলেন, "কর্ত্তা গিন্নী বাড়ী সুদ্ধ সবাই খবর পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন। আমাদেরও যেন বুক ফেটে যেতে লাগিল। কি সুপুরুষ, কি স্বভাব, আর কি আশ্চর্য্য চিকিৎসার ক্ষমতা! যেন দৈবশক্তি ছিল। আমার ছোট ছেলেটীর অসুখে ডাক্তার বৈদ্য সকলে জবাব দিয়াছিল। কিন্তু শুধু অসুখের অবস্থা শুনে যে অসুধ দিলেন, মেজবাবুর সেই অসুধ দশ দিন খেতেই সেরে গেল। তখন মনে হোল, এমন ডাক্তার আপনাদের লোক থাক্তে কেনই অন্যের চিকিৎসা করাইতেছিলাম। প্রায় যাট সত্তর টাকা দেশে খরচ হইয়াছিল। মেজবাবুকে ঔষধের নাম লিখিয়া দিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ঔষধ দিতেছি। আমার ডাক্তারখানাতেও সিকি পয়সার জিনিসের জন্য চারি আনা লইবে। ডাক্তারখানার রকমই এই।' —আহা! দশ দিন চিকিৎসা করিয়া ক্রমে ক্রমে আশা ছাড়িতে হইয়া যদি কেহ যায়, তাহাতে এত যন্ত্রণা হয় না। এ যে হোল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!"

অনাথবন্ধু আনন্দনাথের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। হবিষ্যির যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু অনাথবন্ধু সে দিন আর কিছু খাইতে পারিবেন না দেখিয়া আনন্দনাথের মাতা সুধু একটু সরবত ও কিছু ফল মাত্র জেদ করিয়া খাওয়াইলেন।

অনাথবন্ধুর অনেকবারই মনে হইতেছিল 'যে যায় সেই সুখী। তাহাকে প্রিয়জনের বিয়োগযন্ত্রণা এবং আশা-ভঙ্গ জনিত দুঃখ ভুগিতে হয় না। এরূপ দারুণ শোক পাইয়া বৃদ্ধ পিতার কি যে হইবে তাহাও ভাবিতে হয় না। তাহাকে ভাই যাওয়ার পর ভাইএর আসবাবের হেপাজত করিতে হয় না। ভাইএর স্ত্রী উত্তরকালে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা ভাবিয়া সন্দেহাকুলিত হইতে হয় না। ভাইপোটীকে মানুষ করিবার ভারের গুরুত্বে তাহাকে চিন্তাকুলিত করে না!'

আনন্দনাথের পিতা অনাথবন্ধুর চিন্তাস্রোত বন্ধ করিয়া বলিলেন, "ভগবানের মার! কি করিবে। এখন বাপের ও ছেলেদের সমস্ত ভারই দ্বিগুণরূপে তোমার উপর। সুখ এ সংসারে নাই। তাহা যদি হইত, তবে তোমার বাপের চেয়ে সুখী হইবার কারণ কাহার ছিল?"

একটু পরে আবার বলিলেন "বুড়ো মানুষের মরিতে দেরী হইলেই বিপদ। এখন আমরা দুই বুড়ায় শীঘ্র শীঘ্র মরিতে পারিলেই ভাল।—তুমি আজ রাত্রেই ফিরিবে বলিতেছ, তাহাই ভাল। ঘোড়া দুইটার কথা একজন পরিচিতবন্ধুকে লিখিয়াছিলাম। তিনি বোধ হয় গরজ মনে

করে আধা দামেরও কম বলেছেন। গাড়িখানার জন্য তেমন তাড়াতাড়ি নাই। আমি সুবিধামত বিক্রয় করিয়া দিতে পারিব। ঘোড়া দুটাও আমার কাছে থাকুক। বেচিবার তত গরজ নাই দেখিলে দাম হইবে। লোকের বিপদের সময়ে চেপে ধরিবার ইচ্ছাটা আজ কাল বাঙ্গালীর মধ্যে, বিশেষতঃ কলিকাতায়,কেমনই প্রবল হইতেছে!”

অনাথবন্ধু বলিলেন, “আপনি যে রকম ভাল বুঝিবেন, সেইরূপই করিবেন। তবে আমরা এখন কাশীতেই থাকিব। নিলামঘরে বাঙ্গালীর জিনিসের দর অনেক সময়ে বড়ই কম হয়। সুতরাং গাড়ি ঘোড়া সিকি দামের কমেই বিক্রয় হইবে বলিয়া জানি। যা বেশী হয় তাহাই লাভ।”

কুটুম্বেরা জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া দিতে সহজেই একটু সঙ্কুচিত হয়েন। তাঁহাদের ভয় হয়, ‘কি জানি যদি কুটুম্ব আমার হাতে ঠিক দাম হইল না মনে করেন।’ সেই জন্যই অনাথবন্ধু এত কম পাইবার আশা দেখাইলেন যে, তদপেক্ষা অধিক করিতে পারিয়াছি বুঝিয়া যাহাতে আনন্দনাথের পিতা বিক্রয় করিতে সঙ্কোচ বোধ না করেন।

অনাথবন্ধু মনে করিতেছিলেন ‘উনি যে যথাসাধ্য সুবিধা করিবার চেষ্টা করিবেন এবং আমার নিজের বা জানা অপর সকল লোক অপেক্ষা সহজে তাহা করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক তাহা ত নিঃসন্দেহ!’

আনন্দনাথের পিতা বলিলেন, "এইসকল সামান্য সামান্য বিষয় এমন দুঃখের সময়ে দেখিতে হওয়া বড়ই ক্লেশকর, কিন্তু এগুলিও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুতরাং করিতে ত হইবে! জীবন্তদিগের প্রতি কর্ত্তব্য মনের মধ্যে জাগরূক করিয়াই মনুষ্য প্রিয়বিয়োগ যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারে। বাপের মুখে জল দিয়াই ভাইয়ের শোকজনিত অবসাদ হইতে মনকে উত্তেজিত করিতে হয়। পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখের পর যেন শরীরে জীবন-সঞ্চার জন্য কোলেরটীর মুখে মাই দিবার প্রয়োজন। তুমি শোকাভিভূত হইও না। তোমার শরীরই এখন তোমার সংসারের প্রধান অবলম্ব। তুমি যদি অসুখ করিয়া নিজে শুশ্রূষার প্রার্থী হও, তবে বড়ই অন্যায় হইবে। মনকে দৃঢ় কর, কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক, এ সকল সময়ে অধিক দমিয়া যাইতে নাই। বাপকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া কাজ কর্ম্ম করিবে। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে—তোমার স্বর্গীয়া মাতার আশীর্ব্বাদে অসুখে পড়িবে না।"

এরূপ কথা সকলেই জানেন। বাঁধাগতের ন্যায় অনেকেই এ সকল কথা এইরূপ সময়ে বলেন। কিন্তু এরূপ আন্তরিক সহানুভূতির সহিত কথিত হইল যে, অনাথবন্ধু যেন মনে অনেকটাই বল পাইলেন।

সেই দিন রাত্রেই অনাথবন্ধু কাগজপত্রের সিন্দুক লইয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন।

———***———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—•••❁•••—

স্বপ্নবিচার।

কঃ স্বপ্নঃ কিমু নিদ্রায়াং সম্ভ্রমো জাগ্রদীক্ষিতং।

সুপ্তদেহান্নু নিঃসৃত্য ভবেদ্‌বা দৃষ্টমাত্মনা॥

অনাথবন্ধু কাশী ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে পিতার প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। ডাক্তার কবিরাজেরা বলিলেন "জ্বরটা বাঁকা। অধিক বয়সে অত্যন্ত শোকে অবসাদ জনিত রোগ।"

অনাথবন্ধু আসিয়া পৌছিলে রজনীর কাগজ পত্র বই প্রভৃতি গুছাইবার কথা—রজনীর লেখা হস্তলিপি পুনঃ পুনঃ শোনা—এই সকলেই অনাথবন্ধুর পিতার একান্ত আগ্রহ হইল। সেরূপ না করিলে বিরক্ত হন। করিলে খানিকক্ষণ ভাল থাকেন—কিন্তু পরে যেন আরও ক্লান্ত হইয়া পড়েন।

অনাথবন্ধু সামান্যভাবে মাতৃকৃত্য করিলেন। শাস্ত্রীয় যেটুকু না করিলে নয় তাহাই হইল।

রজনীর স্ত্রী প্রথম দুএকদিন রোদনের সময় বলিয়াছি। "আমার কি হোল। আমি রাজরাণী ছিলাম, এখন ভিখারিণী। আমার ছেলেকে একমুঠা ভাত ভিক্ষা করে খাওয়াতে হবে। আমি ধনে প্রাণে গেলাম।"

ঝি আসিয়া অনাথের স্ত্রী ও নলিনীর কাছে এইকথা বলিয়া দেয়। মনে করে যে, শ্বশুর "যা", ভাসুর দেবর সকলে অযত্ন করিবে কিরণশশীর কথায় এইরূপ আভাষ থাকায় ঐ কথা বলিয়া দিয়া হতভাগিনীর উপর অপর সকলের ঈষৎ বিরক্তি জন্মাইয়া, পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইবে। কিন্তু অনাথের স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া ঝিকে বলেন "এরূপ কথা পুনর্ব্বার কখন যেন বলো না। ওর যা হয়েছে তাতে কোন মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, তার কথার আবার ছুত ধর্‌তে হয়? আমরা গুষ্টি শুদ্ধ সকলে যে গিয়াছি। আমাদের যা হয়েছে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অনেক সময়ে রজনীর ছেলেটিকে তার মায়ের কোলে দিয়া অনাথের স্ত্রী একত্রে রোদন দ্বারা সান্ত্বনার চেষ্টা করেন।

ক্রমে একদিন রজনীর স্ত্রী বলিল "দিদি আমার কাছে ওর থাকিয়া কাজ নাই। আমি বড় মহাপাতকী। আমার কোন জিনিস ভাল সয় না।"

প্রচণ্ড দৈবাঘাতে কিরণশশীর মনের মধ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

ত্বদিন পরে রজনীর শ্বশুরের পত্র আসিল—"এ অবস্থায় বাপের বাড়ী আসাই ভাল। মায়ের কাছে কতকটা সান্ত্বনা পাইবে। পাঠানর মত হইলে আমি নিজে কাশী গিয়া কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া আসিতে প্রস্তুত আছি।"

কিরণশশী মনে মনে ভাবিয়া দেখিল যে বাপের বাড়ীতে গিয়া কি সান্ত্বনা পাইবে। মাতা পিতা দুজনেই ভাল বাসেন সন্দেহ নাই, একবার যাইতেও খুব ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু পিতাকে প্রায় বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতা সর্ব্বদাই 'হাবা মেয়ে, স্বামীর রোজগারের সময় আলাদা টাকা সরাইতে পারিস নাই, এখন কি হবে' এই কথাই ক্রমাগত বলিতে থাকিবেন।

শিক্ষাদোষে কিরণশশীর নিজের মনেও ঐরূপ কথা একবারটী মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল— 'তিনি গেলেন, এখন আবার টাকা কড়ির কথা মনে হয়! এমন মহাপাতকী না হলে আমার এদশা ঘটিবে কেন? প্রদোষকে ওঁরা ভাল বাসেন—ওঁরা দেখ্‌বেন। আমার টাকার প্রয়োজন কি?—আমি মরিব।'

এইরূপ মনে হইলে সেই ভাবেই প্রদোষকে মহামায়ার কাছে সমর্পণের মত করিয়াছিল।

কিরণশশীর ভগিনীটি বড়ই জেঁকো। হঠাৎ মনঃপীড়া জনক কথা বলিয়া থাকে। বাপের বাড়ী গিয়া তাহার সহিত এ অবস্থায় দেখা করিতে কিরণশশীর অনিচ্ছা হইতে লাগিল।

স্বামী দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, কিরণশশীর তাহাও স্মরণ হইল। তখন ছেলেটি এক বৎসরের মাত্র। রজনী কখন কখন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিত। একদিন ছেলের বিছানার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ গালে

হাত দিয়া ছিল। কিরণশশী তথায় আসিয়া স্বামীর অতটা অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'অমন করিয়া কি ভাবিতেছিলে বলিতে হইবে।' রজনী প্রথমে বলিলেন 'কত কি মনে হয় তা আর কি বল্‌ব।' স্ত্রী জেদ করায় বলিয়াছিলেন, এই ছেলের বিছানায় আমার পায়ে হাত দিয়া একটি সত্য কর।' কিরণশশী বলিয়াছিল 'কি এমন কথা তার জন্যে এত?' রজনী বলে 'সংসার সম্বন্ধে সেইটিই আমার প্রধান কথা। সত্য না করিলে বলিব না।' কিরণশশী বলিয়াছিল 'আমি আর সব পারি—কিন্তু তোমাকে কি প্রদোষকে ছুঁয়ে কখন দিব্য করিতে পারিব না। লোকে বলে অমঙ্গল হয়। তবে তোমার কাছে সত্য করিতেছি।' তখন রজনী বলেন 'আমার বড় সাধ যে আমার এই ছেলে আমাদের বাড়ীর মতন হয়। গুরুজনে ভক্তি ও স্বভাব চরিত্র ভাল—লেখা পড়ায় মন থাকে। যদি বাঁচিয়া থাকি যথা সাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ও মানুষ হবার আগে যদি আমি যাই তাহা হইলে তুমি যদি তোমার বাপের বাড়ীর দিকে ঘেঁস! যদি তোমার বাপের বাড়ীর মত ছেলে হইয়া যায়! তুমি যদি স্বীকার কর যে আমার অবর্ত্তমানে ছেলেকে তোমার বাপের বাড়ীর সহিত অধিক মিশিতে দিবে না, আমাদের বাড়ীতেই রাখিবে—বাবা থাকুন, দাদা থাকুন, সংসার থাকুক, কেহই না থাকিলেও এই পরিবারের মধ্যেই রাখিবে তাহা হইলে আমার মনটা বেশ শান্ত হয়। তুমি যদি আগে

যাও আমি স্বীকার করিতেছি আমি তোমার ঐ ছেলের লালন পালনেই মন দিয়া দিন কাটাইব।' রজনীর স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল ; বলিয়াছিল 'তোমার এতও মনে হয় !'

কিরণশশীর মনটা সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু স্বামী ও পুত্রের প্রতি ভালবাসা অতিশয় প্রগাঢ়ই ছিল। 'কাহারও প্রতি ভালবাসা নাই—নিজের মাত্র সুখ খুঁজি' এরূপ স্ত্রীলোক সহর অঞ্চলে ইংরাজী কেতার পরিবার মধ্যে জন্মিতে সুরু হইয়াছে মাত্র—এখনও আমাদের সমাজে খুব কমই আছে।

রজনী তখন বলিয়াছিলেন "তোমার বাপের বাড়ীর দিকে এতটা বেশী টান আছে যে, ভাল মন্দ বুঝিতে পার না। আর কিছু না বুঝিতে পার এটা সর্ব্বদা মনে রেখ যে, তোমার ছেলে যদি তাহার জেঠা খুড়া বাপ প্রভৃতির ন্যায় হয় তবেই ভাল, তাহার মাতুলের মত হওয়া ভাল নয়।"

রজনী তাহার শ্বশুর বাড়ী সম্পর্কীয়দিগকে যে অ[illegible]রূপেই দেখিতে পারেন না, রজনীর স্ত্রীর এইরূপ ম[illegible]ত, কিন্তু তাহার বাপের বাড়ীতে মানুষ হইলে যে [illegible]ার ছেলে ভাল হইবে না, রজনীর এই কথায় তাহ[illegible] মনে সেইরূপ একটা ভাব ক্রমশঃ জন্মিয়া আসি[illegible]ছিল। ভাইএর বর্দ্ধমান দুশ্চরিত্রের কথা তাহার মাত্[illegible] মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন। পূর্ব্বে বাপের বাড়ীর সকল দোষ দেখিতে পায় নাই, এখন স্বামীর কথা স্মরণ

করিয়া এবং ভাসুর দেবর শ্বশুর যা প্রভৃতির যত্ন দেখিয়া সে ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

কিরণশশী শোকে একপ্রকার অভিভূতই হইয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না।

বলিলেন, "কোন্ মুখ লইয়া যাইব?—আর ঠাকুর প্রদোষকে দিনে দশবার দেখিতে চান। তাঁহার এত অসুখের সময়ে ও এখানে না থাকিলে কাতর হইবেন। এই খানেই এখন থাকিব।"—কিরণশশী অপরের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনাথবন্ধু উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—"পিতৃ ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ। আমাদের যে সর্ব্বনাশ হইবার, তাহা হইয়াছে। এখন খোকাকে সর্ব্বদা না দেখিলে তিনি অস্থির হন। বধূমাতাও তাহা বুঝিয়া এখন তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকা উচিত মনে করিতেছেন। —কিছু দিন পরে অবশ্যই লইয়া যাইবেন।"

কথায় কথায় রামজয় একদিন বলিলেন "রজনীর বয়স যখন আট নয় বৎসর মাত্র তখন সে একদিন আমার ও তাহার মাতার কাছে মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেছিল। শান্তনুর উপাখ্যান পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'বাবা! অপঘাতে মৃত্যু দোষ বলে, কিন্তু ভীষ্মের বড় সাত ভাইএর ত অপঘাত মৃত্যু হইল!' আমি বলিলাম "মা গঙ্গার হাতে আবার অপঘাত কি? সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্ত

হইয়া স্বশরীরে স্বর্গে গেলেন।' সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তির কথাটা একটু পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম—রজনী তখন ছেলে বৈত নয়, সে উহা পরিহাস বলিয়া বুঝে নাই। গম্ভীরভাবে বলিল 'তবে ত দৈবাৎ গঙ্গায় ডুবিয়া মরাই ভাল। কে কবে কোন্ গঙ্গাহীন দেশে মরিবে তাহার ঠিকানা নাই। যে ব্যারামে মৃত্যু হইবে তাহাতে ত কাহাকে কাহাকে দু একদিন আগে থেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়!' আমাদের পাড়াতেই অল্পদিন পূর্ব্বে রজনীর একটি সহপাঠীর জ্বর বিকারে মৃত্যু হইয়াছিল। ব্যারামের সময় রজনী তাহাকে এক দিন দেখিতে গিয়াছিল। তাহাকে মনে করিয়াই রজনী অজ্ঞান হওয়ার কথা বলিল। কিন্তু তোমার মাতা হঠাৎ একান্তই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন 'ও কি কথা বলচিস্ রজনী?' তার পর 'ছেলেকে কি সবই শেখাচ্ছ!' বলিয়া আমাকে অনুযোগ করিলেন। ছেলের বিচারে আমি তখন হার মানিয়াছিলাম —রজনীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমাকে প্রীত করিতেছিল। আমি অত ব্যস্ত হইবার কোন কারণ দেখিলাম না। বলিলাম 'ছেলে স্মৃতির ব্যবস্থা ঠিক করিতেছে, আর রোগের লক্ষণের দৃষ্টান্ত দিতেছে। ওকে ত অধ্যাপক করিবার ইচ্ছা নাই ডাক্তারই করিব।' তোমার গর্ভধারিণী রাগ করিয়া বলিলেন 'ছেলেকে অলুক্ষুণে কথা কহিতে দিয়া কি তামাসা ঠাট্টাই কর!' রজনী তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, ভীষ্মত অত ভাল, কিন্তু তিনি বেশী

অপরাধী বলিয়াই বেশী দিন পৃথিবীতে রহিলেন—বেশী দিন বাঁচাই কি বেশী অপরাধের লক্ষণ?' এই কথায় তোমার মা সেখান থেকে রাগ করে উঠিয়া যাইবার সময় বলিলেন 'ছেলেকে কি জ্যাঠামোই শিখাইতেছ! রজনী জ্যাঠামো হিসাবে বলে নাই। সে বেশ ব্যগ্রভাবে মহাভারতের গল্পটির উপদেশ বুঝিয়া লইতেছিল। কিন্তু তোমার মাতা সেখান হইতে উঠিয়া গেলে ও বিষয়ে আর কোন কথা হইল না—সে দিন পড়াও বন্ধ হইল।"

এ ঘটনার কথা অনাথবন্ধু পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই। রামজয় বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্নের সম্বন্ধে না বলে যে, অতীতের ঘটনা সকলের ছবি মানুষের মস্তিষ্কে থাকে। স্বপ্নে সেই সকল ছবি বিচিত্ররূপ উল্টা পাল্টা ভাবে মনের ভিতর উদয় হইতে থাকে। যাহা মনে বেশী লাগিয়াছে তাহার ছবি অধিকতর সুস্পষ্ট থাকে এবং তাহার সম্বন্ধে স্বপ্ন হওয়ারও অধিক সম্ভাবনা। রজনীর বালককালের ঐ কথা তখন তোমার মার মনে বড়ই বেশী লাগিয়াছিল। সেইজন্যই কি ঐ দিন স্বপ্নে রজনীর গঙ্গার জলে পড়ার ছবি দেখিতেছিলেন? আর ঘটনাক্রমে সেই সময়েই আমাদের কপাল পুড়িতেছিল!—কিসে কি হয় কে বলিতে পারে? তবে আমার মনে হয় স্বপ্নে জীবাত্মার ভ্রমণ বা সুদূর সন্দর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে?"

অনাথবন্ধু বলিলেন "মা তখন সবই দেখিতে পাইয়াছিলেন। ষ্টীমারের কথা ত সেই পূর্ব্বকালে হয় নাই। যদি

পূর্ব্বশ্রুত মাত্র হইতে ঐ স্বপ্ন হইবে, তবে ষ্টীমারের কথা না বলিবেন কেন?"

রামজয় বলিলেন "ষ্টীমারের কথা তখন হয় নাই, কিন্তু বছর তিন চারি হইল, একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে রজনী বলিল, 'একজন ইংরাজ নাবিক কলিকাতায় জাহাজ হইতে পড়িয়া যায়। আর উঠিতে পারে নাই।' তোমার মা সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ওরা গোরা মাঝি; বেশী কাপড় চোপড় পরা থাকে বলিয়া বুঝি সাঁতার দিতে পারে না?' রজনী বলিল 'কলিকাতায় নদীর ধারে জাহাজের পর জাহাজ বাঁধা; একবার জলে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ঝুপ করিয়া জলে পড়িলে একবার ত ডুবিয়া যাইতে হয়। তার পর লোকে সাঁতার দিয়া ভাসিয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করে। ততক্ষণে নদীর টানে হয়ত অন্য কোন জাহাজের তলায় আনিয়া ফেলিয়া দেয়। উঠিতে গিয়া জাহাজের তলাটা মাথায় ধাক্কা লাগে। সেই ঘায়েই আর ভাসিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ফুরাইয়া যায়।' তোমার মাতা একান্ত কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন 'উঃ! কি ভয়ানক অবস্থা!—আহা! কাদের বাছা আর বাড়ী ফিরিল না।' সুতরাং দেখিতেছ যে অতীতের শ্রুত বা চিন্তিত বিষয় লইয়া গঠিত ঐ স্বপ্নে 'হঠাৎ কিরূপে' সময়ের মিল হইয়া গিয়াছে, এরূপ বলিয়া তর্ক করা যে চলে না তাহা নয়। তবে তাহা আমার মনে হয় না। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অজ্ঞাত শক্তি কতই আছে! অধিকাংশ বিষয়ই ত অজ্ঞাত!"

অনাথবন্ধু এ গল্পটিও এই প্রথম শুনিলেন। বিস্মিত হইয়া অশ্রুসিক্তনয়নে পিতাকে বলিলেন "এক জন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে 'ভবিষ্যতের ঘটনাবলির ছায়া আগে আসিয়া পড়ে,' রজনীর জীবন সম্বন্ধে কি ঐ দুই সময়ে ভগবান তাহারই আভাস দিতেছিলেন, আর আমাদের মার প্রাণে তাহারই অস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছিল?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সংসার।

তত্ত্বজ্ঞানস্য লাভার্থমুন্নতৌ স্বাত্মনোঽত্র যা।
শিক্ষা সা কথ্যতে লোকে বিদ্যাশিক্ষা মহাত্মভিঃ
অর্থকরী তু যা বিদ্যা সা বিদ্যানৈব কথ্যতে॥

অন্য এক সময়ে রামজয় অনাথকে বলিলেন, "আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল যে, আমার তিন পুত্র উকীল, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হইবে। ইঞ্জিনিয়ারীর এবং অঙ্কশাস্ত্রের দিকে সংসারের আদৌ প্রবৃত্তি নাই, এবং উহার সংস্কৃত পড়িতেই বড় সাধ দেখিয়া ক্রমে উহার সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দিয়া পরে শাস্ত্রচর্চ্চাই ঘটিয়াছে।

"আমার অধিক বয়সে ক্রমেই দৃঢ় প্রতীতি হইয়া আসিতেছিল যে, যেমন ব্রাহ্মণসংখ্যা বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে, অনেক ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হওয়াতে এবং দেশের আর্থিক অবস্থা কতকটা ন্যূন হওয়াতে সকল ব্রাহ্মণ সন্তানের আর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যাজন, অধ্যাপন ও ৎ প্রতিগ্রহ মাত্রের উপর জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব, ত্যুত তাহা করিতে গেলে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভার হইবে, তদ্রূপ আবার সকল ব্রাহ্মণবংশীয় বালকই

যদি বৈদেশিক অর্থকরী বিদ্যা বা ব্রাহ্মণেতরজাতীয়দিগের ব্যবসায়েই লিপ্ত হইয়া যায়, তবে হিন্দুজাতির স্থায়িত্বের মূল যে আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল তাঁহাদের লোপ হইয়া যাইবে।

"এখন সেই বিষম সামাজিক বিপদের দিকেই যেন সমাজের গতি ফিরিয়াছে। বড় বড় অধ্যাপক বংশীয়-দিগের মধ্যে অধিকাংশস্থলেই আর কৌলিক ব্যবসায়ের প্রচলন নাই। এখনও কতক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিক্রমপুর অঞ্চলে এবং বৈদিকশ্রেণীয়দিগের মধ্যে জাতীয় শাস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই রাঢ়ীয় বড় বড় পণ্ডিত সমাজের প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগের বংশধরেরা এখন অধিকাংশই উকীল বা রাজকর্ম্মচারী। সওদাগরী আফিসাদিতেও কম নাই।

"এখন আবার বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল বংশের দু একটি করিয়া ভাল ভাল ছেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যবসায়ে—শাস্ত্রচর্চ্চায়—নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। আমি প্রথম বয়সে ইহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সংসারের শিক্ষা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে মনে হয় যেন হিন্দুসমাজ আপনার রক্ষার্থেই অচিন্তনীয় ঘটনাপরম্পরা দ্বারা আমার সংসারকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া তুলিলেন এবং এইরূপে অপরাপর অনেককে ঐরূপ করিয়া লইবেন। যখন সংসার এম এর জন্য সংস্কৃত পড়িতে গেল, তখনও মনে মনে ছিল যে বি এল দিয়া উকীল হইয়া পরে না হয় মুন্সেফ

হইবে। যখন সংস্কৃত পড়াই চলিতে লাগিল এবং শিক্ষকতায় ঢুকিল, তখন মনে হইয়াছিল যে, ক্রমে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে উচ্চ কার্য্য করিবে। যখন শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যে এবং বাঙ্গালা লেখাতেই নিযুক্ত রহিল, তখনও মনে করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াই না হয় কাটাইবে।

"কিন্তু কাশীতে আসিয়া অবধি বিশেষতঃ জর্ম্মণ সাহেবের সহিত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসার পর যেরূপ আগ্রহের সহিত উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনাদির চর্চ্চা করিতেছে, এবং দু একটি করিয়া যেরূপে উহার কাছে সংস্কৃত পড়া বলিয়া লইতে উচ্চাধিকারী ছেলেও আসিতেছে, তাহাতে সংসার এক্ষণকার কালোপযোগী যে অতি উৎকৃষ্ট অধ্যাপক হইয়া দাঁড়াইল তাহাই দেখিতেছি।

"সংসার আমাকে প্রমথ ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রথমে যে দিন বলিল, 'একটি ছেলে কাশীতে পড়িতে আসিয়াছে, থাকিবার স্থান নাই; ছেলেটি বেশ সুতীক্ষ্ণধী এবং সদ্বংশজাত, আমাদের বাসায় থাকুক না, আমি পড়া শুনার সাহায্য করিব, আর আবশ্যকমত দণ্ডীদের কাছে যাইবে।' তখন রাজি হইয়া দেখিলাম আমার সংসার প্রকৃতই অধ্যাপক হইয়াছে এবং উহার ছাত্রকে বাসা দেওয়া আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম দু এক দিন দণ্ডীদের কাছে গিয়াছিল। পরে আর বড় কোথাও যায় না দেখিতেছি। সংসারের কাছেই পড়িতেছে।

"এক দিন জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিল 'অন্যত্র এত সহজে বিদ্যা পাওয়া যায় না। অনেকেই যেন কতকটা ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান। আর সকল দিকের সংশয়চ্ছেদ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের উদাহরণ প্রভৃতি দিয়া এমন সুন্দররূপে সকল বিষয় পড়াইতে সক্ষম গুরুজীর মত আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। এখনকার কালের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা, অধিকাংশই শূন্যবাদী বা শাস্ত্রের পরিভাষা জানেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ ঐ সকল লোককে ভয় করেন, কিন্তু তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সকলেই উহাঁদের তর্ক সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলেও উহাঁদের মতটা জানা না থাকায় সেই মতবাদের উপর বিশেষরূপ আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার খণ্ডনের চেষ্টা করিতে পারেন না। গুরুজী সে সব বলিয়া দেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনগুলির এবং বিজ্ঞানের কথা বেশ বুঝাইয়া দেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুশীলনে এবং পরীক্ষাবিধানে একাগ্র যত্ন দ্বারাই যে ইয়ুরোপীয়ের সাংসারিক উন্নতি—অধ্যাত্মবিষয়ে উহারা নূতন কিছুই জানে না—তাহা সে দিন অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন।'

"ছোট বাবুর পরিবর্ত্তে 'গুরুজী' আমাকে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। বাস্তবিকই এখনকার কালের জন্য যেরূপ বহুদিক্‌দর্শী অধ্যাপকের প্রয়োজন, সংসার সেই পথেই অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। উহার আচারে নিষ্ঠা জন্মিয়াছে;

আর যত শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছে, ততই আর্য্যদিগের নিয়মা-বলীতে উহার অধিকতর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইতেছে। আমাদের বংশে দুই একটি ঐরূপ অধ্যাপক পণ্ডিত শিক্ষিত হইয়া উঠে এখন বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। যখন আপন সমাজের কিরূপ প্রয়োজন তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি তখন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কার্য্য করা আবশ্যক।”

অনাথবন্ধু বলিলেন, “মনে করা যাউক সংসারের এক ছেলে অধ্যাপক পণ্ডিত হইবে। সত্যনাথের সম্বন্ধেও চেষ্টা করিয়া দেখিব। সংসারের ছেলে ত সহজেই অধ্যাপক হইতে পারিবে। প্রদোষ যাহাতে ডাক্তারীর দিকেই যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে ইচ্ছা হয়। তবে যদি ছেলেদের একান্তই তাহা না হইয়া উঠে—যদি খনির কার্য্য—কারখানার কার্য্য—যৌথ ব্যবসায়ের ম্যানেজারের বা সহকারীর কার্য্য, এইরূপ সমাজের বিশেষ আবশ্যকীয় অন্য কোন পথেই যায় তাহাও ভাল।”

রামজয় বলিলেন, “আমি তাহাই বলিতেছিলাম। হয়ত সকলেই কেরাণী মাত্র হইবে। হয়ত তাহাও জুটিবে না। কিন্তু ‘সমাজ-হিতকর কার্য্যেই ছেলেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিব’ সকল পরিবারেই এইরূপ দৃষ্টি থাকা চাই।” কথার শেষাশেষি সংসার আসিয়া নিকটে বসিয়াছিল।

রামজয় বলিলেন, “কি বল সংসার! এইরূপ চেষ্টা করা উচিত কি না? চেষ্টায় কিছু হয় কি? বংশের সম্বন্ধে পুরুষকারের প্রভাব কত দূর?”

সংসার বলিল, "বংশে ব্রাহ্মণ্য ও কৌলিক ব্যবসায় রক্ষার জন্য যত্ন করা অতীব আবশ্যক। আর শাস্ত্রে চেষ্টারই বিশেষ প্রশংসা। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকলের বা প্রাক্তনের বলই অধিক, কিন্তু পুরুষকারের বা বর্ত্তমান জন্মের কৃত কার্য্যেরও ফল আছে। সেই পুরুষকার এ জন্মেই অতি অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্ত সাধন করে এবং পর পর জন্মে প্রাক্তনের সহিত মিশিয়া প্রবল হইতে থাকে। যেমন শত শত জন্মের সংযমের ফলে মনুষ্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সক্ষম হয়, এবং অসংযমের ফলে সেই উন্নতির পথে কত শত বার স্খলিতপদ হইয়া নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ পুরুষানুক্রমিক সংযমের ফলে শরীরও দৃঢ়, পটু ও রোগ-শূন্য এবং ঐরূপ অসংযমের ফলে অপটু ও রোগপূর্ণ হইয়া জন্মায়। মনকেও শরীরের অংশ বলিয়া ধরা যায়। ফলতঃ শরীরের পক্ষেও প্রাক্তন বা উত্তরাধিকার এবং পুরুষকার বা "আচার" সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী। সুতরাং বংশপরম্পরায় শারীর ও মানসিক গুণের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় ইংরাজী মতের সহিত আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রের মত অভিন্ন। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। উহার সহিত আমাদের জন্মান্তরের মত কেহ কেহ বিরোধী বলেন, কিন্তু আমারত অবিরোধী বলিয়াই মনে হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে জীবাদির সংখ্যা কি অপরিমিত! জন্ম মৃত্যু যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুক্ষণ কি পরিমাণে হইতেছে, তাহা মনে ধারণা করাই

যায় না। সুতরাং যে কোন সময়েই যেরূপ প্রাক্তনবিশিষ্ট জীবাত্মাকে কর্ম্মফল ভোগ জন্য নূতন শরীরে যোজনের আবশ্যক হইতেছে, সেই সময়েই আবার সেইরূপ জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযোগী 'শারীরিক প্রাক্তন' বিশিষ্ট দেহও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অনুসারেই এই বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও সৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ জীবাত্মা আপন প্রাক্তন অনুযায়ী দেহেই সংযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বংশে সদাচার থাকিলে সেই বংশে শরীরও ভাল থাকে, এবং পবিত্র প্রাক্তনবিশিষ্ট জীবাত্মারও সমাগম হয়!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক চিকিৎসা।

রোগীণাং সাধু শুশ্রূষা মনুষ্যত্বস্য লক্ষণং।
পশবঃ পশুধর্ম্মাশ্চ রুজায়াঃ খলু বিভ্যতি॥

ইহার দু একদিন পরেই হঠাৎ রজনীর ছেলের ভেদ বমি হইতে লাগিল। রাত্রি আড়াইটা কি তিনটার সময় উঠিয়া একবার বমি করিয়া যখন ছেলে বলিল 'বাহ্যে পাইয়াছে' তখনই রজনীর স্ত্রী "দিদি আমার কি হবে!" বলিয়া উঠিল।

অনাথবন্ধুর স্ত্রী ছেলেকে বাহিরে লইয়া গেলেন। খুব পাতলা অনেকটা ভেদ হইল। রজনীর স্ত্রী মাটিতে বসিয়া

অনাথবন্ধুও উঠিয়া আসিয়াছিলেন। মল দেখিয়া তিনিও সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু বলিলেন, "অপচার হইয়াছে। সংসারকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই। এখানে ভাল ডাক্তার আছেন।"

স্ত্রীকে বলিলেন, "মেজ বৌমাকে চুপি চুপি বুঝাও যে এখন যেন ছেলেকেই মনে রাখিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করেন। অভিভূত হইবার সময় নয়। সেরে যাবে—কিন্তু আজকাল সময় ভাল নয়, ঘুম পাড়ান বড়ই দরকার।"

এই বলিয়া, স্ত্রী জলশৌচ করাইয়া দিলে, ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরে আনিলেন।

বাড়ীতে 'রুবিনির ক্যাম্ফরের' সিসি ছিল তাহা হইতে দু তিন ফোঁটা ঔষধ বাতাসা করিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া দিলেন। ছেলে খাইয়া বলিল "বড় ঝাল।"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "মেজ বৌমা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়ান—তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে।"

শোকাভিভূতা রজনীর স্ত্রী পুত্রের বিপদ আশঙ্কা করিয়া প্রথমে যেন আরও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীতে এখনও তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন না করিলে বড়ই বিপদ, ভাসুরের কথায় এই ভাব তাঁহার মনে উঠিয়া তাঁহার বৈধব্য শোকের অভিভব একটু কাটিয়া গেল। তাঁহার শোকে নিস্পন্দীভূত মনে মাতৃস্নেহ জাগরিত হইয়া আবার তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত এবং সংসারী করিতে চলিল।

কিন্তু ছেলের ঘুম হইল না। অসুখ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঘণ্টায় দুই বার করিয়া ভেদ বমি হইতে লাগিল। ঘন ঘন ঔষধ দেওয়াও চলিতে লাগিল।

বেলা ১০টার সময় হইতে রোগের বৃদ্ধি যেন একটু কমিয়া আসিল। কিন্তু আবার রাত্রে খুব বাড়িয়া উঠিল। সে রাত্রি আর যেন ফুরায় না! শেষ রাত্রি হইতে একটু কম বোধ হইল, কিন্তু রোগের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল

না। অনেকটা কমিয়া জল বমি বরাবরই রহিয়া গেল। রোগী এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বমিটা এমন স্থায়ী ভাবে রহিল, যে ডাক্তারও ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

যে কবিরাজ রামজয়ের পত্নীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, অনাথবন্ধু তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। কবিরাজ খুব ভাল নাড়ী বুঝেন।

তিনি নাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা মতে অনাথবন্ধুকে আলাদা বলিলেন, "এখন রোগের একটু প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইতেছে—নাড়ী গরম হইয়াছে। এ রোগের পক্ষে একটু পুরাতনও হইয়াছে। এখন এক পান মকরধ্বজ দিলে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। বমিটাই এখনও বেশী আছে, এবং পেটের বেদনার জন্য বড় কাতরাইতেছে— দুইয়েরই সত্বর দমন হইবে।"

রজনীর মকরধ্বজের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। অনেক সময়েই উহা তাঁহার চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতেন। রজনীই যেন কবিরাজের মুখ দিয়া তাহার ছেলের চিকিৎসার উপায় বলিয়া দিতেছে, অনাথবন্ধুর হঠাৎ এইরূপ মনে হইল। তিনি পিতাকে ও সংসারকে ঐ কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উহাঁদেরও মকরধ্বজ দেওয়া মত হইল।

ডাক্তারকে বলিলে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন "সে সব করা আপনাদের হাত; তবে এতক্ষণত

টিঁকিয়াছে এবং রোগ অনেকটা কম পড়িয়াছে। কিন্তু পাজি রোগ—বিশ্বাস নাই। 'ওটা করিও না, এইতেই ভাল হইবে' এমন কথা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু 'নিয়ম মত এক রকম চিকিৎসা করাই উচিত—এটা ওটা করায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী' একথা স্পষ্টই বলা যায়। আর এ রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহার ত সন্দেহ নাই!"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "আপনি যেরূপ যত্ন করিয়াছেন—রাত্রি জাগিয়াছেন—যতটা রোগ উপশান্ত রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনার অনভিমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে কেমন মনে হইতেছে যেন রজনীই বলিতেছে যে এখন মকরধ্বজেই ভাল হইবে। রোগ একটু প্রাচীন হইলেই কবিরাজীর ভাল অধিকার আইসে একথা প্রসিদ্ধ। এরোগের পক্ষে এই কি পুরাণ বলা যায় না? আপনি বলিলেই এক পান মকরধ্বজ দিই।"

ডাক্তারটি সাধারণ ডাক্তারজাতীয়দিগের হইতে অনেকটা ভাল। 'গোঁ'ধরার অভ্যাসটা স্বভাবতঃই একটু কম। কবিরাজ যে নাড়ী গরম বুঝিয়াছিলেন তিনি তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। দু তিন রকম ঔষধ দিয়াও পেটের বেদনা এবং বমনোদ্রেক নিবারণে কৃতকার্য্য হন নাই। ভাবিলেন, 'যদি শেষে খারাপ হয় তবে এই সুভদ্র ও শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে বড়ই আপশোষ থাকিবে যে কেন মকরধ্বজ দেওয়া হয় নাই।'

প্রকাশ্যে বলিলেন "আমি মনে করিতেছিলাম খানিকক্ষণ কোন ঔষধই দিব না।—তা না হয় মকরধ্বজই দিন। কিন্তু অন্য পাচন প্রভৃতি যেন কিছু না দেন। এটা আমি আপনাদের আগ্রহ এবং আমার বন্ধুত্বের জন্যই বলিলাম। নচেৎ আমি যখন মকরধ্বজের গুণ নিজে বেশ জানিনা এবং উহা হোমিওপ্যাথির নয় তখন ডাক্তার হিসাবে উহার ব্যবস্থা কিরূপে দিব? শুনিয়াছি রজনী বাবু উহার ট্রিটুরেসন ব্যবহার করিয়া উপকার পাইতেন।"

অনাথবন্ধু বলিলেন "হাঁ রজনী ট্রিটুরেসনই অধিক ব্যবহার করিত, কিন্তু বলিত যে অনুপান ভেদে মকরধ্বজের যেরূপ আশ্চর্য্য উপকার কবিরাজেরা পায়েন, সুধু ট্রিটুরেসনে তাহা হইবার যো নাই।"

পাথরকুচির পাতার রসের সহিত মকরধ্বজই দেওয়া হইল। অল্পক্ষণের পরেই বালক বলিল পেটের বেদনা কমিয়াছেএবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে সে যখন ঘুমাইয়া উঠিল, তখন আর কোন উপদ্রবই নাই। একবার সেবিত একটুকু কবিরাজী ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

বালক ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল। অনাথবন্ধু এবং মহামায়া—ফলতঃ বাড়ীশুদ্ধ সকলেই—যেরূপে পুত্রের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহাতে রজনীর স্ত্রীর অনেকটা ভ্রম কাটিয়া গেল। তিনি মনে করিতে শিখিয়াছিলেন যে তাঁহার ছেলেকে কেহ ভাল বাসে না। কিন্তু দেখিলেন মাতৃস্নেহ খুব

প্রগাঢ় জিনিস বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে স্বসম্পর্কীয় অপরাপরের স্নেহও বেশ প্রগাঢ়।

সত্যনাথের অসুখ হইলে মহামায়া ইহার অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতেন না। অবিকৃত মুখে রোগীর মল পরিষ্কার মহামায়াই কিরণশশীর অপেক্ষায় অধিকবার করিতেছিলেন। 'তুমি ছেলের কাছে থাক, তুমি বাহিরে গেলে ছেলের চোক সঙ্গে সঙ্গে দোয়ারের দিকে যায়'—এই বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই ছেলের কাছে রাখিতে-ছিলেন।

অনাথবন্ধুর স্নেহ প্রদোষের উপর যে কত গভীর, কিরণশশী তাহা সেই ধীর প্রশান্ত কিন্তু বিশুষ্ক মুখে দিবারাত্রির একাগ্র সুশ্রূষাতে যেরূপ সুস্পষ্ট বুঝিলেন, তেমন আর কিছুতেই বুঝা যায় না।

কিরণশশীর ভাসুর, যা, দেবর প্রভৃতির উপর মন বড়ই স্নেহ সম্পন্ন হইল। পুত্রের রোগের উপলক্ষে কতক কার্য্য স্বহস্তে করিতে হওয়াতেও শোকের জড়তা কতকটা কমিয়া গেল।

অনথবন্ধুর একান্ত জিদেই মকরধ্বজ দেওয়া হইল—তাহাতেই ছেলে বাঁচিল—রজনীর স্ত্রী এবং বাড়ীর সকলে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দোষ কার ?

দোষ কার নয়গো মা !
মোরা স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ॥

রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্ন শরীর পত্নী বিয়োগ দুঃখে এবং পুত্রশোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

রজনীর পুত্রের কঠিন রোগের সময় তিনি উহার অত্যাহিত শঙ্কায় একান্তই বিকল হইয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি দৈবাঘাতে তাঁহার মনে হইতেছিল যে তাঁহার বংশের উপর বিধাতা বিশেষ বিরূপ হইয়াছেন। সে জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই রামজয়ের রোগগুলি অতি প্রবল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের যে একটু বিশেষ নৈসর্গিক ক্ষমতা আজও আছে,তাহার বলে এত আঘাতের পরও ক্রমশঃ মানসিক শান্তি কিয়ৎপরিমাণে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এবং এ জীবনের নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া, সকল আর্য্য সন্তানই চিরকাল অপর সকল জাতীয়ের অপেক্ষা সাংসারিক দুঃখের মধ্যে অধিক পরিমাণে শান্তি পাইয়া আসিতেছেন।

খবরের কাগজে অনাথবন্ধু জানিলেন যে ষ্টীমার ডুবি

সম্বন্ধে তদারক ও বিচার হইয়াগিয়াছে। কিন্তু পিতাকে সে কথা অনর্থক জানাইলেন না। রামজয়ও সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ডুবি জাহাজের সারেং জাতিতে মুসলমান। সাঁতার দিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

সে নিয়ম মত জাহাজ চালায় নাই বলিয়া তাহারই বিচার হইল। যে "টগ" ষ্টীমারের ধাক্কায় জাহাজ ডুবি হইল, তাহার কাপ্তেনের বিচার পর্য্যন্ত আবশ্যক হইল না। 'তিনি নিয়ম মত চালাইয়াছেন তাঁহার আবার দোষ কি?'

সাধারণ বাঙ্গালীতে বলিতে লাগিল যে একটু হাল ফিরাইয়া দিলে ধাক্কা লাগিত না। কিন্তু কাপ্তেন নাকি একচুলও হাল ফিরাইতে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কালা বাঙ্গালী সারেংদের আস্পর্দ্ধা দেখ! আমার সাম্‌নে দিয়া নদী পার হয়! উহাদের জাহাজটা একটু শীঘ্র শীঘ্র চলে বলিয়া বড়ই অভিমান। আমার জাহাজের ক্ষমতা ত জানে না। কুকুরদের জন্য একচুল হাল ফিরান হইবে না। পুরা তেজে চালাও'—এই বলিয়া না কি স্বহস্তে হালের চাকাটা একটু ঘুরাইয়া যাহাতে ধাক্কা লাগে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কেই বা একথা শুনিতে গিয়াছিল! অবশ্যই অশ্রবণীয় উড়ো খবর। কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণের তাহাতেই ধ্রুব বিশ্বাস!

সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—"এত বড় গঙ্গায়

একটু হাল ফিরাইয়া লইলে দিনের বেলা অবশ্যই ধাক্কা বাঁচান যাইতে পারিত। ইচ্ছা পূর্ব্বকই এই দুর্ঘটনা করিয়াছে। ওই কাপ্তেনই ত পূর্ব্বে কতবার তামাসা দেখিবার জন্য ডিঙ্গি এবং মহাজনী নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে। তাহাতে কিছু খোঁজ খবর পর্য্যন্ত না হওয়ায় ক্রমে সাহস বেড়ে গিয়ে এবারে জাহাজ ডুবাইয়াছে !”

এ সকল এ দেশীয় লঘু প্রকৃতিক লোকের স্বভাবসিদ্ধ জল্পনা মাত্র সন্দেহ নাই। একটা খুনের কথা উঠিলেই ঐ ধরণের সকল লোকে প্রচার করে—“ও আগে আরো দু একটা খুন করিয়াছে !”

মুসলমান সারেংটীকে কিছুদিন টান পাড়াপাড়ি করা হইলে, ইংরাজী আইনের কূটতর্কে সেও কোনরূপে ছাড়ান পাইল। কেবল কথা উঠিল—‘দেশীয়দিগকে সারেং এবং রেলওয়ে ড্রাইভারের কার্য্য করিতে দিলে এরূপ দুর্ঘটনা হইবে না ত কি হইবে ?’

ইংরাজী শিক্ষিত, সাম্যবাদী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় এদেশীয় অনেকের প্রতিজ্ঞা হইল যে দেশীয় ড্রাইভারের দ্বারা চালিত ট্রেনে এবং দেশীয় সারেং দ্বারা চালিত ষ্টীমারে কখন উঠিবেন না। তাহা হইলে ত আর মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না !

এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দু এক জন মনে মনে বলিলেন ‘টগষ্টীমারের কাপ্তেন এ দেশীয় হইলে পার-লৌকিক এবং ইহলৌকিক উভয় প্রকার ভয়ে হাল

ফিরাইয়া লইয়া ধাক্কা হইতে বাঁচাইত'। একজন প্রকাশ্যেও বলিলেন "শ্যামনগর, দিল্লী, প্রভৃতি স্থানের রেলওয়ে হাঙ্গামায় বুঝি দেশীয় শকটচালক ছিল? ইংলণ্ডের অত্যুৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজ 'ভিক্টোরিয়া' যখন সুধু ঘোরফের করিবার উপলক্ষে তাঁহাদের নিজেদের জাহাজ 'কাম্পরডাউনের' আঘাতে ডুবিয়াছিল তখন বুঝি উভয়ের উপরেই 'বাঙ্গালী' কাপ্তেন ছিল!"

অপর একজন বলিলেন "সেদিনকার ঘটনার জন্য কাহার না কাহার সাজা হওয়া চাই, এরূপ কোন হুকুম জারি হওয়ার কথা ত এ ক্ষেত্রে শুনা গেল না! এ ত আর ঢিল ছোঁড়া বা ধূলা উড়ান কি ছেলেদের হুটোপাটিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার নয়!—ফলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এতগুলি বাঙ্গালী যে ডুবিয়া মরিল তাহাতে দোষ কাহারও নাই। বাঙ্গালীদের মরাই 'অভ্যাস'—তাহাতে অপরে কে কি করিতে পারে?"

ইয়ুরোপীয় কেহ ঐরূপে ডুবিয়া মরিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী ষ্টীমার কোম্পানির উপর যে বহু সহস্র টাকার দাবীতে ক্ষতিপূরণের নালিশ দায়ের করিতেন, প্রিয়-জনের প্রাণের পরিবর্ত্তে অর্থের দাওয়া করিতে অনভ্যস্ত বলিয়া শতাধিক বাঙ্গালী পরিবারের মধ্য হইতে সেরূপ একটীও নালিশ হইল না। সুতরাং সেরূপে যে একটা হঠকারিতার প্রতিকার থাকে, তাহাও এ দেশীয়দিগের নিজের দোষে (বা গুণে?) প্রযুক্ত হইতে পারিল না।

কিন্তু ইয়ুরোপীয় কেহ হঠাৎ মারা গেলে তাঁহাদের সভা সমিতি হইতে যেরূপ যত্নের সহিত মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের জন্য চাঁদা তোলা হয়, বা আপোষে ক্ষতি-পূরণ আদায় করিয়া দেওয়া হয়, এ দেশীয় সভাগুলি প্রায়ই বাজে কথায় বাক্‌সর্ব্বস্ব—স্বজাতীয়দিগের প্রকৃত অভাবের ও কষ্টের সম্বন্ধে উদাসীন—বলিয়া সেরূপ কিছুই হইল না।

তবে একজন বাঙ্গালী সমাজ সংস্কারক এক খানি উপন্যাসে এ দেশের সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতদিগের ভক্তি বৈজ্ঞানিক কথার যথাজ্ঞান পুনঃপ্রসব দ্বারা নিজের মনঃপূতরূপ প্রমাণ করিলেন, যে যদি হিন্দু সমাজে ভোজ্য দ্রব্যের শুচিতা সম্বন্ধে যত্ন, মুষ্টিভিক্ষা দান, বিবাহে জাতি কুল বিচার, জীবনবীমার স্ফূর্ত্তিতে অশ্রদ্ধা করিয়া মিতব্যয়িতা দ্বারা সঞ্চয়, মদ্যপানে ঘৃণা, কলার কফ ও চেয়ার টেবিলকে সারাৎসার জ্ঞান না করিয়া মোটা চালচলন, বাল্য বিবাহ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, একান্নবর্ত্তী পরিবারে স্বজন প্রতিপালন, এবং স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা, বশ্যতা এবং স্বামীভক্তি প্রভৃতি 'মারাত্মক' দোষ না থাকিত, তাহা হইলে এ সকল দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না। উন্নতিশীল পার্শি বা অসবর্ণ বিবাহকারী 'বিলাত ফেরত' কেহ ত তথায় মরে নাই !

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুপুত্র।

বুদ্ধিমান্ জ্ঞান সম্পন্নঃ দাতা ত্যাগী প্রিয়ম্বদঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মসু সন্ধীরো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ॥
পিতৃ মাতৃ পরোনিত্যং সর্ব্বস্বজন বৎসলঃ।
এবং গুণৈঃ সুসংযুক্তঃ সুপুত্রঃ সুখদায়কঃ॥

রামজয়ের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে শরীর আর অধিক দিন টিকিবে না। তিনিও বুঝিতে পারিলেন। একদিন বিষয় আশয় সম্বন্ধে পুত্রদের সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিলেন "আমাদের সর্ব্বশুদ্ধ তের হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। তাহার মধ্যে হাজার টাকা আমার শ্রাদ্ধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট আমি তোমাদের দুই ভাই ও প্রদোষের নামে সমান সমান অংশে লিখিয়া রাখিয়াছি। কলিকাতার বাসার গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয়ে ও ডিস্পেনসারির দরুণ যাহা পাওয়া যাইবে, আর বিনোদ বাবুকে আমি যে দুই শত টাকা ধার দিয়াছিলাম"—

বৃদ্ধ একেবারে অনেক কথা কহিতে না পারিয়া একটু দম লইতেথামিলে, অনাথবন্ধু নিজের মনেই পিতার মন বুঝিয়া বলিলেন "ঐ টাকাগুলিতে মেজ বৌমার নামে কাগজ করিয়া দিলে ভাল হয় না?"

রামজয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনাথবন্ধুর হাতটি টানিয়া লইয়া নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন।

একটু পরে বলিলেন "আমি তাহার অর্দ্ধেক দিবার কথা তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু তোমার মত ছেলেকে কিছুই বলিবার অপেক্ষা করে না—তোমার মনে যাহা হইয়াছে তাহাই করিও।"

বৌয়েরা ছেলেরা সকলেই সেখানে ছিল। কিরণশশীও ভাশুরের কথা শুনিতে পাইলেন। অনাথবন্ধু কখন কোন কথা মিথ্যা বলেন না, বাড়ী সুদ্ধ অপর সকলের ন্যায় তাঁহারও দেখিয়া দেখিয়া এই স্থির বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল।

ভাশুরের এই কার্য্যের এবং প্রদোষের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের উল্লেখ করিয়া কিছুকাল পরে কিরণশশী তাঁহার মাতার নিকট ভাশুরের প্রশংসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"খুব চাপা লোক।"

কিন্তু অনাথবন্ধুর প্রতি রজনীর যে প্রগাঢ় ভক্তি ও অসাধারণ ভালবাসা ছিল—সকল সময়েই তাহার স্মৃতি এবং অনাথবন্ধুর সরল স্নেহপূর্ণ উদার ব্যবহার ক্রমশঃ কিরণশশীর মনে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক করিতেছিল।

রজনীর পুত্র প্রদোষ অনাথবন্ধুর একান্ত 'নেওট' ছিল। জেঠামহাশয়ের জুতা কাপড় নিকটে আনিয়া দিতে—তাঁহার সকল কার্য্য করিতে ভাল বাসিত। শেষাশেষি রজনী কলিকাতায় অধিক থাকায় এবং উহারা কাশীতে

অধিক সময় থাকায় অনাথের সহিত প্রদোষের ঘনিষ্ঠতা খুবই বাড়িয়াছিল। জেঠাইমাকেও প্রদোষ খুব ভাল বাসিত।

জেঠা এবং জেঠাইয়ের প্রতি পুত্রের এইরূপ ভালবাসা পূর্ব্বে পূর্ব্বে রজনীর স্ত্রীর ভাল লাগিত না। মাতার উচ্চারিত কথার মনে মনে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া কখন কখন কিরণশশীর মনে হইত, 'হাবা মানুষের হাবা ছেলে আত্মপর চেনে না।'

কিন্তু এই ভয়ানক দৈবাঘাতের পর রজনীর স্ত্রী তাহার ছেলের উপর তাহার শ্বশুর বাড়ীর সকলেরই যে কতটা প্রকৃত ভালবাসা আছে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল। বাল্য শিক্ষার এবং কতকটা সহজাত দোষে কিরণশশীর সংকীর্ণ বুদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু আসলে উহার মনটা কঠিন ছিল না। স্বামীর প্রতি ও ছেলের প্রতি ভালবাসা অতিশয় প্রগাঢ়ই ছিল। বাহিরের কাহার উপর বড় ছিল না।

রজনীর প্রতি উহার ভালবাসা যে কত প্রগাঢ় ছিল তাহা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিরণশশী এখন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। সর্ব্বদা শূন্যদৃষ্টি; ছেলের উপরও অনেকটা আস্থা বিহীন!

মহামায়া একদিন স্বামীকে বলিলেন "মেজ বৌএর জন্য আমার ভয় হইতেছে। পাগল হইয়া যাইবে না কি হইবে? কিছুই মনে থাকে না এক কথা বল্‌তে বল্‌তে অন্য কি কথা বলে তাহার ঠিক থাকে না!"

ঐ দিকে

লাগিলেন।

তিনি অনাথবন্ধু

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃ নিজের সকল

বলিলেন, "অনাথবন্ধুর

করিয়া—চলিলেই তোমাদের সর্ব্ব।

সংসারের নিকট প্রত্যহই অনেকক্ষণ শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিতেন।

বৃদ্ধ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া শয্যাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, আহারে একেবারেই অরুচি হইল। সুধু একটু দুধ মাত্র খাইতে পারেন—ক্রমে তাহারও পরিমাণ একান্তই কমিয়া গেল।

তিন বৌ এবং দুই ছেলে তাঁহার সেবাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। অনাথবন্ধু পিতার যন্ত্রণার লাঘব জন্য যেরূপে এক মনে সর্ব্ব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিলেন, তাহাতে পরিবারের সকলেই অবহিত ও সূক্ষ্মদর্শী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলেন। একজন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পথ না দেখাইলে কোন প্রকার কাজই ভাল হয় না।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইতেছিল। কিন্তু মাসেক কাল মধ্যেই রামজয় সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে পুত্র পৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

উপরি উপরি এইরূপ দারুণ বিপদ পরম্পরায় পরিবার বর্গের যে কিরূপ মানসিকক্লেশ হইতে লাগিল তাহার

অধিক সময় থাকায় অনাথের সহিত প্রণা। তাঁহারা খুবই বাড়িয়াছিল। জেঠাইমাকেও প্র বাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

জেঠা এবং জেঠাইয়ের প্রতি থাই পিতার সহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বে রজনীর স্ত্রীর ভাল না বলা হইলে যেন ষ্মাবিত কথার মনে মনে ধীর ও গম্ভীর স্বভাব পিতার প্রগাঢ় ভালবাসা মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া তিনি সকল সময়েই দেখিতে পাইতেন।—তাঁহার বুকের আধখানা যেন ফাঁক হইয়া গেল।

****

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃগৃহে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যথা ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেবচ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্ম ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥—

শ্রাদ্ধকৃত্যাদি হইয়া গেলে অনাথবন্ধু কলিকাতায় সপরিবারে ফিরিবার কল্পনা করিলেন। প্রথমে বাসা প্রভৃতি ঠিক করিবার জন্য ও শিয়ালদহে পুনর্ব্বার পসার কেমন হয় দেখিবার জন্য একেলা কলিকাতায় আসিলেন। নলিনী এতদিন কাশীতেই ছিলেন। তিনি এবং রজনীর স্ত্রী সেই সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন।

সংসারের ইচ্ছা কাশীতে থাকিয়াই অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে। সেইরূপই হইবে এই ব্যবস্থা স্থির হইল। রজনীর স্ত্রী বাপের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। নলিনী শ্বশুর বাড়ী গেলেন।

অনাথবন্ধু দু একদিন ভগিনীপতির বাড়ী থাকিয়া শিয়ালদহের নিকটেই বাসা স্থির করিলেন।

কলিকাতার গাড়ি ঘোড়া এবং ডিস্পেন্সারিটি বিক্রয়াদির দ্বারা আড়াই হাজার টাকা হইয়াছিল। সেই টাকার কোম্পানির কাগজ কিরণশশীর নামে লিখিয়া দেওয়া হইল। কিরণশশীর নিজের প্রায় দুই হাজার টাকার গহনা ছিল। প্রদোষের নামে চারি হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ যাহা রামজয় লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও কিরণশশীর নিকট রহিল।

তিনি বাপের বাড়ী গেলে সেখানে কান্নাকাটির পর তাঁহার মাতা দু একদিন পরে বুঝাইতে লাগিলেন "জ্ঞাতিরা কখন ভাল হয় না। এখন আর রজনীর ছেলেকে তাহার জেঠা খুড়াদের কাছে রাখা উচিত নয়। 'টাকার লোভে মানুষ সব করিতে পারে।'—তোর গহনা পত্র চুরি হয়েও যেতে পারে।"

রজনীর স্ত্রী একান্ত বিরক্ত হইয়াই বলিল,"এই সে দিন বাছার যে ব্যারামে যে ক'রে বাঁচিয়েছেন—! এমন কথা মুখে আনিতে নাই। ওঁরা সে রকমের নহেন। টাকার জন্য কোন উপদ্রবই ওখানে দেখি না।"

তার পর মনে হইল 'টাকার জন্য মানুষ সব পারে, এমন মতবাদ শ্বশুরবাড়ীতে ত কখন শুনি নাই। মা অনায়াসে বল্‌লেন।' কিরণশশীর ভাইয়ের স্বভাব জানা ছিল। গহনা চুরির উল্লেখে তাহার কথাই মনে হইলে প্রকাশ্যে বলিয়া ফেলিল "তুমি বরং কত দিন বলেছ যে এখানে বাক্‌স বন্ধ থাকে,টাকা কোথায় যায়। একখানা

গহনা বালিসের নীচে রাখিলাম, একটু পরেই দেখি আর নাই। কত দিন কত লোককে সন্দেহ করিয়াছি।”

কিরণশশীর মাতা কুপিতা হইয়া বলিলেন, “চাকর চাকরাণীতে কখন কখন চুরি করে। সে কোথায় না করে? আর বাক্স খুলে টাকা লওয়া এমন কথা আমি কখন বলি নাই। এবারে তোর সবই কেমন কেমন দেখিতেছি!”

কিরণশশীরও এবারে বাপের বাড়ীর ধরণ কেমন কেমন বোধ হইতেছিল। সে এরূপ প্রকৃত অবস্থা দেখিবার উপযুক্ত চক্ষু লইয়া কখন আসে নাই।

তাহার মধ্যম ভগিনীপতি তাহার বয়স্থা ছোট ভগিনীর সহিত যতটা হাস্য পরিহাস করেন—তাহার নিজের দিকেও যেরূপে চাহিয়া থাকেন—তাহা বিরক্তিকর বোধ হইল।

এখন সেই ভগিনীপতি ঐ বাড়ীতেই থাকেন। দালালীর কার্য্য করেন। অনেক টাকা রোজগার হয়। শ্বশুরকেও কিছু টাকা ধার দিয়েছেন। নাম রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যম ভগিনীপতি যেরূপে ছোট ভগিনীর সহিত অতিরিক্ত সময় বাক্যালাপ করেন, তাহা মধ্যম ভগিনীরও ভাল লাগে না বলিয়া কিরণশশীর বোধ হইল। কিন্তু দেখিলেন যে, মাতার নজরে তাহা ঠেকে না।

এক দিন ঐ কথা তোলায় মাতা বলিলেন, “সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে শ্বশুরবাড়ীতে যদি একটু হাসি

তামাসাও করিবে না, তবে পুরুষ মানুষ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? তোমার এবারে যেন কি হইয়াছে!"

রজনীর স্ত্রী মনে মনে ভাবিল, 'সে কথা সত্য। এবারে আমার সর্ব্বনাশ হওয়ায় আমি আসিয়াছি।'

কিরণশশী ভগিনীপতির সম্মুখে দু একদিন মাত্র পড়িয়াছিলেন। এখন সেরূপ অবস্থায় সরিয়া যাওয়া আরম্ভ করিলেন।

তিনি অনেক সময়েই আলাদা বসিয়া চক্ষের জল ফেলেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে যখন আসিলেন, তখন অলঙ্কারবিহীন সাদা কাপড় পরা। পেড়ে কাপড় পরা বা হাতে অল্প কিছু রাখা সম্বন্ধে মহামায়ার উপরোধ শুনেন নাই।

রামজয় সে সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা, তোমার ও সব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ও বেশ আমাকে বড়ই লাগে।" উত্তরে কিরণশশী মহামায়াকে বলিয়াছিলেন, "তিনি এক দিন বলেছিলেন, এখনকার কালে আর বিধবারা পেড়ে কাপড় বা গহনা ছাড়ে না। স্বামীর চেয়েও বাহারে ভালবাসা। তিনি স্বর্গ থেকে আমার অন্যরূপ কাপড় পরা দেখিয়া কি মনে করিবেন?" এ কথার পর শ্বশুরবাড়ীতে আর কেহ আপত্তি করে নাই।

এখন সব কাজেই রজনীর স্ত্রী মৃত স্বামীর কিরূপ মত বা ইচ্ছা ছিল, তাহা ভাবিয়াই কার্য্য করে।

তাঁহার মাতা কন্যার বেশ দেখিয়া উপযুক্তরূপ রোদন

করিলেন। কিন্তু যখন কন্তার ডাক্তারের ও মায়ের উপর দোষ দিয়া বলিলেন "জ্ঞাতিরাই এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিল, আর কেহ পারে না"—তাহাতে কিরণশশীর বিরক্তি হইল।

শ্বশুরবাড়ীতে রজনীর যত আদর ছিল, মধ্যম ভগিনী-পতির তাহার অপেক্ষাও অধিক আদর। রজনীর অপেক্ষাও যেন তিনি অধিকতর উপযুক্ত ও সাদাসিদে ভাল লোক—কিরণশশী এখন এইরূপ কথা শুনিতে লাগিলেন।

তিনি একটি বড় ও খুব উৎকৃষ্ট কাঠের বাক্‌সে করিয়া গহনাদি আনিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার শয়ন-কক্ষেই থাকিত। একদিন বাক্‌স খুলিতে গিয়া দেখিলেন কল খারাপ হইয়া গিয়াছে, চাবি ঘুরিল না, ডালা টানিতে খুলিয়া গেল।—দেখিলেন তাঁহার সোণার চুড়ি নাই।

ভ্রাতার উপর সন্দেহ হইল। ভগিনীদের এবং মাতাকে বলিলেন। পিতা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ভ্রাতাও বাড়ীতে নাই।

মধ্যমা ভগিনীর নিকট শুনিয়া ভগিনীপতি বলিলেন, "ঐ ছোঁড়ার কাজ।" এবং রজনীর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি থাক্তে ভাবনা কি, এখনই কিনারা করিয়া দিতেছি। ডিটেক্‌টিব মধুসূদন বড়াল আমার হাতধরা লোক ; মাল কিনারা করিতে লোকটা অদ্বিতীয়। তাকে বলিলেই সে সব করে দেবে।"

রজনীর স্ত্রী ভগিনীপতির এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া মাতাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমার ভাশুরকে খবর দাও—তিনি উকীল মানুষ—সব বুঝ্তে পারিবেন। পুলিশ টুলিশকে বল্লে তারা যদি বাড়ীতে এসে সব সাক্ষী টাক্ষী নেয়, কি যদি আপনাদেরই কারো কাজ হয়, আর তাকে না ছেড়ে দেয়. তবে কি হবে?"

রজনীর শাশুড়ীর এ কথা শুনিয়া ভয় হইল। জামাইকে সেই ভয়ের কথা বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "সে চিন্তা নাই। মধু বড়াল তেমন লোকই নয়। চুপি চুপি সব ঠিক করে দিবে, কোন গোল হইবে না।"

তিনি আরও বলিলেন, "এ সকল খবর কি পরের জানা উচিত? দিদির ভাশুর যেন এ কথা কখন না শুনেন। তিনি ত চিরকাল আমাদের উপর হাড়ে চটা। তিনি মনে করেন, ভাল রোজগেরে লেখা পড়া জানা লোক তাঁদের বাড়ী ছাড়া বুঝি আর কোথাও নাই। রজনী বাবু লোক ছিলেন সরল; কিন্তু তাঁর বড় ভাই তাঁহাকে একেবারে মুঠোর ভিতরে করে নিয়েছিলেন।' রজনী বাবু সর্ব্বদা বলিতেন, 'দাদা এ বলেন, দাদা ও বলেন'—যেন দাদা সর্ব্বজ্ঞ! রজনী বাবুর কথা থেকেই তাঁহার দাদার ধরণ জানিয়াছিলাম।"

মধ্যম জামাতা মধু বড়ালকে গিয়া সমস্ত বলিলেন, এবং এ কথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

মধুসূদন খুব চতুর ডিটেক্‌টিব। বন্ধুতার জন্য কখন কখন রজনীর শ্বশুরবাড়ীতে মধ্যম জামাই বাবুকে ডাকিতে যাইতেন।

সকল শুনিয়া বলিলেন "তোমার শালা বাবু আর তার মামাতো ভাই যে মাণিকজোড়! তাদেরই কাজ! আমি তাদের বেশ জানি। মদ খেয়ে এমন ইত্‌রোমো করে চেঁচাচেঁচি গালাগালি করিতে আর ত্রুটি নাই! দুই ভাইএ এক সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে বেড়ায়। তাদের গতিবিধি যে দিক্‌টায় তাহাও আমি জানি। এখনি যাওয়া যাগ।"

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠিয়া দুইজনে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিটেক্‌টিব।

বরং মৌনং কার্য্যং নচ বচন যুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং নচ পরকলত্রাভিগমনং
বরং ভৈক্ষাশিত্বং নচ পরধনাস্বাদনসুখং
বরং প্রাণত্যাগো নচ পিশুনবাদেষভিরতি॥

অল্প অনুসন্ধানের পর একটা বেশ্যাবাড়ীতে কিরণশশীর ভ্রাতাকে পাওয়া গেল। সমস্ত রাত্রি সুরাপান করিয়া সে এবং তাহার সঙ্গী মামাত ভাই অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল।

তখন বেলা ১০টা। ঘুম ভাঙ্গাইয়া মধু বড়াল গহনার কথা জিজ্ঞাসা করাতেই দুজনের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু কিরণশশীর জ্যেষ্ঠ কিছু সপ্রতিভ, তিনি বলিলেন 'চাটুয্যে মহাশয় আর বাড়াবাড়িতে কি প্রয়োজন? এই বন্ধকী খত দেখুন। সলোমেন ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখিয়া রসিদ আনিয়াছি।'

খতে দেখা গেল, বন্ধক সোনার আট গাছা চুড়ি—ওজন লেখা নাই—দুই মাসের মধ্যে টাকা না দিলে গহনা ইহুদীরই হইবে, মাসিক ২৲ টাকা হিঃ সুদ। আসলে ৪০০৲ টাকার জিনিস লইয়া ১০০৲ টাকা দিয়াছে।

শালা বাবুদের পকেট খুঁজিয়া পাঁচ টাকা নগদ পাওয়া গেল। অবশিষ্ট টাকা সম্বন্ধে বলিল "পকেট হইতে কেহ লইয়াছে, অত খরচ ত হয় নাই।"

মধুসূদন বলিলেন যে ফিরিয়া আসিয়া পকেট হইতে টাকা খোয়া যাওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। কথাটা শুনিয়া বাড়ীওয়ালী কিছু স্তম্ভিত হইল।

বাবুরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাওয়ার সময় সে মধু বড়ালকে একটু ইসারা করায় তিনি একটু পিছু কাটাইলে, বাড়ীওয়ালী দশ টাকার দুইখানি নোট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল "চুড়ি।"

মধুসূদনও আস্তে আস্তে বলিলেন, "তোমার এইরূপ সুবুদ্ধি ও 'ভদ্র' ব্যবহারে আমার দাবী খুব কমিয়া গেল, কিন্তু আরও দশ চাই।"

তৎক্ষণাৎ আর একখানি দশ টাকার নোট হাতে দিয়া বাড়ীওয়ালী বলিল, "আপনাদের হাতেই আমাদের প্রাণ। মানীর চিরকাল মান রাখি। দয়া রাখ্‌বেন।"

ইহুদীর দোকানে গিয়া মধুসূদন বন্ধকী খতখানি দেখাইয়া চুড়ি দেখিতে চাহিলেন। ইহুদী মধুসূদনকে চিনিত। ওজন লেখা নাই বলিয়া যে অন্য হাল্‌কা চুড়ি বাহির করা—তাহা আর মধুসূদনের কাছে করিল না। আসল জিনিস বাহির করিয়া বলিল, "চোরাই বুঝি? এমন ভদ্র চেহারা, এতে স্বয়ং সলোমন সন্দেহ করিতে পারিতেন না, আমি কোন্ ছার—কি বুঝিব?"

সলোমনের দোকানে এমন ঘটনা অনেকবার হইয়াছে,—বাড়ীওয়ালীও যেমন কখন কি করিতে হয়, তাহা বেশ জানে ইহুদীও সেইরূপ। সে কিছু মাত্র ভীত বা

চঞ্চল হইল না। তবে রজনীর শ্যালক এরূপ কাঁচাচোর দেখিয়া তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল।

বন্ধকী কাগজের উপর ওজন লিখিয়া দিয়া এবং মধুসূদনের রসিদ লইয়া ইহুদী গহনাগুলি তাঁহার হাতে দিল। পরে মধুসূদনকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "বাবু, আমার ১০২৲ টাকার মধ্যে যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহার সিকি আপনার। লোকগুলা ত দেখিতে ভদ্র, আপোষে মিটমাট হইলে সব টাকাই আদায় হইবে। সেইটাই করিবেন। এটা অতি সামান্ত মোকদ্দমা—ইহা আদালতে লইয়া গেলে আপনার আর সুখ্যাতি কি বাড়িবে? মোকদ্দমা হইলে ছোঁড়াদের জেল হবে। জেলের হুকুমের সঙ্গে জরিমানাও হইলে সে টাকা আত্মীয়েরা দিবে না। বলিবে 'যখন ছয় মাস জেল খাটিল, তখন আর দেড় মাসও না হয় খাটুক—টাকা দেওয়া কেন?'—বাপ আছে বল্‌ছেন,—তবে ত ওদের নিজের কিছুই নাই! অনর্থক আমি মারা যাইব। আপনি ত সবই বুঝেন, গরীবের উপর দয়া করে এইটুকু করিবেন।"

ইহুদী মনে করিতেছিল, 'আজ মধুসূদনের সৌভাগ্যের দিন, বেশ দশ টাকা নিয়ে ছোঁড়াদের ছাড়িবে। আমি সলোমন আজ আমিই উহাকে আসল হইতে লোকসান করিয়া টাকা দিতে স্বীকার করিলাম। আমারি দুর্ভাগ্যের দিন!'

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়িল, একজন ফিরিঙ্গি

৫০০. টাকার ঘড়ি চেন আংটি প্রভৃতি বাঁধা দিয়া ছয় মাস পূর্ব্বে ১০০৲টাকা লইয়াছিল। আজ তাহার জিনিস উদ্ধারের কথাছিল। কিন্তু সংবাদ আসিয়াছে যে, অত্যন্ত অনিয়মে লোকটা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হাঁসপাতালে রহিয়াছে। জিনিস উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। মনটা কতক প্রফুল্ল হইল।

মধুসূদন বলিল "কিসে যে দাঁড়াইবে তাহা বলিতে পারি না। তবে আপনি যে বেশ বিশ্বাস যোগ্য লোক—কথার নড় চড় নাই—তাহা পূর্ব্বেত দেখিয়াছি এবং আমিও যে সন্তুষ্টচিত্ত লোক তাহাও আপনি জানেন। 'ভদ্রলোকের' মধ্যে কথাবার্ত্তায় দর দাম করিতে হয় না। যদি গোলযোগ না হয় তবে আপনার কথাই মঞ্জুর।"

রজনীর দুই শালা রজনীর ভায়রা ভাই রাজনারায়ণ এবং মধুসূদন বড়াল গহনা লইয়া রজনীর শ্বশুরালয়ে ফিরিলেন।

গহনা চেনান হইল। রজনীর শ্বশুর তখন বাড়ী আসিয়াছিলেন। মধুসূদনের শত শত প্রশংসা করিলেন।

মধুসূদন বলিলেন "একি সাধারণ কাণ্ড ঘটিয়াছে। দুইজন ভদ্রলোকের ছেলে জেলে যাইবার গতিক আর বাড়ীর মেয়েরা সাক্ষী!"

রজনীর শ্বশুরের দিকে লক্ষ্য করিয়াই মধুসূদন কথা-গুলি বলিলেন। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। ছেলে তাঁহার দেখা দেখি দুশ্চরিত্র হইল! এক্ষণে সমস্ত পরিবার

বিপদগ্রস্ত! নিজের ব্যবহারের জন্য মনে বড়ই অনুতাপ হইল।

এমন অনুতাপ যে এই প্রথম হইল তাহা নহে। অনেক সময়েই ইচ্ছা হইয়াছে যে 'এইবার হইতে ব্যবহার বদলাইব।' কিন্তু চরিত্রের অপকর্ষ হইলে মনুষ্যের মানসিক শক্তি কমিয়া যায়। বেশ বুঝিতেছে যে সুরাপান অন্যায়—প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে আর কখন পান করিবে না—অথচ মন্দ অভ্যাস যেন বলপূর্ব্বক মাতালকে সেই কার্য্য করাইতেছে! মনে হইতেছে যে এত রাগারাগি করা অন্যায় হইতেছে। এইবার থামি—লঘু বিষয়ে এত কেন—কিন্তু তথাপি কোপন স্বভাব ব্যক্তিদের থামিবার ক্ষমতা নাই।

জড় পদার্থ যেমন গড়াইয়া দিলে গড়াইতেই থাকে, ক্রমশঃ বাধা প্রভৃতির হেতু থামে, নতুবা নিজ শক্তিতে থামিতে পারে না, সেইরূপ সংযম অভ্যাস না করিলে মনুষ্যের মনে জড়প্রকৃতি প্রবল হয়। রোগ, বিপদ, বাধা প্রভৃতি ব্যতীত অনাচার ঘুচে না। কলের গাড়িকে ইচ্ছামত থামাইবারজন্য যেমন ভ্যাকুয়ম ব্রেক রাখা প্রয়োজন, মনের জন্য সেইরূপ সংযমঅভ্যাস রাখা একান্তই আবশ্যক।

যাহা হউক রজনীর শ্বশুর মধুসূদনকে বলিলেন "বাবা! তুমি জামাইয়ের বন্ধু, ছেলের তুল্য। এ তোমার ঘরেরই কথা—আমরা তোমার কাছে চিরঋণী রহিলাম। তুমি না থাকিলে জিনিসটা উদ্ধার হইত না।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশের বন্ধুতা।

যদা চরতি দুষ্টোঽস্মিন্ অহিতং লোকগর্হিতং।
বোধয়ন্তুং হিতং লোকে ভাষতে যুক্তি বিস্তরং॥

রাজনারায়ণ এই সময় বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেলে, মধুসূদন রজনীর শ্বশুরকে একটু আলাদা ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখুন আমাদের এই ডিটেক্‌টিভের কাজে অনেক সময়ে অনেক টাকা গাঁট থেকে খরচ করিতে হয়। যত খরচ হয় সব খরচ সাহেবেরা বিশ্বাস করেন না এবং সব সময়ে ঠিক যায়গায় খরচ হয় না—ভুল চুক ত আছে। কোন বিশেষ সন্ধান পাইবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক টাকা দিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু কাজ পাওয়া না গেলে সে সব টাকার কথা সাহেবদের কাছে লজ্জায় বলিতেই পারা যায় না। এজন্য আমার কিছু টাকার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

এই ভূমিকায় রজনীর শ্বশুর একটু দমিয়া গেলেন। তখন মধুসূদন বলিতে লাগিল "এ মোকদ্দমায়—('মোকদ্দমা' কথাটি শুনিয়া রজনীর শ্বশুরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল) আপনার ছেলের অন্ততঃ ছয় মাস কারাবাস অবশ্যম্ভাবী। দুই বৎসর হইতেও পারে।

"কোন কোন হাকিম ভদ্রলোক অপরাধীদিগকে

অতিরিক্ত শাস্তি দিতেই ভাল বাসেন। তাহাদের দুই বৎসর কারাদণ্ড যে ছোট লোকের পাঁচ বৎসরের সমান, দুই বৎসরের পরিশ্রম সহ কারাবাসে—ঘানি টানায়—যে অধিকাংশ ভদ্রলোকের ছেলের দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইবার—হয়ত মরিয়া যাইবারই—সম্ভাবনা তাহা উঁহারা ভাবেন না। আপনার ছেলের ত এই অবস্থা। এ দিকে কন্যা এবং স্ত্রীই প্রধান সাক্ষী। এরূপ অবস্থা দেখিলে অতি কঠিন হৃদয় ব্যক্তিরও দয়া হয়। আপনি পিতৃ তুল্য ব্যক্তি, আপনার জন্য আমার ত দুঃখ হইবেই।

"কিন্তু কি জানেন আমরা ডিটেক্‌টিভ। মোকদ্দমা ছাড়িয়া দি বলিয়া একবার একটু সন্দেহ হইলেই সাহেবেরা আমাদের আর এ কর্ম্মে রাখেন না। থানাওয়ালারা যে সময়ে সময়ে বেশ দশ টাকা পায়—দশ রকম অন্যায় কার্য্য করে—সে কথা দেশের লোকেও জানে,আর সরকার বাহাদুরের ঘরেও সে কথা অগোচর নয়। একজন লাট সাহেব নিজেই এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ছিলেন যে একে বারে ঘুস বন্ধ করিতে পুলিশ কর্ম্মচারীদের যত টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিতে হইবে, তত টাকা সে জন্য দেওয়া যায় না। আসল কি জানেন, থানার সম্বন্ধে প্রধান কথা, বাহ্য শান্তি রক্ষা করা—জমিদারদের ও দুর্ব্বৃত্ত প্রজাদের দমনে রাখা। সেটা থাকিলেই সাত খুন মাপ। দাঙ্গার মোকদ্দমা মফঃস্বল পুলিসের খাতায় খুনের চেয়ে বড়। আমাদের তাহা নয়। আমাদের মাহিনাও অনেক

বেশী দেয়। খাঁটি লোকের সংখ্যাও আমাদের মধ্যে অনেক। মোকদ্দমা ছাড়িতে আমাদের বড়ই ভয় হয়, আর মোকদ্দমার কিনারা করিতে পারিলে আমাদের একটা বিশেষ সুখ হয়। এটা নেহাত সাদাসিদে অনুসন্ধান— আর যা বল্লেন আত্মীয়দের মধ্যে ঘটনা। আপনাকে লজ্জা করিয়া আর কি হইবে—আপনি বিবেচক ব্যক্তি আমার কষ্ট সবই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাকে ৫০০৲ টাকা জল খাইতে দিন। আমি ঐ থেকেই ইহুদীর টাকা দিব।

"আর এক কথা—আপনার মধ্যম জামাতা রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা আছে। তাঁকে একথা কোন মতেই বলিবেন না প্রতিজ্ঞা করুন। রাজনারায়ণ বাবুর কোন কথাবার্ত্তার ভাবে যদি আমি বুঝিতে পারি যে তিনি আমার এইরূপ দায়ে পড়িয়া—একান্ত বাধ্য হইয়া—আপনার কাছে এই সামান্য সাহায্য প্রার্থনার কথা শুনিয়াছেন, তখন আমার বড়ই লজ্জা হইবে—হৃদয় বিদীর্ণ হইবে--যে এতকালের বন্ধুতা গেল! আর যদি বন্ধুতাই গেল তবে রেয়াত কাকে? আমি তদ্দণ্ডেই থানায় গিয়া সাহেবকে সব কথা বলিব।

রজনীর শ্বশুর এই সমস্ত যুক্তির স্রোত একপ্রকার হতবুদ্ধি ভাবেই চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন—মধুবড়ালের কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমে প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন।— একটু বিলম্বে বলিলেন "আমি সবই বুঝিতেছি। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাইব?"

মধুসূদন বলিলেন "আপনি ভদ্রলোক, বুদ্ধিমান্—আপনাকে আমি সব কথাই খুলিয়া বলিয়াছি। এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা। আমি এই বাহিরের ঘরে বাবুদের সঙ্গে বসিয়া থাকি আপনি এক ঘণ্টার মধ্যে জোগাড় করিয়া ফেলুন। আর আপনার প্রতি একান্ত অনুরোধ রাজনারায়ণ যেন একথা কোন মতে শোনে না। বেশী দেরী করিবার উপায় থাকিলে বেশী সময় দিতাম। কিন্তু সাহেবকে সকল কথা বলিতে হইলে তিনি ঘড়ি ঘণ্টার হিসাব লইবেন। এখানে অধিক দেরীর কথা বুঝিলে তাঁহার সন্দেহ হইবে। সাহেবকে বলিতে হইলে আমাকে দুই প্রহরের মধ্যেই বলিতে হইবে। এই সামান্য মোকদ্দমায় আমি মধুসূদন বড়াল আটটার সময় খবর পাইয়া দুই প্রহরের মধ্যে সমস্ত শেষ করি নাই একথা বলিতে যে আমার মাথা হেঁট হইবে! সে কার্য্য আমি কোন মতেই পারিব না।"

রজনীর শ্বশুর দেখিলেন যে খুব শক্ত লোকেরই মুঠার মধ্যে পড়িয়াছেন। টাকা দিতেই হইবে, নচেৎ ছেলে জেলে যায়, স্ত্রীলোকদের অপমান হয়।

বলিলেন "আমি দুই শত টাকার চেষ্টা করিয়া দেখি। অত টাকা পাওয়া অসম্ভব।"

মধুসূদন বলিলেন "মহাশয় পিতৃতুল্য ব্যক্তি। অধিক কি বলিব? আমি যাহা বলিয়াছি সে কথার নড়চড় করি এ সাধ্য আমার নাই। ৪৯৯৲ টাকা লইলেও

আমার কথা মিথ্যা হইবে। মিথ্যা কথা কওয়া আমার দ্বারা ঘটিবে না।”

রজনীর শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন “বাড়ীতে এক পয়সা নাই। চারিদিকে দেনা, এখন এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ শ টাকা না দিলে ছেলে জেলে যায়। তোমাদের আদালতে সাক্ষী দিতে হয়। তোমার গুণের ভাইপোও এর ভিতর আছেন। কিন্তু তারা ওকে হার মেনেছে। মদ খেয়ে কনেষ্টবলকে আধমারা করায় মোকদ্দমায় জেল হয়ে অবধি ওরা আর কিছুই করে না। এ সকল আমার পাপেরই ফল! ছেলের হাতেই ভগবান আমার মরণ লিখিয়াছেন।”

রাজনারায়ণও বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, শ্বশুরের নিকট সমস্ত শুনিলেন। তিনি রাগান্বিত হইয়া মধুসূদনকে ভৎর্সনা করিতে বাহির হইতেছিলেন। রজনীর শ্বশুর তাহার হাত ধরিলেন।

বলিলেন “ও ব্যক্তি নিখিরিকচে টাকা চায়। তুমি এখন দু কথা শুনাইয়া দিলেই ও যাহা বলিয়াছে তাহাই করিবে। ওকি জানে না যে তুমি সব শুনিতে পাইবে? কিন্তু তাহা হইলেও তুমি উহাকে কথাটি কহিতে পাইবে না, এই কথাই বলিয়া দিয়াছে।”

রাজনারায়ণ বাবুর মনে পড়িল যে মধুসূদন অনেক সময়ে গর্ব্ব করিয়াছে যে ‘উহার কথার ‘নড়চড় হয় না’, এবং সেই জন্যই অনেক কাজ অল্প সময়ে করিতে

পারে। যাহাকে যাহা বলে সে বুঝে যে অনর্থক বিতর্ক করা বৃথা—"মধুসূদন" যাহা বলিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই করিবে।

মধুসূদন গল্প করিয়াছিল যে এক সময়ে সাহেবের কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে কোন একটি মোকদ্দমার কিনারা যদি মানুষের সাধ্যে থাকে ত তাহা করিয়া দিবে। বহু চেষ্টায় তাহার কতক ঠিকানা পাইলে, জানিয়াছিল যে একজন খুব বড় মানুষ তাহার একটু সংশ্রবে আছেন। সেই ধনী ব্যক্তির উপর পাছে একটুও প্রকাশ্যে সন্দেহ হয় এই ভয়ে তাঁহার লোকে মধুসূদনের আবিষ্কৃত বিবরণ গাপ করিবার জন্য তাহাকে ৫০০০৲ টাকা দিতে চায়। খুব সহজে খবর টুকু গাপ করা যাইতে পারিত, কিন্তু মধুসূদন সাহেবের কাছে কথার নড়চড় করে নাই—টাকা লয় নাই।'

আর একদিন গল্প করিয়াছিল যে এক রাত্রে একটি সুসজ্জিত ও সুপুরুষ যুবকের সহিত তাহার পথে বিবাদ হয়। যুবক একটু মাতাল অবস্থায় ছিল। মধুসূদন বলে 'আমি কে তুমি জান? আমার সঙ্গে মাতলামি! তোমাকে চালান দিব।' মাতাল বলে. 'কিষ্কিন্ধ্যায় বাড়ী বুঝি?' সঙ্গী অপর একটি যুবক ছিল সে ভয় পাইয়া বলে 'মাপ করুন।' মধুসূদন মাতালের কথায় হাসিয়া বলিয়াছিল 'বড় ভাল—কিন্তু পঞ্চাশ টাকা নগদ চাই। নচেৎ এই পাহারাওয়ালা ডাকিলাম।' তখন যুবকদ্বয় কাতরতা প্রকাশ

করিয়া স্বীকার করে যে চেন প্রভৃতি সমস্ত গিল্টি। জেবে ঘড়ি নাই, শুধু চাবির রিং। উহারা কালেজের ছাত্র, ফোতো বাবু মাত্র। দুজনে দশ টাকার অধিক জোগাড় করিতে পারিবে না, তাও অনেক কষ্টে। মধুসূদন বলিয়াছিল 'আমার এষ্টিমেটের বড়ই ভুল হইয়াছে। তোমাদের অমনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু আমার গুণ বলুন আর দোষ বলুন, এক বিষয়ে আমি খাঁটি। কথার নড়চড় নাই। পঞ্চাশ টাকা যখন দিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই তখন থানায় যাইতেই হইবে।' তখনি কনেষ্টবল ডাকিয়া জিম্মা করিয়া দিয়াছিল। যুবকদ্বয় আদালতে বিচারের সময় মধু বড়াল ঘুস চাহিয়াছিল বলায় উপহাসাস্পদ হয় এবং তাহাদের কিছু দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় মাত্র!

ক্ষণমধ্যে এই সকল কথা রাজনারায়ণের মনে উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন যে এখন রাগারাগি করিলে কোন উপকার হইবে না।

শ্বশুর কাতরভাবে বলিলেন "বাড়ীতে যে কিছুই নাই। গহনা পত্রও যে তেমন কিছু নাই। এত টাকার কি হবে বাবা!—"

রাজনারায়ণ বলিলেন "অনেকটা টাকা! আমারও ত হাতে নাই। তাইত কি কর্ত্তে কি হোল?"

রজনীর শাশুড়ী বলিলেন "অলুক্ষুণে মেয়ে—ওর বাতাসে কি কাহার ভাল হইবার যো আছে!"

মাতার কথায় কিরণশশীর প্রথমে বড়ই লজ্জা হইল। উহাঁর ঐ কথাই মনে হইতেছিল। ভাবিতেছিলেন,আমার জন্যই এখানে আজ এত বিপদ। কিন্তু মাতা ঐ কথা প্রকাশ্যে বলায় তখনি মনে একটু ক্রোধও হইল। ভাবিলেন 'দোষ যাহারা চুরি করিল বা যাহারা কুশিক্ষা দিল তাহাদের নয়। দোষ আমার!' আরও মনে হইল 'তিনি ভাল মন্দ বুঝিতেন—আমি তখন মন্দকেই ভাল মনে করিতাম। তিনি এ বাড়ীর কোন দোষ ধরিলে আমার রাগ হইত। কিন্তু তিনি নিজের আলাদা এক পয়সা রাখিতেন না। কত রোগীকে কাপড় ও পথ্যের খরচ দিতেন। সেদিন ভাশুর নিজেদের টাকার কিছু অংশও বিধবা ভ্রাতৃবধূ বলিয়া আমাকে দেওয়াইলেন। আর এঁরা বিধবা ভগিনীর গহনা চুরি করেন!' চক্ষে জল ভরিয়া আসিল।

সেখান থেকে সরিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রাজনারায়ণ পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "বড়ই বিপদ উপস্থিত। তা আমি থাকিতে তোমার কোন চিন্তা নাই। এ টাকা শ্বশুর মহাশয়ের হ্যাণ্ডনোট লইয়া আমিই যোগাড় করিয়া দিব। তোমার জন্য—স্বরে কিরণশশী শিহরিয়া উঠিলেন—"তোমাদের জন্য আমি সবই করিতে পারি।"

কিরণশশী গায়ে কাপড় টানিয়া নিরুত্তরে ঘরের বাহির হইতে গেলে রাজনারায়ণ বলিলেন, "আমার উপর আপনি বিরক্ত কেন? কথাবার্ত্তা কহেন না কেন?"

রজনীর শাশুড়ী ও শালীরা সেই ঘরে আসিলে রাজনারায়ণ বলিলেন "মা! আমি বলিতেছিলাম যে একথা যেন দিদির শ্বশুর বাড়ীতে প্রকাশ না হয়।"

রজনীর স্ত্রী দেখিল কৈ সে কথা ত বলেন নাই। তবেত ভগিনীপতি মহাশয় যে সামান্ত কয়েকটি কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তাহাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যে তজ্জন্ত অপরের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন!—বড়ই রাগ হইল। কান্না আসিল। আরও মনে হইল, 'আমার কপাল না পুড়িলে এ সব ঘটিবে কেন?'

কিরণশশী ঈষৎ কম্পিত হস্তে নিজের বাক্স খুলিয়া ভাশুরের কিনিয়া দেওয়া নিজের নামে যে কোম্পানির কাগজ ছিল তাহার একখানি বাহির করিয়া মাতাকে দিলেন এবং ভগিনীপতি শুনিতে পান এইরূপ স্বরেই বলিলেন "আমার কথামত আমার ভাশুরকে খবর দিলে আমাদের এতটা বিপদ হইত না। ৪০০ টাকার চুড়ির জন্ম ৫০০ টাকা গেল, আর এতটা ঘোঁটমণ্ডল। আমার ভাশুর হয়ত সব বুঝিয়া কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিতেই বারণ করিতেন।—আমি শুনিয়াছি এই খানা আমি সই করিয়া দিলেই টাকা হইবে। এ টাকা আমার ভাশুরের কথায় আমার শ্বশুর ঠাকুর আমাকে দিয়াছিলেন। প্রদোষের টাকা আলাদা আছে।—এর পর বাবা যা হয় তা করিবেন। এখন এই থেকে বিপদ উদ্ধার হোক।"

রাজনারায়ণ কিরণশশীর কথায় একান্ত বিরক্ত হইলেন।

নিজেরও বোধ হইতেছিল, 'তাইত বন্ধুকে ডেকে আমি নির্ব্বোধ দাঁড়াইয়া গেলাম।' এখন মনে হইল 'আর এই অল্পবয়স্কা বিধবা সেই কথা অতি পরিষ্কার রূপে সবাইকে বুঝাইয়া দিল এবং আরও বলিল যে তাহার কথামত তাহার ভাশুরকে ডাকিলে এমন হইত না!'

নিজের বোকামির কথা অন্যে বলিলে—বিশেষতঃ মেয়ে মহলে মেয়েরা বলিলে—কথা যদি সত্য হয় তবে বড়ই রাগ হয়।

রাজনারায়ণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে মনে মনে বলিলেন 'তবে ওর টাকাই যাউক' এবং প্রকাশ্যে বলিলেন "এখন ঐ কাগজেই রফা হউক। পরে আমি টাকা দিব।"

রজনীর শ্বশুর সেখানে আসিয়াছিলেন। বিধবা মেয়ের টাকা লইতে বড়ই লজ্জা বোধ হইল। কিন্তু এখন ত বাড়ীতে কিছু নাই, গহনাপত্রও নাই। বসত বাড়ীর উপরই জামাতার নিকট ক্রমশঃ অনেক ধার লইয়াছেন! সময়ও অধিক নাই। তিনিও জামাতার কথা হেঁট মুণ্ডে স্বীকার করিলেন, বলিলেন "মার টাকা আমি শীঘ্রই দিব।"

রজনীর স্ত্রী কাগজের উপর সহি করিয়া দিল।

অল্প বয়স্কা বিধবাদিগকে অতিশয় বিপদে পড়িয়াই অল্পকাল মধ্যে বিষয় বুদ্ধি সম্পন্না হইতে হয়। যে সকল কথা সধবাদিগের শুনিবার দরকার হয় না, অথবা স্বামীর কথা অনুসারে যে কাজ তাঁহারা কিছু না বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে

করিয়া থাকেন, টাকাকড়ির সম্বন্ধে—নাবালক পুত্রের জন্য, নিজের স্ত্রীধনের জন্য—সে সকল কার্য্য বিধবার নিজেকেই করিতে হয়। ঐ সব কথা শুনিতে, ঐ সব কাজ করিতে হওয়ায় ও সকল তাঁহাদের একরূপ শিক্ষা হইয়া যায়।

কোম্পানীর কাগজখানি লইয়া রজনীর শ্বশুর মধুস্দনের নিকট গেলেন। বলিলেন "এই খানা বিক্রয় করিয়া আপনাকে টাকা দিব।"

মধুস্দন কাগজ খানি দেখিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নামের কাগজ—স্ত্রীলোকের সহি, আপনারা দুইজন সাক্ষী স্বরূপে সহি করুন। এখন কাগজ ১০৪৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অনর্থক দালালি লাগাইয়া কাজকি?—আমি ২০৲ টাকা দিতেছি। এত আর নম্বরি নোট লইতে ভয় হইবার মত জায়গা নয়। এ হোল আপোষের কথা।"

মধুস্দন সেইদিন প্রাতঃকালেরই সংগৃহীত অর্থ হইতে পকেট থেকে ২০৲ টাকা বাহির করিয়া সামনে রাখিলেন।

রাজনারায়ণ এই সময়ে তথায় আসিয়া বলিলেন "ভাল বন্ধুর কাজ করিলে!"

মধুস্দন যেন একেবারে একান্তই রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রজনীর শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয় কথা তুলিলেই কথা উঠে। আমি এই কটা টাকা শৌণ্ডিকালয় হইতে রক্ষা করিয়া নিজের কাচ্ছা বাচ্ছার জন্য লইতে ছিলাম সন্দেহ নাই। (রজনীর শ্বশুর লজ্জায় অধোবদন হইলেন)—কিন্তু আমি শ্বশুর বাড়ীর পাট্টা

হস্তগতও করি নাই এবং ইয়ার বন্ধুদের কাছে শালীদের রূপ বর্ণনা করিয়া মনের মাহাত্ম্যও জাহির করি নাই। এমন সকল ভাল বন্ধুর ও কুটুম্বের কার্য্য আমার ন্যায় ছোটলোক পুলিস কর্ম্মচারীর দ্বারা ঘটা কি সাধ্য ?"

এই কথায় রাজনারায়ণ বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া মধুসূদনের দিকে অগ্রসর হইলে, মধুসূদন তৎক্ষণাৎ কল্পিত কোপ ত্যাগ করিয়া জোড় হস্তে বলিল "ভাই মাপ কর। হঠাৎ তোমার কথায় রাগ হইয়া কি বলিয়াছি মনে লইও না। তুমি আমার বিরুদ্ধ হইবে আমি কখনই ভাবিতে পারি না। তোমাকে টাকার কথা শুনাইতে বারম্বার বারণ করিয়াছিলাম।"

মধুসূদন তখন রজনীর শ্বশুরের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন "যদি আপনাদের উপকার করিতেছি—সস্তাতেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন—এমন মনে না হয়, যদি আমার কর্ত্তব্যের পথে থাকাই প্রার্থনীয় বোধ হয়—কাগজটা ফিরাইয়া লউন।"

রজনীর শ্বশুর বলিলেন "রাগ করিবেন না। বাবাজী কথাটা ভাল বলেন নাই। আপনার হাতেই এখন আমাদের প্রাণ।"

মধুসূদন বলিলেন "এ সকল বে-আইনী কার্য্য করিলেই বিপদের সম্বল রাখা দরকার হয়। সাহেবের কানে একথা উঠিলে যাহা দিতেছেন তাহা ত যাইবেই, আরও ঘর থেকে অন্ততঃ চার পাঁচ গুণ দিতে হইবে—তাই ছোঁবে কি না

বলা যায় না। মনে করিতেছেন যে মোকদ্দমা গাপ করা বড় সোজা কাজ, উহাতে টাকা খরচের কোন সম্ভাবনা নাই। সব যায়গায় অবশ্য ভয়ের কথা নাই—কিন্তু একটা 'ইনসিওর্যান্স ফি' এর গোছ না লইলে আমলে ঠিক দাঁড়াইবে কেন? বন্ধুতার অনুরোধেই অন্যায় করিতেছি। নচেৎ চোর ধরাই আমার ব্যবসায়—তাহাতেই আমার নাম যশ। চোর ছাড়া আমার ব্যবসায় নহে। কেবল বিপদের ভয়ে টাকা লইয়া রাখিতেছি, এরূপ ভাবে না দেখিয়া 'বন্ধু কি করিয়া টাকা লইলেন?'—এই ভাবনাই কি বড় হইল? বন্ধু যে তোমাদের জন্য ফাঁসির ভিতর গলা পরাইয়া রাখিল, প্রকাশ হইলে পর বন্ধু ফাটকে গেলে বা তাহার চাকরী গেলে যে তাহার কাচ্ছা বাচ্ছারা খাইতে পাইবে না, সেটা এক বারও মনে হইল না?—এমনি কলিকাল!"

—অতি সকরুণ স্বরে শেষের এই কথাগুলি বলিয়া মধুসূদন দেখাইল যেন উহার প্রতিই অতিশয় অন্যায়াচরণ হইতেছে!

সকলেই সাধ্য সাধনা করায় মধুসূদন কোম্পানীর কাগজ খানি লইয়া এবং গহনাগুলি রজনীর শ্বশুরকে দিয়া ঐ বাড়ী হইতে যাইবার সময় রাজনারায়ণকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

বলিল "পরম বন্ধুদের মধ্যেও কখন কখন কথান্তর হয়। আজ আমার বাসায় সন্ধ্যার সময় তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। না গেলে বড়ই দুঃখিত হইব।"

রাজনারায়ণ বলিল "আর সোহাগে কাজ নাই; যে মর্ম্মান্তিক সব বলিয়াছ!"

মধুসূদন ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তুমি ভাই আমার উপর ব্যঙ্গোক্তি করিতে গেলে কেন? যাহার সঙ্গে যুদ্ধে পারা অসম্ভব, সে যায়গায় যুদ্ধ ঘোষণা কেন? একাজ ইংরাজ ফরাশিও ত করে না!

"আমি জাহাজী গোরাদের ঘুসি আটকাইয়া তাহাদের চিৎপাত করিয়াছি, আর তোমার একটা কথার জবাব দিতে হার মানিব এইটাই কি তোমার মনে হইয়াছিল? তবে এত দিনে বন্ধু চিনিলে কি? আর দেখ শ্বশুর বাড়ী থেকে পাবার এবং দোয়াবায় সম্পর্ক। তুমি বিবাহের সময় ব্রাহ্মণের কন্যাদায় পাইয়া ডেঁড়ে মুসে নগদ হাজার টাকা লইয়াছিলে, তোমার বন্ধু না হয় আজ তাঁহার পুত্রদায়—ছেলের ফৌজদারীর হাঙ্গামা—পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে তাহার অর্দ্ধেক টাকা আদায় করিয়া লইল! বাড়ীটা না হয় দুমাস আগেই বিক্রয় হইবে—তাতে তোমার ক্ষতি কি? শ্বশুরের দুঃখে আর কাতরতা দেখাইও না। রক্ষা কর!"

রাজনারায়ণ মধুসূদনের বাক্যের বাঁধুনি, কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, স্বার্থপরতা এবং অক্ষুণ্ণ নির্লজ্জতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল। ডিটেক্‌টিব মধুসূদনের মনের ও শরীরের গঠন অনেকটাই ইউরোপীয়দিগের ন্যায়। মধুসূদনের ক্ষমতার চটকে উহার দুর্নীতি যেন অনেকটা প্রচ্ছন্ন!

কিরণশশীর গহনার বাক্সের কল বদলাইয়া ভাল কল বসান হইল। এবং উহা তাঁহার মাতার ঘরে বড় সিন্ধুকের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

কিরণশশীর পিতা বড়ই লজ্জা পাইয়াছিলেন; নিজের দোষেই যে ছেলে এমন হইল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই দিন হইতে আর মদ্য স্পর্শ বা রাত্রে বহির্গমন করেন নাই।

পুত্রও লজ্জা পাইয়াছিল। তাহারও মনে হইয়াছিল অসৎ কর্ম্ম ও অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করিবে। চেষ্টা করিয়া একটি সওদাগরী আফিসে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হইল। কিন্তু সেই আফিসের কুচরিত্র দুষ্ট লোকের সহিত সংশ্রবে আবার শীঘ্রই গোপনে গোপনে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। উহার বাপের অবস্থা ভাল শুনিয়া উহাকে অসৎ কর্ম্মে ব্রতী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাই হইয়াছিল—আবার এদিকে উহার সংযম ক্ষমতা আদবেই দৃঢ় ছিল না!

কন্যার দেনা শোধ করিবার জন্য কিরণশশীর পিতা বাটী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নিজের বিষয়-কর্ম্মও অনেকটা যত্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় জমির মূল্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হওয়ায় বাড়ীর ভাল দর আসিতে লাগিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ছেলের ঝগড়া।

ন কিঞ্চিৎ সুন্দরং দৃশ্যং বালানাং খেলনং যথা।
সংসার বিষবৃক্ষস্য সুধাস্বাদু ফলোপমং॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনাথবন্ধু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কথা স্থির করিয়া প্রথমে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

তিনি সিয়ালদহে গিয়া দেখিলেন যে সাবেক বাটীর অন্য কায়মী ভাড়াটিয়া হইয়া গিয়াছে। তাহার নিকট অন্য একটি ক্ষুদ্র কিন্তু নূতন বাড়ী খালি পাইয়া তাহাই ভাড়া লইলেন। সামান্য ভাবে ঘরগুলি সাজাইয়া লইলেন। রজনীর পুস্তক ও যন্ত্রাদি এবং তাহার কয়েকটি আলমারি আনন্দনাথদিগের বাড়ী ছিল—বিক্রয় করা হয় নাই। সে সমস্ত বাসায় আনাইয়া—উপরের বড় কুঠারীটি সজ্জিত করিলেন। কিন্তু আলমারি কয়েকটী রাখাতেই উহা খুব ছোট দেখাইতে লাগিল। ঐটিই রজনীর স্ত্রী ও পুত্রের শয়ন গৃহ হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। রজনীর একখানি ফটোগ্রাফ বান্ধাইয়া ঐ ঘরে রাখিয়া দিলেন।

সিয়ালদহে পুনরায় ওকালতী আরম্ভ করিলে অনাথবন্ধু

শীঘ্রই কাজ কর্ম্ম পাইতে লাগিলেন। মাস দুই বাদে একটা ছুটীতে কাশী গিয়া বাসা হইতে স্ত্রীকে আনিলেন।

সংসার কাশীতে ছোট একটি বাসা লইলেন। ছোট বৌ কাশীতেই রহিলেন।

মহামায়া বাসায় আসিয়া রজনীর স্ত্রী ও তাহার ছেলের কাপড় জামা প্রভৃতি কিছু কিছু নূতন কিনিয়া ও প্রস্তুত করাইয়া সমস্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছাইয়া রাখিলেন।

অনাথবন্ধু প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া প্রদোষকে দেখিয়া আসিতেন। স্ত্রী পুত্র কলিকাতার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলে প্রদোষ ও তাহার মাতাকে আনিবার জন্য দিন দেখিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন।

রজনীর শাশুড়ীর ইচ্ছা ছিল 'এখন লইয়া গিয়া কাজ নাই' এইরূপ জবাব দিবেন, কিন্তু অনাথবন্ধু সেই দিন বৈকালে গিয়া বলিলেন 'নিদেন সকালে এসে বৈকালে ফিরে যাবেন। এরা সকলে একবার দেখতে চায়। প্রদোষ এখানে খেলুড়ী পায় না—আমার ছেলের সঙ্গে পূর্ব্বের মত খানিক খেলে ছুটে আসবে।'

কাজেই মত হইল। কথা রহিল ১০।১৫ দিন বাদে কিরণশশী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিবেন।

কিরণশশীর মাতা বলিলেন, "এ অবস্থায় মা কি মেয়েকে কাছে না পেয়ে থাক্‌তে পারেন ?"

বাসায় আসিয়া কিরণশশী তাহার জন্য রক্ষিত ও সজ্জিত ঘর দেখিল। মহামায়ার সহিত রোদন করিয়া এবং তাঁহার

মুখে রজনীর গুণ বর্ণনা শুনিয়া আন্তরিক শোক যে কত তাহা দেখিল এবং সকল বিষয়েই তাহার ছেলের উপর অনাথবন্ধুর এবং মহামায়ার অকৃত্রিম স্নেহ বুঝিতে পারিল।

বাপের বাড়ীতেও তাহার জন্য শোক শুনিয়াছিল তাহাও আন্তরিক—কিন্তু তাহাতে 'তাহার' দশা কি হইল এই কথাই শুনিয়াছিল। 'আমাদের একি হইল'—একথা শুনে নাই। সে কি রত্নই ছিল, কত সময়ে কত লোকের প্রতি কিরূপ উদার এবং সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে, কিরূপ তীক্ষ্ণধী ছিল—অনাথের মাতার নিকট বহুবার শোনা রজনীর ছেলেবেলার গল্প সকলের আলোচনা কিরণশশীর বাপের বাড়ীতে ত ছিল না। বেশ রোজগেরে ছিল—এই কথা মাত্র মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আসিয়াছিল সুতরাং এই শ্বশুর বাড়ীই যে এখনও তাহার প্রকৃত থাকিবার স্থান কিরণশশী তাহা অতি সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

রজনীর ফটোগ্রাফ খানি একটি কুলুঙ্গিতে রক্ষিত ছিল। একটু কাপড় ঢাকা। প্রদোষ এবং সত্যনাথ যখন উপর নীচে এঘর ও ঘর দেখিতে লাগিল, কিরণশশী ও মহামায়া তখন ফটোগ্রাফ খানির নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে ছিলেন। অনাথের স্ত্রী বলিলেন "কি রূপই ছিল আর কি গুণ! মানুষে কি এত ভাল হয়! অত ভাল পৃথিবীর জন্য নয়।"

মহামায়া ফটোগ্রাফ খানি কাপড় দিয়া পুনর্ব্বার ঢাকিয়া দিলে কিরণশশী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। মহামায়া বলিলেন

"আজ সকালে তোমার আসবার আগে উনি বলিলেন, প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রদোষের এ ছবি দেখে কাজ নাই। ছবি দেখিয়া সে কাঁদিতে থাকিলে মেজ বৌমা কখনই থামাইতে পারিবেন না। আরও কিছু দিন গেলে প্রদোষ প্রত্যহ সকালে উঠিয়া এই ছবির কাছে উদ্দেশে প্রণাম করিতে শিখিবে। বইগুলি ওর জন্যে আছে, সবই ওকে পড়িতে হইবে, সর্ব্বদাই এই কথা শুনিবে।"

রজনীর স্ত্রীর হৃদয় ভাশুর এবং যায়ের উপর একান্ত কৃতজ্ঞ হইল। মনে হইল 'এতটা দূর দেখিয়া ভাল বাসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কেহ কি কিছু করিতে পারেন? তিনি পারিতেন আর তাঁর সম্পূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও বড় ভাজই পারেন।'

প্রদোষের বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। সত্যনাথ তাহার অপেক্ষা এক বৎসরের বড়।

ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া মধ্যে মধ্যে অবশ্যম্ভাবী। রজনীর পুত্র স্বভাবতঃই একটু দুরন্ত। এদানী বহুকাল তাহাকে কেহই ধমকাইয়া কথা কয় নাই। সকল অন্যায়ই সকলে সহ্য করে। সে একটু মারকুতো এবং খুব আব্‌দেরে হইয়াছে। তবে যাহাকে বাড়ীসুদ্ধ অন্য সকলেই একান্ত মান্য করিতেছে দেখিতে পায়, ছোট ছেলেরা তাহার প্রতি অমান্য করিতে পারে না। এই জন্য জ্যাঠামহাশয়ের উপরই তাহার ভয় ভক্তি আছে।

এক দিন প্রদোষে এবং সত্যনাথে ঝগড়া করিয়াছে।

প্রদোষ হাতে একখানা ঝিনুক পাইয়াছিল। তদ্দারা সত্যনাথের মাথায় মারিয়াছে। মাথা ফুলিয়া গিয়াছে।

পাছে ছেলেকে কেহ কিছু বলে সেই ভয়ে রজনীর স্ত্রী পুত্রকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিলেন।

এত বেশী মারের কারণ বুঝিতে পারিয়া মহামায়া একটু ক্ষুন্ন হইলেন, কিন্তু অন্য কোন কথা না বলিয়া কেবল "ছি! অত মার মারিতে আছে?"—বলিয়া ছেলে কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনাথবন্ধু যখন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিলেন প্রদোষ তখনও ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে।

অনাথবন্ধু মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সত্যনাথের সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে।

প্রদোষ প্রথমে অনাথবন্ধুর কাছে গেল না। জগতের সকলকেই বোধ হয় সে তখন শত্রু মনে করিয়াছিল। ক্রমে আদর করিয়া ডাকিতে ডাকিতে কাছে আসিল এবং অভ্যাস মত অনাথবন্ধুর ছাড়া জুতা কাপড় নিয়মিত স্থানে রাখিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে ফুঁপাইতেছে।

অনাথবন্ধু প্রদোষকে কোলে লইয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন। প্রদোষের মুখও ধুইয়া দিলেন। আবার কোলে করিয়া সন্ধ্যা করিবার স্থানে আসিয়া তাঁহার জন্য যে জল খাবার সাজান ছিল তাহা হইতে একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া উহার মুখে দিলেন।

ক্রমে জ্যাঠা ভাইপোতে পূর্ব্ববৎ ভাব হইল। তখন অনাথবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছিল?"

প্রদোষ একটু দুরন্ত কিন্তু মিথ্যা বলিতে জানে না। বলিল "দাদাকে বলিলাম 'তোমার মারবেলটা একবার দাও আমারটা হারাইয়া গিয়াছে।' দাদা বলিল 'তোমারটা খোঁজ—আমারটা দোব না, ঐটা নিয়ে আমি এখন খেল্‌ব।' আমি কাড়িয়া লইতে গেলাম—দাদা পলাইয়া যাইতে লাগিল। আমার হাতে ঝিনুকটা ছিল—ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলাম। দাদা তাই মাকে বলে দিয়ে মার খাইয়েছে।"

অনাথবন্ধু সত্যনাথকে ডাকিলেন এবং কিরণশশীকেও দ্বারের অন্তরালে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সত্যনাথকে জিজ্ঞাসা করায় সেও ঐরূপই বলিল।

তখন অনাথবন্ধু স্বীয় পুত্রকে বলিলেন "তুমি হলে দাদা। তোমাকে প্রদোষ দাদা বল্‌বে। তুমি খড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় এখন লিখ্‌তে শিখ্‌ছ, ও আবার তোমার কাছে লিখ্‌তে শিখ্‌বে। তুমি একটা মারবেল যদি ছোট ভাইটীকে দিতে পারিবে না, তবে দাদা হবে কেমন করে?—ছি! না দিয়ে ভাল করনি।"

সত্যনাথ বলিল "তারপর আমি দিতে গিয়াছিলাম—মেজ খুড়িমা ফেরত দিলেন।"

অনাথবন্ধু সত্যনাথের শেষের কথাটুকু যেন শুনিতেই পান নাই এরূপ ভাবেই বলিলেন "এখন সেটা আনিয়া প্রদোষকে দিবে?"

সত্যনাথ জামার পকেট হইতে মারবেলটা বাহির করিয়া প্রদোষের হাতে দিল।

অনাথবন্ধু প্রদোষকে বলিলেন "দাদাকে মারিতে আছে?—ছিঃ! তুমি দাদাকে 'নম' কর। দাদা তোমাকে কত ভালবাসে—আর তোমার মারে তার মাথায় এত লেগেছে দেখে তোমার দুঃখ হয় না? সে দিন তুমি হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলে তোমার দাদা তোমার ছড়ে তেল লাগিয়ে দিলে।—তুমি উহাকে 'নম' কর। বল আর এমন করিব না।"

প্রদোষ সহজে ঘাড় নোয়ায় না। কিরণশশী মনে করিতেছিলেন যে, গোঁয়ার ছেলে জ্যাঠার কথা শুনিবে না। কিন্তু অনাথবন্ধু উহার মন নরম করিয়া আনিয়া সময় বুঝিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। প্রদোষ সত্যনাথকে প্রণাম করিল। 'আর করিব না' খুব মৃদুস্বরে বলিল—বলিতে যেন পারে না। সত্যনাথ চুমো খাইল।

রজনীর স্ত্রী ছেলেকে ঘাট মানাবার জন্যে অজস্র প্রহার করিয়া তাহা পারেন নাই।

অনাথবন্ধু বলিলেন "এইবারে দুই ভাইয়ে আমার জন্যে ধরাধরি করে চেয়ারখানা বারাণ্ডায় লইয়া যাও।

দুই ভাইয়ে আনন্দে ঐ কার্য্য করিতে গেল।

অনাথবন্ধু স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া ও ভ্রাতৃবধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "ছেলেয় ছেলেয় সকল বাড়ীতেই সময়ে সময়ে ঝগড়া হয়, কিন্তু তাহাতে

উপযুক্ত ব্যবহার না করিতে পারিলে চিরকালের জন্য ক্ষতি হয়। আমার ইচ্ছা করে যে তোমরা দুজনেই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর যে ছেলেদের মারিবে না। কোন দোষ করিতে দেখিলে তখন বারণ করিও। উপস্থিত কিছু না করিলে যখন নয় তখন হাত ধরিয়া বন্ধ করিও। কিন্তু মারপীট আবশ্যকমত আমিই দুজনকে করিব।"

একটু পরে অনাথবন্ধু আরও বলিলেন, "প্রদোষ তার বাপের ধরণ অনেকটা পেয়েছে। রজনীকে মার্‌লে ধম্‌কালে বেঁকে যেত। সহজে ঘাড় নোয়াইত না—কিন্তু বুঝাইয়া বলিলে;মিষ্ট কথায় দোষ দেখাইয়া দিলে একেবারে গলিয়া যেত। "ছি" বলিলে সে যত কাঁদিত, দশটা চড়ে তত কাঁদিত না। সব ছেলে এক রকমের হয় না। মেয়েমানুষে অত বুঝে চল্‌তে পারে না। আজকের মারে প্রদোষের মনে সকলেরই উপরই রাগ হইয়াছিল। বিশেষ সত্যনাথের উপর আর নিজের মায়ের উপর। দুই ভাইয়ের মধ্যে ও রকম মনটা ক্ষণমাত্রের জন্য হওয়াও ভাল নয়। ছেলেই ডাগর হইয়া মানুষ হয়। ছেলে বেলার ভাব কিছুতে যায় না। আমার মনে হয় অত লাগ্‌বে—কি নিশ্চয়ই লাগ্‌বে—এমন মনে করে হয়ত ঝিনুক ছোঁড়ে নাই। মার্বেল চাইলে, পেলে না। দাদা পালায়—নিজে তত দৌড়ে ধরিতে পারে না। হাতের ঝিনুকটা ছুঁড়িয়া দিল। দুই ভাইয়ে বেশ ভাব আছে। একের জন্য অপরকে বেশী মারপীট করিলে মন চটে যাবে।"

রজনীর স্ত্রী ভাশুরের সমস্ত কথাই সঙ্গত বলিয়া বুঝিলেন এবং ভাশুর ও যায়ের প্রতি যে একটু 'পর'-ভাবের উদয়ে ছেলেকে অধিক মারিতে সুরু করিয়াছিলেন, এমন ভাশুরের সম্বন্ধে সেরূপ উচিত হয় নাই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন।

অনাথবন্ধু বলিলেন "তোমরা দুজনেই আর ছেলের শাসন নিজে করিবে না স্বীকার করিলে?"

কিরণশশী দ্বারের নিকটে এবং মহামায়া সাম্‌নে গিয়া বসিয়াছিলেন।

মহামায়া বলিলেন "তুমি ছেলেদের দেখিবে। আমরা মারপীট কিছুই করিব না। তবে বিশেষ অন্যায় দেখিলে তোমাকে জানাইব।"

কিরণশশী মহামায়াকে খুব মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি আর কখন মারিব না স্বীকার করিতেছি।"

অনাথবন্ধু বলিলেন "দেখ দেখ, দুই ভাইয়ে সব কখানা চেয়ারই বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে! ওদের আবার ঝগড়া, তাহার আবার বাড়াবাড়ি। এমন দেখিবার জিনিশ কি পৃথিবীতে আর কিছু আছে?"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতেই অনাথবন্ধুর মনে পড়িল যে আজ মা বাপ ভাই জীবিত থাকিলে তাঁহাদের এই দৃশ্যে কত সুখ হইত! অনাথবন্ধুর স্বর ভারী হইয়া গেল।

কিরণশশী ও মহামায়া স্মিতমুখেও অশ্রুসিক্ত নয়নে

পুত্রদের কার্য্য তৎপরতা দেখিতে লাগিলেন। দুজনেরই মনে হইল 'এমন স্নেহ সম্পন্ন ও সদ্বিবেচক কর্ত্তার হাতে না পড়িলে কি ছেলে মানুষ হয়!'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবার পালন।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতা।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ—

অনাথবন্ধু বিশেষ করিয়াই স্ত্রীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যেন বিধবা ভ্রাতৃবধুর আহার সম্বন্ধে খুব যত্ন করা হয়। প্রত্যহ বাজার হইতে যাহাতে কিছু ফল ফুলারি আনা হয় ইহা স্থির রাখিবার জন্য নিজে সন্ধ্যার পর প্রত্যহ ঐরূপ কিছু জলখাবার খাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ে "মেজ বৌমার জন্য রাখা হইয়াছে ত" বলিয়া মহামায়াকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন।

মহামায়ার নিজেরই যত্ন ছিল। সে কিরণশশীকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিত। কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত বহুবর্ষ ধরিয়া কোন কার্য্য করিতে হইলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সতর্ক-দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হয়। বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে ফল মূল প্রচুর পাওয়া যায় না। চাকর দাসীরা ভুলিয়া গেলে "পাওয়া যায় না" বলে। "এত দাম দিয়ে আমার জন্যে এসব আনান কেন ?"—হিন্দু বিধবা এরূপ ভাবিয়াও সঙ্কুচিতা হয়েন। এই সকল ভাবিয়াই অনাথবন্ধু নিজের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

তিনি মহামায়াকে বলিতেন “আমারই ত আগে যাইবার কথা। মনে করে দেখ যে যদি আমি যাইতাম ও রজনী থাকিত তবে তোমার ও সত্যনাথের যত্ন সে কতটা করিত! তুমি বড় ভাজ তোমার সুবিধা সে নিজে অনেকটা দেখিত। এখন আমার চক্ষু তুমি।”

কিরণশশীর সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। অল্প বয়স্কা হইলেও তিনি প্রথম দিন হইতেই বৈধব্য ব্রতের স্নানাহার সুচিতা সম্বন্ধে সকল নিয়মই দৃঢ় রূপে প্রতিপালন করিতে ছিলেন। রাত্রে একটু গুড় বা কথন বাতাসা ও জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতে রাজি হন না। দিনে বোক্‌নোয় হবিষ্যি করেন।

মাতার সহিত তাঁহার এজন্য একটু কথান্তরও হইয়াছিল। মাতা বলেন “এত করিতে হয় না।” কিরণশশীর মনে হইয়াছিল “এ অবস্থায় কত ত্যাগ করা উচিত তার শেষ নাই বলেই সেকালের স্ত্রীলোকে পুড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিত।” মাতাকে সে কথা বলেন নাই। কেবল বলিয়াছিলেন, “কিছুই মুখে দিতে ইচ্ছা হয় না—অন্যরূপ আহার করাইও না, আমি নিজের মনে কষ্ট পাব, বমি হইয়া যাইবে।”

রজনী কোন সময়ে কথায় কথায় তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন “দেখ, মেয়ে মানুষে কি এখন বেশী পেটুক হইয়াছে? ব্রত করিবার উপলক্ষে বুঝি বেশী করিয়া খায়! তা নইলে একটা যে চলিত গল্প আছে ‘প্রভাতে ননী ভাতে —এই বত্তের এই কথা, নাও ঠাকুর বেল পাতা’ ইত্যাদি

সে কথা উঠ্‌লো কোথা থেকে? এখনকার কালের ভদ্রবংশীয়া বিধবারা এমন কি ব্রাহ্মণের মেয়েরাও নাকি আর গহনা ছাড়িতে বা নির্জ্জলা একাদশী করিতে ইচ্ছা করে না।”

রজনী বলিতেন “এখনকার কালে মহারাণী শরৎ-সুন্দরীই ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের আদর্শ। চুল ফেলে দিয়েছিলেন, কম্বলে শুইতেন—ব্রত আচরণেই দিন যাইত। দেশের লোক ত এত মন্দ—অল্প-বয়স্কা বিধবার কুৎসা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ, কিন্তু শরৎসুন্দরীর নামে অতি বড় পাষণ্ডও ইঙ্গিতে দোষ দিতে কখনই পারে নাই। তাহলে যে জিভ খসে যাবে! ধর্ম্মত আছেন।”

পরলোকগত স্বামীর সকল কথাই এইরূপে কিরণশশীর সর্ব্বদা মনে পড়ে। স্বামীর প্রেতাত্মা যে তাঁহার শাশুড়ীকে দেখিতে আসিয়াছিল সে বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁহাকেও বড় ভাল বাসিতেন, তাঁহাকেও দেখিতেছেন—কিন্তু নিজের দেখিতে পাইবার ক্ষমতা নাই—শাশুড়ী পুণ্যাত্মা বলিয়াই মরণ কালে দেখিতে পাইয়াছিলেন—মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে। স্বামীর চক্ষু যেন তাঁহার সকল কার্য্যের উপরে রহিয়াছে মনে হয়। সে দিন ছেলে ঠেঙ্গাইবার সময়ে স্বামীকে ভাবেন নাই। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁহার কার্য্য ও মন দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন এবং যে কোন বিষয়েই হউক ভাশুরের কথা ঠিক ঠিক না শুনিলে আরও বিরক্ত হইবেন, এই ভাব কিরণশশীর মনে ক্রমাগত উদয় হইতেছে।

দুই মাসের মধ্যেই সিয়ালদহে অনাথবন্ধুর সাবেক মত পসার হইয়াছিল। তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে বাড়ীর তিন বৌকে ছেলেদের কাপড় চোপড় ও নিজেদের ব্রত আচরণের জন্য কয়েকটি করিয়া টাকা মাসে দিবেন। কাশীতে টাকা পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাসাতেও দিতে লাগিলেন।

কিরণশশী কোন বিষয়েই ভাশুরের বা যায়ের ত্রুটি দেখিতে পান না, এবং এখন মতি গতির এত পরিবর্ত্তন হইতেছিল যে অল্প দিনের মধ্যেই উহাঁদের কোন ত্রুটি দেখিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস একেবারেই পুঁছিয়া গেল।

কিরণশশীর মনের ভাব কিরূপ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইতেছিল তাহা একটি ঘটনায় প্রকাশ হইবে।

সিয়ালদহের বাসায় প্রথমে আসার দশ দিন পরে কিরণশশীর বাপের বাড়ী যাইবার কথা ছিল। তখন অনাথবন্ধু পাঠাইয়া দিয়া সাত দিন পরেই আবার ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে প্রদোষ কাছে না থাকিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। কিরণশশীও তাহার মাতাকে বলিয়াছিলেন 'আমার ভাশুর এখন সত্যনাথ ও প্রদোষকে লইয়া সন্ধ্যার পর খেলা করিতে বড় ভাল বাসেন। বড়ই শোক পেয়েছেন—ওদের দুজনের খেলা যতক্ষণ দেখেন ততক্ষণ যেন মুখে একটু প্রফুল্লতা আসে। এখানে আসবার সময় আমাকে উদ্দেশ করে জিদ করে বলে দিয়েছেন "মেজ বৌমা ত দেখ্ছেন যে দিনরাত্রের

মধ্যে আমার ঐ টুকু সুখের সময়। শীঘ্রই প্রদোষকে ফিরে এনে দিতে হবে।”

এখন কিরণশশীর আর পিত্রালয়ে অধিক দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল না।

কিরণশশীর মাতা তাঁহাকে টাকার সম্বন্ধে বলিলেন “তোর টাকা শীঘ্রই দেওয়া হবে। কর্ত্তা বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিতে চান। তার দরকার কি? দুদিনের জন্য কি আসে যায়।”

কিরণশশী এ বারে বাপের বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিলেন যে মধ্যম ভগিনীপতি আর সেখানে থাকেন না। শুনিলেন যে তিনি শ্যামবাজারে বাসা করিয়া নিজের স্ত্রীকে তথায় লইয়া গিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত কিরণশশী গহনা চুরির কোন কথা শ্বশুর বাড়ীর কাহাকেও বলেন নাই। টাকাটা দিতে দেরী হইবার আভাস মাতার মুখে পাইয়া মনে ঐ কথার একটু তোলাপাড়া হইল। এবারে ভাশুরের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া এক দিনের মধ্যেই মহামায়ার নিকট ঐ গহনা চুরির গল্প করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বলিলেন “বড় ঠাকুরের শুনে কাজ নাই। তোমার কাছে আর আমি কিছুই লুকাইতে পারি না। দিদি! সুখের দুঃখের সব কথাই এখন তোমার সঙ্গে। তুমি যে আমায় এত ভালবাস তাহা এক সময়ে বুঝিতাম না।”

কিরণশশীর মুখে এমন কথা শুনিয়া মহামায়ার মনে

হইল "কি মানুষ কি ভাল হইয়াছে!" কিন্তু কিসের জন্য হইয়াছে মনে পড়িয়া রজনীর জন্য চক্ষুতে জল আসিল।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিয়া অপরের সুখ সাচ্ছন্দ্য জন্য রজনী কত চেষ্টা সর্ব্বদাই করিত, সকলের প্রতিই কত ভাল বাসা কত যত্ন ছিল, মহামায়া তাহার একটু আলোচনা করিলেন। দুজনে বসিয়া কাঁদিলেন।

তাহার পর মহামায়া বলিলেন "আমার বোধ হয় ওঁকে কোম্পানির কাগজ খানার কথা বলা ভাল।"

কিরণশশী। "কাগজ খানা দেওয়াতে রাগ কর্‌বেন। বলে কাজ নাই।"

মহামায়া। "না, তোমার উপর রাগ কর্‌বেন না। যাতে ভাল হয় তাই বল্‌বেন। ও অবস্থায় সবাইকেই ঐরূপ করিতে হইত।"

কিরণশশী। "যাহা ভাল বোঝ দিদি তাই কোরো।"

সে দিন অনাথবন্ধুকে বলা হইল। তিনি পরদিন প্রত্যুষে রজনীর শ্বশুরের সহিত দেখা করিয়া প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্নের পর বলিলেন "আমি শুনিয়াছি কোন ঘটনায় তাড়াতাড়ি টাকার দরকার হওয়ায় মেজবৌমা তাঁর এক খানা কোম্পানির কাগজ সহি করিয়া আপনাকে দিয়াছেন।"

রজনীর শ্বশুর একটু লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিলে অনাথবন্ধু বলিলেন "আপনার যদি মত হয় তবে মেয়ে

ছেলের টাকা কড়ির হিসাবটা আজই মিটাইয়া ফেলা যায়।”

রজনীর শ্বশুর একটু বিরক্ত হইয়া অনাথবন্ধুর মুখের দিকে চাহিলেন। ‘আজ মিটাইবার টাকা কোথায়? তা হলে কি দিতাম না’—এই কথা মনে হইল।

অনাথবন্ধু বলিতে লাগিলেন “আমি আমার একখানা পাঁচ শত টাকার কাগজ আনিয়াছি। এইটা আমি আপনাকে লিখিয়া দি, আর আপনি উহা মেজবৌমাকে লিখিয়া দিন। এখন পাঁচ শতের কাগজের দাম ৫২৫৲ টাকা। ঐ ৫২৫৲ টাকার জন্য আমাকে আপনি একখানা শতকরা মাসিক চারি আনা সুদের হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিন। মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে টাকা কড়ির গোলযোগ কাটিয়া যাওয়াই কি ভাল নয়?”

অনাথবন্ধু কাগজ খানা রজনীর শ্বশুরের নামে লিখিয়া তাহার নীচে নিজের সহি করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার নীচে কিরণশশীর নাম লিখিয়া দিয়া পেনসিলে রজনীর শ্বশুরের নামের প্রথম অক্ষরটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। হ্যাণ্ডনোটও লিখিয়া রসিদ ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া ঠিক করিয়া আনিয়াছিলেন। দুখানাই সামনে ধরিলে রজনীর শ্বশুর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কোম্পানির কাগজে এবং হ্যাণ্ডনোটে নাম সহি করিয়া দিলেন।

তখন অনাথবন্ধু পকেট হইতে আর একখানি কাগজ বাহির করিয়া রজনীর শ্বশুরকে দিলেন। এখানায় ভ্রাতৃ-

বধূর জন্য অমুক নম্বরের কোম্পানির কাগজ পাইলেন এই কথা লিখিত রসিদ।

অনাথবন্ধু বলিলেন, "গতকল্য এই সকল কথা শুনিয়াই ভাবিলাম এ বিষয়টা এইরূপে নিষ্পত্তি করাই ভাল। আপনার অমত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া একেবারে লিখিয়া আনিয়াছিলাম।"

রজনীর শ্বশুর বলিলেন "টাকাটা শীঘ্রই দিব চিন্তা নাই। এ যাহা করিলে এও মন্দ নয়—তবে প্রয়োজন ছিল না।"

শেষের এই "প্রয়োজন ছিল না" কথাটা ঈষৎ বিরক্তির সুরে। অনাথবন্ধু বুঝিয়াও বুঝিলেন না।

বলিলেন "আমার কার্য্য যখন আপনি অসঙ্গত মনে করেন নাই, আমি তাহাতেই কৃতার্থ হইলাম।"

প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া চলিয়া আসিলেন।

কিরণশশীর গহনা চুরি এবং কোম্পানির কাগজ দেওয়া প্রভৃতি সংবাদ পূর্ব্ব রাত্রে পাইয়া অনাথবন্ধুর মনে হইয়াছিল যে, রজনীর শ্বশুর চরিত্র হীন দেনায় জড়িত লোক। অনেকদিন পড়িয়া থাকিতে থাকিতে হয়ত মেয়ের টাকা ফেরত দেওয়া সম্বন্ধেও অনিচ্ছা—বা অক্ষমতা ঘটিতে পারে। আর কে কত দিন আছে তাহার ত ঠিক নাই! কিরণশশীর বাপ হঠাৎ মারা গেলে তাঁহার ভাই যে ঐ টাকা দিবে না তাহা নিঃসন্দেহ। গহনা চুরি ধরা পড়ায় ভগিনীর উপর রাগিয়াছে বই তুষ্ট হয় নাই! এদিকে এক টুকুরা রসিদ পর্য্যন্ত নাই।

'এখন কি করা যায়' ভাবিতে গিয়াই প্রথমে মনে হইল যে, কিরণশশীর নাম বরাবর তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া আনিবেন। আরও একটু চিন্তা করিলে বোধ হইল যে গোলমালেতে বিধবা ভ্রাতৃবধূর টাকা পড়িয়া থাকিয়া কাজ নাই। বরং নিজের টাকাই ঐরূপ থাক। নিতান্তই টাকা আদায়ের অসুবিধা হইলে বাপের নামে মেয়েকে দিয়ে নালিশ করান, কি ওরূপ নালিশের কথার আলোচনা প্রভৃতি নানা উৎপাতের মূল রাখিয়া কাজ নাই।

অনাথবন্ধু বাসায় আসিয়া কোম্পানির কাগজখানি স্ত্রীর হাতে দিয়া ভ্রাতৃবধূর নিকট পাঠাইলেন। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন "সেদিন কাগজ দেওয়ায় আমি অসন্তুষ্ট হই নাই—অন্য উপায় ছিল না কি করিবেন? তবে আমাকে প্রথমে খবর দিলে আমি অনুসন্ধানাদি করিতেই বারণ করিতাম। বাড়ীতে পুলিসের হাঙ্গামা পারগ পক্ষে কখন কি আনিতে আছে?"

কিরণশশীর পিতা যে তাঁহাকে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছেন—সেকথা অথবা কাগজ খানি আদায় সম্বন্ধে অন্য কোন কথা—অনাথবন্ধু মহামায়াকে পর্য্যন্ত বলিলেন না।

কিরণশশী দেখিলেন যে, মাতা তাঁহার যে ভাশুরের নিন্দা করিতেন, তিনিই তাঁহার টাকা তাঁহার মাতা পিতার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিলেন!

অন্য এক সময়ে অনাথবন্ধু মহামায়াকে বলিলেন

"আমার ইচ্ছা করে মেজবৌমার যে গহনা আছে তার মধ্যে কতক বিক্রয় করিয়া উহাকে পাঁচশত টাকার আর এক খানা কাগজ করিয়া দিই। প্রদোষের বৌ আসিয়া পরিবে বলিয়া কেবল খুব ভাল দুচার খানা রাখিয়া দিলেই হয়।"

মহামায়া একটু বিস্মিতা হইলেন। সে দিন ভাই গিয়াছে এ অবস্থায় এরূপ কথা স্বামীর মনে কেন হইল?

অনাথবন্ধু বুঝিতে পারিলেন এবং ছলছল নেত্রে বলিলেন, "যে থাকে তার ভাবনার ছিদ্রের নাই। যে যায় সেই জুড়োয়।—একথা কেন মনে হইল বলি। মেজ বৌমার বাপ কি ভাই আবার একটা যদি গুরুতর হাঙ্গামা বাধাইয়া আসেন, আবার হয়ত তাঁহাদের একখানা পাঁচশত টাকার কাগজ দিয়া ফেলিতে হইবে, কি কিছু গহনা দিয়া ফেলিবেন। নিজের থাকিতে বাপ ভাইয়ের উদ্ধারের জন্য না দিয়া থাকিতে পারা কঠিন।—

"কিন্তু যদি ওঁর ছোট ছোট কাগজগুলি ও খুজরা গহনা বিক্রয়ের টাকা একত্রে করে বাঁধিয়ে রাখান যায়, তবে আর এত সহজে দিবার সুবিধা থাকিবে না। যারা কু পথে গেছে তাদের খরচ যুগিয়ে উঠা কুবেরেরও অসাধ্য —কোন সময়ে একবার বলিতেই হইবে যে 'না, আমাহতে আর টাকা যোগান ঘটিবে না।' সে স্থলে ওঁর নিজের নামের টাকাটা বা কিছু গহনা গিয়ে তারপর খামার চেয়ে আগে থাকৃতে একটা বন্দোবস্ত করে রাখা ভাল।

টাকা ও গহনাগুলি ত প্রদোষের প্রাপ্য, আমাদের বাড়ীরই জিনিস। তাহার রক্ষা করা দরকার।”

মহামায়া বলিলেন, “তুমি যখন যা বল প্রথমে না বুঝে একবার কথন যদি ভাল বোধ না হয়, কিন্তু পরে বুঝিতে পারি যে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ওকে বলিব কিরূপে?”

অনাথবন্ধু। “স্পষ্ট বলিও না। সোনার দর বেড়েছে এই সময়ে যাহারা গহনা বেচিতেছে তাহার বেশী পাইতেছে এরূপ বলিয়া দেখিবে?”

মহামায়া বলিলেন, “তাহা হইলেও হইবে না। মেয়ে মানুষে এ সব কথা বেশ বুঝিতে পারে। আমার একখানা গহনা বেচিবার উপলক্ষে সোনার দরের কথা বলিব। বাজু খানা বেচিলেই হইবে।”

অনাথবন্ধু বলিলেন “মেয়ে মানুষদের গহনা ভাঙ্গাগড়া বেচাকেনা কিছুতেই অতৃপ্তি নাই, কিন্তু এখন বাজু কি অন্য গহনা গড়ান হবে না।”

মহামায়া দুঃখিতা হইয়া বলিলেন “এখন কি আমাদের গহনা গড়াইবার সময়! না আমি কখন তোমাকে গহনার জন্য বলিয়াছি? আমাদের এমন হোয়ে আর আমার গহনার দরকার নাই। ওর এই বয়সে ওই বেশ, আর আমি বেশী সাজসজ্জা করিব? আমি নোয়া আর বালা ছাড়া কোন গহনাই আর গায়ে রাখি কি? আমার যা আছে তাত আর কখন সবগুলো পরিতে পারিব না!”

অনাথবন্ধু এতদিন লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। পূর্ব্বে বালা ও নোয়া ছাড়া মহামায়ার সর্ব্বদাই গোট, অনন্ত এবং হার পরা থাকিত—এখন আর তাহা নাই। স্ত্রীর মনটি যেমন চাহেন তেমনি স্বচ্ছ সহানুভূতি সম্পন্ন ও খুব ভাল দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। বলিলেন "তুমি বুঝে চল্‌তে পার্‌বে।"

মহামায়া বলিলেন "বাজু আর পোর্‌ব না, সোনার দর বেশী হয়েছে এখন ওটা বেচিব, এইরূপে কথা তুলিলে ওরও সেইরূপ গহনা বেচার কথা মনে হইতে পারে।"

কয়েকদিনের মধ্যে কিরণশশীরই বিশেষ ইচ্ছায় কতক গহনা বিক্রয় হইল। বাছিয়া বাছিয়া কয়েক খানি মাত্র তুলিয়া রাখা হইল। তিন হাজার টাকার কাগজ এক খণ্ডে বাঁধাইয়া কিরণশশীর নামেই রাখা হইল।

মহামায়া এবং কিরণশশী দুইজনেই রন্ধন করেন। কিরণশশী ক্রমশঃই রন্ধন কার্য্যে বিশেষ পটু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ছেলেদের স্নান করাইয়া দিতে, খাওয়া পরা দেখিতে, খুব যত্ন করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের দেহপাত করিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। এখন মহামায়ার চেষ্টায় ক্রমেই সংসারে মন বসিতে লাগিল। দুজনে অবসর কালে একত্রেই বসেন। সকল বিষয়ে মন খুলিয়া পরামর্শ করেন।

কিরণশশীর এখন ব্রত আচরণ দ্বারা, এবং স্বামীর প্রিয় হইবে বলিয়া ভাশুর ও যায়ের তৃপ্তি সাধন দ্বারা, পরলোকে সেই অসামান্য স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা।

তাঁহার এখন মনে হয়—"প্রদোষ বাঁচিয়া থাকিবে। বড় হইবে। 'তাঁহার' মত কার্য্যক্ষম ও যশস্বী হইবে। প্রদোষের বিবাহ দিয়া, উহার একটি ছেলে দেখিয়া যাইব। আর যদি তাহার আগেই যাইতে পাই—ভগবান্ কি এত দয়া করিবেন? তাহা হইলে প্রদোষের জ্যাঠা ও জেঠাই তাহাকে দেখিবেন।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থ প্রণয়ন।

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণাং উপদেশ সমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্ত কথা যুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

রজনী ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারী কাগজে যে সকল ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা একত্র করিয়া অনাথবন্ধু ঐ বৎসরেই প্রচার করিলেন।

রজনী উদরাময় রোগ সম্বন্ধে যে পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত টোকা টুকি কাগজ পত্র হইতে সম্পূর্ণ করা যায় কি না বুঝিবার জন্য, অনাথবন্ধু সেই কাগজগুলি কয়েকজন কৃতবিদ্য ডাক্তারকে দেখাইলেন। কাহারও ঐরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলেন না।

একজন খুব উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষিত বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার ইংরাজী কাগজে ও কখন কখন একখানি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেন দেখিয়া অনাথবন্ধু তাঁহার সহিত রজনীর পুস্তক সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিলেন।

ডাক্তারটী বলিলেন 'কাগজ পত্র রাখিয়া যান আমি অবকাশমত পুস্তকখানি শেষ করিয়া দিব।' কিন্তু

কয়েকমাস পরে একদিন ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা উত্থাপন করিয়া অনাথবন্ধুর বোধ হইল যে ডাক্তার বাবু পুস্তক সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই।

তখন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পুস্তকখানি প্রকাশে কৃত-সংকল্প হইয়া অনাথবন্ধু কাগজগুলি ফিরাইয়া আনিলেন। সে জন্যও কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছিল। হারাইয়া গিয়াছে বলিয়াই একবার সন্দেহ হইল! যাহা হউক, কাগজগুলি ফিরিয়া পাইলে অনাথবন্ধু দেখিলেন যেরূপ বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন সেই রূপই আছে। বেশীর মধ্যে—কতক ঝাড়িয়া দেওয়া হইলেও—অনেক ধূলা! পাঁচ মাসে একবার খুলিয়া দেখাও হয় নাই!

কাগজ ফিরাইয়া দিবার সময় ডাক্তার বাবু বলিলেন, "যে কাজের ভিড়! সময় পাই না। আর গোড়াটা সুরু যেন কেমন কেমন হইয়াছে। অনেক স্থলই ফিরে লিখিতে হইবে।"

অনাথবন্ধুর মনে হইল পরিশ্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া না পড়িয়াই নিন্দা কেন? কিন্তু ভাল মন্দ কিছু বলিলেন না। 'বইখানি যদি সম্পূর্ণ হইবার হইত তবে আমার অমন ভাই যাবে কেন?' এই কথাই মনে হইল।

যাহা হউক অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইল। এদেশে উহার কিছু মাত্রই আদর হইল না।

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কিন্তু পসার হীন একটি নবীন ডাক্তারকে ফুরাইয়া দিয়া ও নিজে সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া অনাথবন্ধু পুস্তক খানির ইংরাজী তরজমা করাইলেন ও সদাশয় আমেরিকান কন্সলের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে অনুবাদটি আমেরিকায় প্রকাশিত করাইলেন।

আমেরিকায় ও জর্ম্মনিতে পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা হইল এবং রজনীর পরীক্ষিত কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত গাছড়া ঐ দুই দেশে ঔষধরূপে গৃহীত হওয়ায় তাহার দু একটি ক্রমে দশ বার বৎসর পরে ইংলণ্ডেও আদৃত হইয়াছিল। ঐগুলি আবার কয়েক বৎসর পরে নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ বলিয়া এদেশে আসিয়াছিল।

এদেশের দার্শনিক মতবাদের এক অংশ জর্ম্মনি এবং আমেরিকায় আদৃত হইলে তবে উহা একটু বিকৃত ভাবে থিয়সফিরূপে এদেশে আসিয়াছে দেখিয়াই অনাথবন্ধু রজনীর আয়ুর্ব্বেদসম্মত পরীক্ষিত ঔষধগুলি সম্বন্ধে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনাথবন্ধু অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে মটলিকৃত ওলন্দাজ সাধারণ তন্ত্রের এবং ব্যানক্রফ্ট কৃত মার্কিন সাধারণ তন্ত্রের ইতিহাস দুই খানি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবেন।

কিরূপ কঠোর ও ঐকান্তিক সাধনায় জাতীয় একতা ও উন্নতি সম্পাদিত হয় এবং কতটা অত্যাচার হইলে তবে

'সকলের' অত্যাচার বলিয়া মনে হয়, ঐ দুখানি পুস্তকে তাহা অতি সুন্দররূপে দেখান আছে।

অনেক যত্নে অনাথবন্ধু মার্কিন ইতিহাসখানির অনুবাদ শেষ করিয়া ছাপাইলেন। অনুবাদের মধ্যে মধ্যে অনাথবন্ধু মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে ধর্ম্মসূত্রের গতি দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহা না করিতে পারিলে কোন আর্য্য লেখকেরই তৃপ্তি হয় না।

ধর্ম্মোন্মত্ত দৃঢ়ব্রত পিউরিটানদিগের কঠোর তপস্যারই ফল যে আজ তাঁহাদের বংশধরেরা পাইতেছেন—স্বজাতি-বৎসল আত্মগৌরব সম্পন্ন ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের নৈতিকবলেই যে তাঁহারা ফরাশি, জর্ম্মন, ইটালিয়ান প্রভৃতিদিগের বংশধরগণকে মার্কিন রাজ্যে ইংরাজী ভাষা ধরাইতেছেন—নিজেরা স্বজাতীয় ভাষা এবং স্বজাতীয় আচার অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, অনাথবন্ধু তাহা দেখাইয়া ভারত সন্তানকেও তাঁহার আভিজাত্য স্মরণ করাইয়া অপরের নীচভাবে অনুকরণ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; এবং স্বজাতীয় শিল্পের রক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজ বংশধর মার্কিন যে একান্তই অনুকরণীয় তাহা দেখাইয়াছিলেন।

বইখানি ছাপাইতে অনেক টাকা খরচ হইল। বিক্রয় একখানিও হইল না। যে কয়েকখানি সংবাদপত্র সম্পাদক ও বন্ধু বান্ধবদিগকে উপহার স্বরূপ দিলেন তদ্ভিন্ন সমস্তই বিক্রয়ার্থ পুস্তকালয়ে জমা রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় ইতিহাস পুস্তকখানি লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু

সাময়িক পত্রে অল্পে অল্পে প্রকাশ করিবেন বলিয়াই স্থির করিলেন। একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইতে পারিবেন বলিয়া আর সাহস হইল না।

এই সময়ে অনাথবন্ধু একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া একজন প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতার পরামর্শ অনুসারে খুব মোটা কাগজে ছাপাইয়া এবং লাল কাপড়, স্বর্ণাক্ষর এবং পাতের ধারে সোণালী দিয়া বাঁধাইয়া প্রচার করিলেন। একশত পৃষ্ঠা পুস্তকের দাম ২।৷৹ হইল।

তিনি পূর্ব্বে যে থবরের কাগজে অল্প অল্প মূল্য পাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন এবং এখন যাহাতে বিনামূল্যে মধ্যে মধ্যে দু একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখায় তাঁহার বিশেষ আদর ছিল, সেই সহস্র সহস্র লোকের আদৃত সংবাদপত্রে তাঁহার উপন্যাসের যে অতিশয়োক্তি পূর্ণ সুখ্যাতি বাহির হইল, তাহা নিজের ঘরে বসিয়া একাকী পড়িয়াও অনাথবন্ধু যেন লজ্জায় অনেকক্ষণ মুখ তুলিতে পারিলেন না।

পর সপ্তাহের মধ্যেই পুস্তক বিক্রেতা সংবাদ দিলেন 'আর পাঁচ হাজার বহি শীঘ্র ছাপাইয়া ফেলা যাউক, রোজ সত্তর আশি কাপি মফস্বলের জন্য পাইকরেরা লইতেছে।'

উপন্যাস খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু যেরূপ প্রশংসা হইল ও যেরূপ বিক্রয় হইল তত ভাল নয়। আর ইতিহাস খানি যাহা অনেক অধিক পরিশ্রমের এবং অনেক পাণ্ডিত্যের ফল—যাহা বাঙ্গালা ভাষার একটি

বিশেষ আদরের জিনিস হইবার কথা—তাহার বিক্রয় হইল না!

উপন্যাস খানির লাভ হইতে কিছুকাল পরে দুখানি পুস্তকের খরচাই উঠিয়া গেলে অনাথবন্ধুর পুস্তক বিক্রেতা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞাপন দিলেন যে সাধারণ পুস্তকালয় এবং স্কুলের জন্য ১০৲ টাকা মূল্যের ইতিহাস খানি ২৲ মূল্যে দিবেন। এই সময়ে খান কতক মার্কিন ইতিহাস বিক্রয় হইল।

এদেশে বেদ প্রচারককেও এক সময়ে নাটক লিখিয়া বেদ মুদ্রণের খরচা তুলিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল!

-*-*-*-

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুশিক্ষার ফল।

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

রজনীর শ্বশুর বসত বাড়ী বিক্রয় করিয়া সমস্ত ধার শোধ করিলেন। মধ্যম জামাতা বাড়ী রহিলেন না। ভাল খরিদার জোটায় অধিক মূল্য হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত অর্থে কিরণশশীর পিতা আর একখানি বাড়ী কিনিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকে বলিল "মদ ছাড়িয়া দেওয়াতেই লোকটা মারা গেল।" প্রাচীন কেহ কেহ বলিলেন "ছেলের দৌরাত্ম্যে মনোভগ্ন হইয়া মৃত্যু হইল।" শেষটায় যে চরিত্র শোধরাইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করিত।

যাহা হউক, পুত্র অনেকগুলি নগদ টাকা একেবারে হাতে পাইয়া খুব আমোদ প্রমোদ আরম্ভ করিয়া দিল।

নেশার সময় একদিন স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল "খুব সুন্দরী ত!" ইহার পর কিছু দিন স্ত্রীর খুবই আদর হইল। যাহার দিকে ফিরিয়া চাহিত না তাহাকে এই সময়ে অনেক গহনা কাপড় কিনিয়া দিল। কিন্তু মাতার প্রতি বড়ই অযত্ন করিতে লাগিল।

বৌও হঠাৎ অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনে গর্ব্বিতা হইয়া শাশুড়ীকে বাক্য যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন।

কিরণশশীর মাতা পূর্ব্বে পূর্ব্বে সংসার খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু সরাইয়া নিজের হাতে জমা করিয়াছিলেন। ছেলের উপর মায়া বশতঃ তাহার মিনতিতে লুকাইয়া লুকাইয়া সেই টাকা হইতে কিছু কিছু তাহাকে দিতেন। নিজেই এইরূপে ছেলের কুচরিত্র বদ্ধমূল হইবার সাহায্য করিয়াছিলেন!

কেহ ছেলের কোন নিন্দা করিলে রাগ করিতেন। বলিতেন "আমার কচি ছেলে কোন দোষে দুষী নয়, হিংসের ম'রে লোকে নিন্দা করে।"

ছেলের বিশ্বাস যে মার কাছে এখনও টাকা আছে। আর সে টাকা এখনি তাহার প্রাপ্য। কিন্তু মাতা ক্রমশঃ ছেলেকেই সমস্ত দিয়াছেন।

ক্রমে ছেলের এবং বৌয়ের ব্যবহারে বিধবার বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাঁহার সংসারে অসীম মায়া, কিন্তু তাঁহারও বাড়ীতে তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল।

কিরণশশী কখন কখন এক একবার দিনের বেলা গিয়া মাতাকে দেখিয়া আসেন। রাত্রেশ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়। 'মেজ খুড়ীমার' এবং প্রদোষের কাছে না শুইলে সত্যনাথের ঘুম হয় না!

কিরণশশী একবার মাতার অবস্থা যেরূপ দেখিয়া শুনিয়া আসিলেন তাহাতে বড়ই কষ্ট বোধ হইল।

মহামায়াকে মায়ের কষ্টের কথা জানাইয়া বলিলেন, "পেটের ছেলেতে যখন এমন কর্‌তে পারে তখন ছেলের উপরই ভরসা কি ?"

মহামায়া বলিলেন, "ছেলে বেলায় বড় আস্কারা দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।—তবে কার অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে ? গুরু লোকের দোষ ধর্‌তে গিয়ে শেষে আমাদের দশাই বা কি হয় !"

অনাথবন্ধু তাঁহার আঁবুইমার অবস্থা শুনিয়া বলিলেন "মেজ বৌমা খরচের জন্ম যাহা পান তাহার ভিতর থেকে আঁবুইমাকে কেন মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিন না, তিনি কাশী চলিয়া যান। অনেক ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরা একত্রে একটা বাসায় থাকিয়া কাশীতে বাস করেন। সংসার তাঁহাদের সঙ্গে বাসা জোটাইয়া দিতে পারিবে। সর্ব্বদা খবর লইতেও পারিবে। অধিক খরচের আবশ্যক হয়, মেজ বৌমার মাসিক খরচের টাকা কিছু বাড়াইয়া দিতে পারি। উনি আপনারি হইতেই মাতাকে দিবেন। আমি সন্তানের তুল্য, আমার দেওয়া নিতে পারেন, তবু সে কথায় কাজ কি ?"

কিরণশশী বিশেষ তুষ্ট হইলেন এবং মাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন "তুমি কাশী যাও আমি নিজের থেকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

পুত্র যখন শুনিল মাতা কাশী যাইতে চাহিয়াছেন, তখনি মাতার বাক্স পেটারার একবার ভাল করিয়া তালাসি লইয়া

দেখিল যে মাতা টাকা লইয়া যাইতেছেন কি না! দেখিল কিছু মাত্র মূল্যবান দ্রব্য নাই। তখন মুখ সাপোট করিয়া বলিল "আমিও তোমাকে মাসে ১০৲ টাকা দিব। এখন তোমার কাশী যাওয়াই ভাল।—তা কবে যাচ্ছ?"

মাতা বলিলেন, "আমি যত শীঘ্র সম্ভব যাইব।" পুত্রের ব্যবহারে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

তিনি কন্যাকে বলিয়া পাঠাইলেন "মা! তুমি আমাকে যত শীঘ্র পার কাশীতে পাঠাও, এখানে বেশীদিন থাকিতে হইলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে।"

কিরণশশীর ভয় হইল। তিনি মহামায়াকে বলিলেন, "দিদি! কি করে কার সঙ্গে মাকে শীঘ্র কাশী পাঠান যায়? এত বড় শোক পেয়েছেন তার উপর আবার অত আদরের ছেলের হাতে এই খোয়ার!"

মহামায়া আরাধ্যা ঠান্‌দিদির নিকট সংবাদ জানিতে পাঠাইলেন যে, কাহার বাড়ীর মেয়েছেলের কাশী যাইবার কথা হইতেছে কি না।

ঠান্‌দিদি সেই দিন বৈকালে আসিয়া সব শুনিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখন তেমন কেহত যাইতেছে না; তা গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে তোর ব্যাটার কল্যাণে আমাকেই পাঠানা কেন—আমিও গিয়ে কাশীবাস করি। আমার সেখানে দুটা টাকা হলেই মাস চল্‌বে। তা আর জুটবে না? কত জুটবে।"

মহামায়া সজল নেত্রে বলিলেন, "ঠান্‌দিদি সবাইকার

সকল দরকারের সময় সমান উপকারী। অন্য লোক নাই—আমাদের দরকার—তাই ওঁর তখনি কাশী যাইবার ইচ্ছা হইল!”

কিরণশশী বলিল, “ঠান্‌দিদি! মা বড়ই শোক পেয়েছেন। তোমার কাছে থাক্‌লে অনেকটা সুস্থ হবেন।”

আরাধ্যা বলিলেন “সে কথা নিশ্চয়। দিন কতক বাদে বরং কাশীতে দেখ্‌তে যাস্‌ যে আমার সঙ্গে থেকে তোর মার মনটা ঠাণ্ডা হয় কি না—সংসারে শোক শোক কেবলই শোক। যার কিছুই নাই, কখন ছিল কি না মনে নাই, তারই সব আছে—কোন দুঃখ নাই।”

একটু পরে বলিলেন, “তা আমাকেও কাঁদিতে বড় কম হয় না। সব বাড়ীতেই আমার হাসি, সব বাড়ীতেই কান্না। আমি আবার গুমোর করি আমার কষ্ট নাই। কিন্তু কখন ছেলে না বিইয়ে আমি বছরে কত বারই নাতি পুত্রের শোক পাই!”

রজনীর ফটোগ্রাফ খানির দিকে দৃষ্টি পড়ায় ঠান্‌দিদির চক্ষুতে জল আসিয়াছিল।

মহামায়া ও কিরণশশী নীরবে অশ্রুপাত করিলেন।

আরাধ্যা ঠান্‌দিদির সহিত রজনীর শাশুড়ী কাশী গেলেন। অনাথবন্ধুর নিকট হইতে এবং ঠান্‌দিদির বিশেষ যত্নের অপর তিনটি পরিবার হইতে ঠান্‌দিদির কাশীবাসের সাহায্যে আবশ্যকমত সামান্য মাসিক বরাদ্দ স্থির হইল।

স্থানের কিরূপ আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য, ও হিন্দুর বাড়ীর

মেয়েদের কি একটু সাহজিক শক্তি আছে, যে, যিনি সংসারের খুঁটিনাটি ও তুচ্ছ বিষয় ভিন্ন কিছুতে থাকিতে পারিতেন না, তিনি কয়েকদিন মধ্যেই দেব পূজা নিরত, অপরের শুশ্রূষায় উন্মুখ,—শান্তি পূর্ণ হৃদয়, হইয়া উঠিলেন!

মাতা কাশী গেলে কিরণশশীর ভ্রাতা বাড়ীতে বসিয়াই মদের ও পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

তাহার স্ত্রী মনে করিয়াছিল যে শাশুড়ী চলিয়া গেলে বাড়ীতে সর্ব্বময়কর্ত্রী হইয়া সুখ ভোগ করিবে। কিন্তু দেখিল যে স্বামীর আদর দুই চারি মাসের জন্য মাত্র হইয়াছিল।

শাশুড়ী চলিয়া যাওয়ার পর সাত আট দিনের জন্য তাঁহার শরীর অল্প একটু অসুস্থ হওয়ার পর হইতেই আবার তাঁহার যে অনাদর সেই অনাদরই আসিল। পরন্তু বাড়ীতে মা থাকিতে যে সকল অপমান পূর্ব্বে কখন সহ্য করিতে হয় নাই, সেই সকলও আরম্ভ হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

একুশ বৎসর পরে ।

তীর্থদর্শনতো যত্তু পুণ্যোদার্য্যাত্মকং ফলং ।
পরার্থ জীবনং দৃষ্ট্বা বিধবানাং লভেত তৎ ॥

একুশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। অনাথবন্ধুর এক্ষণে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স। শরীর বেশ পটু আছে। কাজকর্ম্ম পূর্ব্বমত করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যনাথ, সংস্কৃত কালেজের এমএ পাস হইয়া, এখন ৺ বারাণসীধামে সংসারের কাছে থাকিয়া বেদান্ত পড়িতেছেন।

রজনীর পুত্র প্রদোষ মেডিকেল কলেজে উৎকৃষ্ট-রূপ পাস হইয়া হোমিওপেথিমতে চিকিৎসা করিতেছেন; এবং কবিরাজী শিখিতেছেন। পিতার পুস্তক খানি যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে সে বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রদোষের স্বভাব রজনীর ন্যায়ই উদার। তেমনি পরিশ্রমী, কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি যেন একটু কম। তবে সময়ে সময়ে প্রদোষের এক একটি কথা বা এক একটি রোগ নির্ণয় ঠিক যেন রজনীর ন্যায়ই অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়।

মাতার নিকট জ্যেষ্ঠতাতের গুণ অনুদিন কীর্ত্তিত শুনিয়া এবং বাল্যাবধি সেই অকৃত্রিম স্নেহ প্রত্যহ

পাইয়া অনাথবন্ধুর প্রতি প্রদোষের ভক্তি ও ভালবাসা অতি প্রগাঢ়।

জেঠাতও খুড়তুতা ভাইয়েদের উপরেও খুব ভালবাসা। জেঠাইমার নিকট পিতার কথা অনেক শুনিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা ও যত্নে প্রদোষ একান্তই মুগ্ধ।

নলিনীর চারিটী মেয়ের পর দুই ছেলে। বড় ছেলেটি ১৩ বৎসরের। চারিটি মেয়েরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আনন্দনাথের পিতা মাতা দুজনেই আজ দশ বৎসর পরলোক গত হইয়াছেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু তাহার পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে হয়।

আনন্দনাথ ওকালতি এবং তেজারতী দ্বারা বহুল পরিমাণে সম্পত্তি বাড়াইতে পারিয়াছেন। তাঁহার এবং অনাথবন্ধুর প্রায় সর্ব্বদাই দেখা হয়। দুজনে অধিকাংশ বিষয়েই এক মত। দুজনের বাড়ীতেই বিলাতী কাপড় কেনা 'একেবারে' নিষিদ্ধ এবং পারগপক্ষে দেশীয় জিনিসেই কার্য্য সারিতে অভিলাষ।

উহাঁদের বাড়ীতে এখনও কেরসিন প্রবেশ করে নাই। রেড়ির তেলে এবং সময়ে সময়ে বাতি জ্বালাইতে হওয়ায় খরচ একটু বেশী পড়ে। কিন্তু তেমন ছেলেদের কাহাকেও চশমা লইতে হয় নাই এবং শিরঃপীড়া অজ্ঞাত প্রায়। অনাথবন্ধু নিজে এখনও রাত্রে দুইটা তিনটা সলিতা উষ্কাইয়া দিয়া প্রদীপালোকে বিনা চসমায় খবরের কাগজ পড়িতে পারেন।

——র মহারাজ "ভারত কোষ" নাম দিয়া একটি প্রকাণ্ড কোষ গ্রন্থ ছাপাইতেছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই কার্য্যে নিযুক্ত। সংসারের তত্ত্বাবধানে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সংসার সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, পরিশ্রমী, নিরহঙ্কারী, এবং এই কোষ সংকলন কার্য্যে একান্ত একাগ্রচিত্ত বলিয়া, অতি উপযুক্ত পাত্রেই মহাভার ন্যস্ত হইয়াছে সকলেই বলিতেছেন।

সংসারের একটি মাত্র পুত্র হইবার পরই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। পুত্রটির নাম সন্তোষ। এখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। উহার এক মাসমাত্র বয়সের সময় দুরন্ত সুতিকারোগে কলিকাতার বাসাতে উহার মাতৃ বিয়োগ হয়। একটু বেশী বয়সে ছেলে হইবে—ভয় আছে—বলিয়া প্রসবের জন্য কলিকাতার বাসাতেই আনা হইয়াছিল। কিন্তু ভবিতব্যের খণ্ডন হয় না!

কিরণশশীই সন্তোষকে নিজের কোলের ছেলের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সন্তোষ এক্ষণে কাশীতে সংস্কৃত পড়িতেছে।

উহাকে বেশী ইংরাজী পড়ান হয় নাই। সংসারের বয়োবৃদ্ধি সহকারে বোধ হইয়া আসিতেছে যে ইংরাজীর ভাব ও কথা বাঙ্গালা পুস্তকাদিতে এবং মাসিক পত্র প্রভৃতিতে এখন অনেক পাওয়া যায় বটে, তথাপি ইংরাজী না পড়াইয়া বাঙ্গালাতে ইতিহাস, ভূগোল গণিতাদি

শিক্ষা এবং রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা দিলে কূপমণ্ডূকতা যায়, অথচ কালেজী ইংরাজীর দরুণ "যতটা" রাজসিক ও তামসিক ভাব মনে প্রবেশ করে, উহাতে তদপেক্ষা অনেক কম করিয়া থাকে।

সংসার বলেন যে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের পরীক্ষার জন্য যতটা পড়া আবশ্যক ততটা সাধারণজ্ঞান জন্মিলেই যথেষ্ট, তবে ঐ গুলি স্কুলে পড়াইয়া তবে সংস্কৃতে মন দিতে হইলে যে সময় নষ্ট হয় তাহা করা ক্ষতিজনক। প্রথম বয়স হইতেই সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর বিশেষ চেষ্টা না করিলে ভাল হইবার সম্ভাবনাই থাকে না।

এজন্য বাড়ীতে একজন পণ্ডিত আসিয়া সন্তোষকে অঙ্ক ভূগোলাদির শিক্ষা দিতেন। অল্প পরিমাণে ইংরাজী সাহিত্যও পরে শিখান হইবে স্থির আছে।

'বিবাহ সংস্কার' দুইবার হইতে পারে না এই ধারণায়, পবিত্র থাকিবার জন্য, সংসার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই।

অল্প বয়স। কখন কখন চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইত। প্রত্যহ সন্ধ্যাকৃত্যের সময় সমস্ত দোষের আলোচনা— তিন বার করিয়া হইয়া যাইত। চিত্তবিকার যখন ঐরূপ আলোচনায় ধরা পড়ে, তখন নিজের প্রতি বটুক ভৈরব জপ এবং স্বল্পাহার ব্যবস্থা করেন। ক্রমশঃ মন তার সহজে বিকৃতই হয় না।

ফলতঃ বলবৎ নিগৃহীত হইলে চিত্তবিকার ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। 'নাই দিলে' সকলেই ঘাড়ে চড়ে। কুকুর বিড়াল প্রভৃতির ন্যায় কাম ক্রোধাদি রিপুগণেরও ঐ নিয়ম।

অনাথবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম জ্ঞানচন্দ্র, বয়স ১৯ বৎসর, ইঞ্জিনিয়ারি কলেজে পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্রের নাম ভক্তিচরণ, বয়স ১৫ বৎসর, এণ্ট্রান্স পাস হইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহার পর একটি কন্যা। নাম সুশীলা, বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। বয়স ১১ বৎসর।

অনাথবন্ধুর বড়ই ইচ্ছা যে দ্বিতীয় পুত্রটিকে ইঞ্জিনিয়ারি ও কারখানার কাজ উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করাইয়া দেশীয় কোন কারখানায় নিযুক্ত করেন, এবং তৃতীয়টিকে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাল করিয়া শিখাইয়া সংবাদপত্রের লেখক এবং বাঙ্গালা গ্রন্থকাররূপে প্রস্তুত করিয়া তুলেন।

ছেলেরা সরকারী চাকরীর চেষ্টা করে অনাথবন্ধুর সে দিকে ইচ্ছা নাই। এখনকার কালের তীব্র প্রতিযোগিতায় ভাল চাকরী পাইবার সম্ভাবনাও কম। পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ দুই তিন জনের মধ্যে না হইতে পারিলে ভাল চাকরী পাওয়া কঠিন। ইউরেশীয়, দেশীয় খৃষ্টান, মুসলমান, উড়িষ্যা বাসী, বিহারী, প্রভৃতি সকলের যথাযোগ্য ভাগ ত পাওয়া চাই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত অনাথবন্ধুর সাহিত্য সম্বন্ধে রুচির অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় ইতিহাস গ্রন্থের উপর তাঁহার ভক্তি কমিয়াছে।

'প্রজা সাধারণের হস্তে রাজশক্তি যত আসিবে ততই ভাল' এই ভাবেই ইয়ুরোপীয় সমাজ এবং ইউরোপীয় ইতিহাস পূর্ণ! ব্যক্তিগত স্বত্বের সর্ব্বতোমুখী প্রসারের দিকেই ইউরোপীয় সমাজের গতি। এই সকল ভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার এবং সমাজের গঠনের অনুপযোগী।

পৌরাণিক গল্পই যে প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য, অনাথবন্ধুর ক্রমশঃ এই বোধ জন্মিয়াছে। ছাপা পুস্তকই 'কথকতার' স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া অনাথবন্ধু এখন "সুলভ পৌরাণিক গল্প প্রচারের" একান্ত আবশ্যকতা সুস্পষ্ট বুঝিতেছেন।

তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এইরূপ প্রাচীনের প্রচার সহিত নূতন গঠনেরও চেষ্টা হয়। অনাথবন্ধু মনে করেন যে, সর্ব্বজাতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস হইতে উপাদান সংকলন করিয়া কতকটা পৌরাণিক ধরণে নূতন নূতন গল্প রচিত হইতে থাকিলে ক্রমশঃ কালোপযোগী রচনা প্রণালীর আবিষ্কার করণক্ষম লেখকগণেরও আবির্ভাব হইবে। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না। জাতীয় ধর্ম্মভাবে পরিষিক্ত হৃদয়ে যদি এ দেশের লেখকগণ বৈদেশিক সাহিত্য বিজ্ঞানকে এইরূপে আপনাদের আয়ত্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন, তবে এখনকার বৈদেশিক সংস্রবের প্রকৃত স্থায়ী উপকার পাওয়া যাইবে—এমন কি একটি "পৌরাণিক নবযুগেরই" আবির্ভাব হইতে পারে।

ছোট ছোট কতকগুলি গল্প ঐ ধরণে লিখিয়াছেন,

কিন্তু ইচ্ছা যে সংসারের সঙ্গে একত্রে পড়িয়া কাটকুট করিয়া তবে প্রচার করিবেন। দেখা পাছে একটুও অসঙ্গত বা অশাস্ত্রীয় হয় সে জন্য বিশেষ ভয় আছে। বড়ই উচ্চাধিকারীর কাজ।

মধ্যে মধ্যে অনাথবন্ধু পূজার ছুটীর সময় সপরিবারে তীর্থ দর্শনে গিয়া থাকেন। প্রথমে কাশীতে সংসারের বাসায় গিয়া তথা হইতে অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার (মায়া), কন্‌জিভরম্ (কাঞ্চী), উজ্জয়িনী (অবন্তী), দ্বারকা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, পুষ্কর, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। এক এক যায়গায় গিয়া আট দশ দিন থাকেন। সাত আট বারে এতগুলি তীর্থ স্থান দেখা হইয়াছে। সকল স্থানেই অতি সামান্য ভাবে, কিন্তু বিধিমত, তীর্থের কার্য্যগুলি করা হয়।—প্রেসের প্রকাশিত তীর্থ মাহাত্ম্যগুলি এই সকল সময়ে অনাথবন্ধু সযত্নে সঙ্গে লইয়া যান।

মহামায়া ও কিরণশশী এইরূপ তীর্থ দর্শন করিতে পাইয়া বড়ই সুখী। উভয়ের যত্নে সাংসারিক খরচ পত্র এত সাবধানে করা হয় যে কোন প্রকার অপব্যয় বা অপচয় নাই।

অনাথবন্ধুর অবস্থাপন্ন অতি অল্প লোকেরই এরূপ সচ্ছল ভাব। অপব্যয় না থাকিলেই সদ্ব্যয়ের সুবিধা। ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণ কেহ রিক্তহস্তে ফেরেন না। অতিথি অভ্যাগতের যথেষ্ট সমাদর হয়। দশ টাকা সঞ্চয়ও হইয়া আসিতেছে।

কিরণশশীর নামে সংকল্প করিয়া চারি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়াছে। শেষ বারের সমস্ত খরচ প্রদোষের

রোজগার ও অনাথবন্ধুর পুত্রদিগের জলপানির টাকা জমাইয়া হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে একবার প্রদোষকে ৺ গয়াধামে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং কিরণশশী ৺প্রয়াগধামে শিরো-মুণ্ডন করিয়া আসিয়া ছিলেন। মহামায়া বারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিরণশশীর একমাত্র কথা—"তিনি ভাল মনে করিতেন—"

একত্রে অশ্রুবিসর্জ্জন ভিন্ন ইহার আর উত্তর নাই।

কিরণশশী এক্ষণে অনাথবন্ধুর বাড়ীতে জীবন্ত দেবী প্রতিমা। যতগুলি পুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছে সমস্তই পড়িয়াছেন। সুশীলা তাহার খুড়িমার কাছে পৌরাণিক গল্প শুনিতে বড়ই ভাল বাসে। "বুলে, নাটক নবেলের গল্প পাঁচ সাত দিন পরে গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু পৌরাণিক গল্পের উপদেশ সেরূপে ভোলা যায় না।

কিরণশশীর মন ঈর্ষ্যাদ্বেষাদি শূন্য—অপরের ব্যথায় ব্যথিত। কি উচিত কি অনুচিত তাহার বোধ খুবই সুপরিস্ফুট।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

-✱✱✱-

দেশীয় শিল্প।

যথা স্ত্রী তনয়া পোষ্যা স্বদেশে শিল্পিনস্তথা।

দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র রেলওয়েতে আনন্দনাথ অনেক টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আরও দুই একটি রেলওয়ে ভারতবাসীর টাকায় চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অনাথবন্ধুও কিছু শেয়ার কিনিয়াছেন। আনন্দনাথ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য। অনাথবন্ধুও রেলওয়েটির কার্য্যে সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মধ্যে ঝগড়া মিটানই উহাঁদের এ সম্বন্ধে প্রধান কাজ। "অমুক কর্ম্মচারী অমুক ডাইরেক্টারের সহিত এতদূরের সম্পর্কিত, উহাকে তাড়াইয়া না দিলে রক্ষা নাই!" "অমুক লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না।" "আমি কাহার অমন খাতির রাখিয়া চলিতে পারি না। বড় জোর আমার না হয় এই কমিটির 'অনাহারী চাকরীটা খসাইয়া' লইবেন। আমি ত আর কাহার খানা বাড়ীর রাইয়ত নহি। আমি বাপকে হক্ কথা শুনাই—অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না"—এইরূপ উক্তি অনাথবন্ধু ও আনন্দনাথকে প্রায়ই শুনিতে হয়।

রেলওয়েতে, পথে, ঘাটে, মাঠে, আফিসে যাঁহারা সরকারী মেথরটার এবং বেসরকারী ইংরাজের ঘেষেড়াটার পর্য্যন্ত উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যস্ত, ভিন্ন সমাজান্তর্গত ব্যক্তিদিগের নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচার যাঁহারা প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় অম্লান বদনে সহ্য করিতেছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় কাহার দ্বারা অতি নম্রভাবে ক্ষমতার পরিচালনা হইতে থাকিলেও তন্মধ্যে 'অন্যায় অত্যাচার" দেখিতে পান। কারবার মাটি হয় হউক তবু "অত্যাচার" নিবারণে এই সকল ব্যক্তি কৃতসংকল্প!

যখন এইরূপ একটা হাঙ্গামা উঠে, তখন গোপনে গোপনে ভোটের জোগাড় আরম্ভ হয়—আর আনন্দনাথ এবং অনাথবন্ধুর যেন বাপ মা মরা দায় পড়ে। মাতৃভূমির অঙ্কুরিত আশাটি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া একরূপ মিটমাট করিয়া দেন।

এইরূপে কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া গেলে দুজনের প্রতিই সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়াছে এবং দুজনেরই এক্ষণে আশা হইতেছে যে, ক্রমশঃ এইরূপে হয়ত আরও বড় বড় কারবার বাঙ্গালীর দ্বারা চলিতে পারিবে। ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। অনাথবন্ধু এবং আনন্দনাথ সর্ব্বদাই স্বব্যয়ে লাইনটীতে ঘুরিতে থাকেন। তাঁহাদের যত্ন দেখিয়া ম্যানেজারও ঢিলে দিতে পারেন না; এবং সকলেরই সুধু কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া চিঠিবাজী করিতে লজ্জা হয়।

বিলাতী দিয়াশালাই, কাচের বাসন, লোহার কারখানা প্রভৃতি যে সকল নূতন নূতন কারবারের চেষ্টা হয় তাহাতে দুজনেই দশ বিশ টাকা শেয়ার কিনিয়া থাকেন। উহাঁদের বিশ্বাস যে অমন পাঁচ সাতবার লোকসান গিয়া শেষে এক একটি কারবার প্রবল হইয়া উঠিবে।

মধ্যবিত্ত সকলেরই একটু একটু ওরূপ "লোকসান স্বীকারে" প্রস্তুত থাকা উচিত। ফলেও দেখা গিয়াছে যে দিয়াশালাইয়ের কারবারটি উপর্য্যুপরি চারিটী কোম্পানির হাত বদলাইয়া—প্রথম তিনটিকে ফেল করিয়া—এক্ষণে বেশ চলিতেছে।

সকল বিষয় জানা না থাকাতেই প্রথম কয়েক বার লোকসান হয়। আর আমাদের দেশে সব চেয়ে বেশী দেখে ও ঠেকে কম শেখা একটি জিনিস এই যে, "ঝগড়া করিলে কাজ চলে না"।

আজ কাল নানা স্থানে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কারবারের এবং নানা প্রকারের জীবনবীমার বিবাহফণ্ডের গোলমেলে কোম্পানি উঠিতেছে। কিন্তু ও সকল স্ফূর্ত্তি বা জুয়াখেলায় অনাথবন্ধু রাজী নহেন—শিল্পজাত প্রস্তুত চেষ্টাতেই তাঁহার আগ্রহ।

অনাথবন্ধু একটু খ্যাতনামা লোকের নাম না দেখিলে টাকা দেন না। অনুসন্ধান করিয়া ভাল বলিয়া জানিতে পারিলে অল্প স্বল্প শেয়ার কেনেন।

তাঁহার বিশ্বাস প্রথম প্রথম এ দেশে খ্যাতনামা লোক-

দিগেরই আসরে নামিয়া যৌথ কারবারে সাহস দেওয়া আবশ্যক।

সব ভাল জিনিসেরই সঙ্গে একটা মন্দ থাকে। যৌথ-কারবারের নামে অনেক গরীবের টাকা ফাঁকিতে যায়। এজন্ত সাবধান হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম দেখিয়া টাকা দেওয়া উচিত। বড় নামের জিনিস একবার একটা বড়ই ডুবি হওয়ায় বড় নামেও অনেকের ভয়। কিন্তু তাহার কারণ ছিল। প্রকৃত কার্য্যপ্রণালী না জানাই প্রধান কারণ এবং সাম্প্রদায়িক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গঠনেও যে দোষ আছে তাহাও এক কারণ।

জমিদার এবং মহাজনেরাই সাধারণতঃ কার্য্যক্ষম লোক। অধ্যক্ষদের মধ্যে সেরূপ লোক না থাকিলে প্রায়ই গোলমাল হয়। সুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য উকীল বা চাকুরিয়ার দ্বারা যৌথ কারবার ভাল হয় না। সুবর্ণ বণিক, তিলি, তাম্বুলি, মাড়োয়ারীদিগের কতকটা প্রভুতা থাকিলে তবে কারবার 'হিসাবী ধরণে' এবং সহজে চলে। যাদের যে কাজ পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত!—সুবর্ণ বণিক বড়াল খুব অসাধারণ বিদ্বান বা রাজনীতিজ্ঞ নহেন। কিন্তু তিনি ধীরতা এবং বিচক্ষণতা সহ যে কার্য্য করিয়া লক্ষপতি, তাহাই সুপণ্ডিত ও নামজাদা কোন ব্রাহ্মণসন্তান তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সর্ব্বস্বান্ত হন! সর্ব্বত্রই এইরূপ।

দেশী ছাতার শিক প্রস্তুত আজও হয় নাই এবং শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা কম। তবে একটা খুব ভারী মূলধনের

বিলাতী কোম্পানি বরাকর অঞ্চলে লোহার কারখানা আরম্ভ করিয়াছে। প্রধানতঃ উহারা রেল ও পুলের সরঞ্জাম গড়িতেই ব্যাপৃত, কিন্তু ক্রমে উহাদের লাভ দেখিয়া অন্য দু একটা বিলাতী কোম্পানি ঐ অঞ্চলে আসিতেছে। লোহার কারবারে অত্যন্ত অধিক টাকার প্রয়োজন— উহা প্রথমে বিলাতী কোম্পানির দ্বারাই এদেশে আরম্ভ হইতেছে।

দেশী জিনিস সম্বন্ধে অনাথবন্ধুর সহিত একদিন ট্রামওয়েতে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের কথা বার্ত্তা হইল।—বাজারের চৌ রাস্তার কাছে একখানি দোকানে লেখা আছে "এখানে সুধু দেশী জিনিস বিক্রয় হয়।" দোকান খানি বেশ বড়। ভদ্রলোকটী বলিলেন "এ দোকানে ত লোক অনেক ঢুকিতেছে।—ফরাসডাঙ্গার কাপড় আর কাঁসা পিতলের জিনিস ছাড়া দেশী আর কি আছে!"

অনাথবন্ধু বলিলেন "ঐ দোকানটির স্থাপনে অনেক গুলি ভদ্রলোকে যত্ন করিয়াছেন। আমিও উহার কল্যাণ-প্রার্থী। ওটি প্রথমে যৌথ কারবাররূপে আরম্ভ হয়—এখন একজনেরই সম্পত্তি। ওখানে দেশীয় সব জিনিস একত্রে রাখায়, যে সকল লোক দেশীয় জিনিস খোঁজেন তাঁহারা ঐ সকল জিনিস সহজে পাইয়া থাকেন। জিনিস খাঁটি—দর দাম নাই। অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে দোকানটির বিজ্ঞাপন অতি অল্প মূল্যে, কোথাও বা বিনা মূল্যেই

ছাপা হয়। মফঃস্বল হইতে অনেক জিনিস অনেকে ডাক রেল ও ষ্টীমার যোগে লইয়া থাকেন।

"দোকানটীতে সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়—ধুতি, উড়ানি, গামছা, ঝাড়ন, দোসুতি, ছিট, তাঁতে বোনা লংক্লথ—ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মালদহ, হাবড়াহাট, কঁইকালারহাট, প্রভৃতি হইতে আনান হয়। বোম্বাই, নাগপুর, কানপুর, দানাপুর, লাহোর, অমৃতসহর, গৌহাটী ভাগলপুর প্রভৃতি হইতে চৌকা, মোটা মার্কিন, মোটা লংক্লথ, ড্রিল, টুইল, বিছানার চাদর, মোটা ধুতি, তোয়ালে সূতি ও পশমী মোজা, ফ্লানেল, কাশ্মীরা, বনাত, সার্জ্জ, কম্বল, র‍্যাপার, কার্পেট বুনিবার উল, অল্প দামের শাল, মলিদা, পটু, আসামী এণ্ডি, দেশী তসর, বাফ্‌তা, গরদ, চেলি, বেনারসী কাপড় ও কিংখাপ এবং প্রকৃত বোম্বাইএর কাপড় পাওয়া যায়। সঙ্গে দর্জ্জির দোকানও আছে। কাটা কাপড়ের জিনিস প্রস্তুত থাকে।

"পশ্চিমে সতরঞ্চি, গালিচা ও আসন, বীরভূমী এবং ভুটীয়া রঙ্গিন চাদর, দেশীয় মসারির কাপড় প্রভৃতি ঐ দোকানে আনাইয়াছে। বালী, টিটেগড়, কাঁকনাড়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি কল হইতে সকল প্রকারের সাদা ও রঙ্গিন কাগজ, ব্লটিং কাগজ, খাম, চিঠির কাগজ, প্রভৃতি আনাইয়া রাখাইয়াছে।

"দেশীয় কোম্পানির দিয়াশলাই, পেন্সিল, বার্লি, ছাপার ও লেখার কালি, ঔষধাদি, সাবান, বাতি এবং আতর গোলাপ ও নূতন ধরণের সুগন্ধি, দেশীয় মিস্ত্রির হাতের ভাল টিনের

বাক্‌স ও তোরঙ্গ, বেতের পেটারা, কল, তালা, কাটারি, কুড়ালি, ছুরি কাঁচি আসিয়াছে।

"কটকের আমদানি শিং এর ছড়ির খুব কাট্‌তি হইতেছে। জয়পুরী পাথরের পুতুলও কাগজচাপা, পশ্চিমে কাঠের খেলনা, বীরভূমি গালার পুতুল ও এ দেশী পিতলের খেলনা, মুরশিদাবাদী ও যোধপুরী হাতীর দাঁতের খেলনা ও ঘড়ির চেন কম বিক্রয় হয় না। বিলাতী টিনের ও কাচের পুতুল দুদিনে ভাঙ্গিত—এখন আবার কাগজের খেলনা আসিতেছে দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইয়া ছেলেদের জন্য সাবেক মত নির্দোষ বাঙ্গালীর উপযোগী টেকসই কাঠের খেলনাই কিনিয়া দিতেছেন।

"ভিতরে কাপড় দিয়া খুব ছোট এক রকম সচিত্র বর্ণশিক্ষার বই—প্রেস হইতে বাহির হইয়াছে। দাম এক আনা মাত্র। তাহা এবং উহাঁদের বিখ্যাত ডায়ারিও এখানে কমিশন সেলে আছে—খুব বিক্রী হয়।

"পাশাপাশি কয়েকখানি দোকানই একজন ধনী তিলির। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিশ্বস্ত লোক দিয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দোকান চালাইতেছেন। লোহা লক্কড়ের, জুতার এবং কম্বলাদির দোকানগুলি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে পাশাপাশি আছে। হঠাৎ এক সামিলের বলিয়া বোধ হয় না। উপরের সাইনবোর্ট দেখিলে তবে এক দোকান বুঝিতে পারা যাইবে। ইঁহাদের এইরূপ আর একখানি দোকান হাবড়া পুলের কাছে হ্যারিসন রোডের উপর আছে।

"এক জায়গায় সকল প্রকার দেশীয় জিনিস পাইলে ভাল হয়, এ জন্য একজন মুসলমানের দোকানে কাবুলি সিমলার, দানাপুরী এবং দেশীয় পশ্চিমে কোম্পানিদের সর্ব্বপ্রকার জুতা রক্ষিত আছে। অপর একজন মুসলমান দোকানদার দেশীয় বিদেশীয় নূতন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার পুস্তকের দোকান নিকটেই খুলিয়াছেন। দেশীয় চামড়া ও দেশীয় কাপড় দিয়া উঁহারা ফরমাইস মত উৎকৃষ্টরূপ পুস্তক বাঁধাই করিয়া দেন।

"মফঃস্বলের লোকের কাছেই দেশী জিনিস অধিক বিক্রয় হয়। কলিকাতায় কিছু মৌখিক আড়ম্বর বেশী—কাজের সময় মনের দৃঢ়তা কম দেখা যায়। অনেকে ছাতা পর্য্যন্ত বিলাতী ব্যবহার করিতে চান না। তাঁহাদের জন্য বেতের শিকওয়ালা একপ্রকার ছাতা প্রস্তুত আছে। দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কাট্‌তি কম বলিয়া দাম বেশী।"

ভদ্র লোকটি চুপ করিয়া এতক্ষণ শুনিতে ছিলেন। এত জিনিস যে দেশীয় পাওয়া যায়, তাঁহার জ্ঞানই ছিল না! বলিলেন "বন্দোবস্ত করেছে ভাল বল্‌তে হবে! কিন্তু আমার ত কোন মতেই মনে হয় না যে খরচা পোষায়। লোকটা বোধ হয় কোন বড় মানুষের ছেলে! ঘি ময়দা তরি তরকারি পশু পক্ষী রাখে নাই ত?"

অনাথবন্ধু স্মিত মুখে বলিলেন "না, খাঁটি ঘি ময়দা অন্য এক দোকানে বাজারের গায়ে পাওয়া যায়—সেটা এদের চেষ্টায় স্থাপিত নয়।—এ দোকানে লোকসান নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন "এত সব করিবার দরকার কি? ফলে এ সকল কি পাগলামি নয়? ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের সূতা বিলাতী, কানপুর ও বালীর কলের মূলধন বিলাতী —ও সব জিনিস দেশী হো'ল কি করে?"

অনাথবন্ধু। অনেকটা দেশী হইল বই কি! ফরাস-ডাঙ্গাদির কাপড়ের সূতার দামে যত টাকা এ দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহার অপেক্ষা কিছু অধিকই মজুরি প্রভৃতি হিসাবে এ দেশে থাকিয়া দেশীয় তাঁতিগুলি পালিত হয়। সাহেবদের কল সম্বন্ধেও দেখুন, কল স্থাপনের সময়, চালনার সময়, দেশীয় সরঞ্জাম, কয়লা, মজুরী প্রভৃতি খরচায় ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদেরও খাওয়া দাওয়া চাকর বাকর প্রভৃতিতে দেশীয় লোকে অনেক টাকাই পায়। এ দেশস্থিত ইংরাজের কলের জিনিস এক টাকায় কিনিলে তাহার অন্ততঃ ৸৵৹ আনা এ দেশীয়ে পায়। বিলাতী কাপড়ের বেলা বড়জোর ৴১০ মাত্র দেশীয়ে পায়। ইয়ুরোপীয়দের উপর বিদ্বেষ বশতঃ এ কাজ হইতেছে না। দেশীয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য—বিলাতী জিনিসের ব্যবহারে দেশীয় শিল্পীরা একেবারে কিছুই পায় না, সেই জন্য আপনার লোককে কিছু দিবার চেষ্টা, নচেৎ সমাজের একটা অঙ্গ শিল্পজীবীরা যে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া যাইবে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন 'ও বিষম ভুল! সস্তাই চলিবে— দেশ যে গরীব!"

অনাথবন্ধু! "হাঁ। মোটের উপর যাহা সস্তা তাহাই

চলিবে। ‘তবে বিলাতী জিনিস কিনিব না; আর দেশী চক্‌চকে জিনিসের বড় বেশী দাম আমাহইতে তাহা পোষাইবে না’—এই বলিয়া অনেকে অনেক বাজে জিনিস্ কেনা একবারেই ছাড়িয়া দেশী মোটা জিনিস ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মোটেসস্তা দাঁড়াইতেছে। দশ পনের টাকা উপায়ের লোকও অনেকে দেশীতে চালাইতেছেন—পূর্ব্বোক্ত চলিত! এখন আবার সাবেক মত মনটা করিলেই হয়।

“ফলতঃ চটিজুতা, বোম্বাই চাদর, হেটো কাপড় এবং উড়ানি, দেশী কলের মোটা মার্কিনের জামা বেশ সস্তা জিনিস। মনকে দৃঢ় করা নিয়েই আসল কথা। একটা ‘কর্ত্তব্যের ঠিকানা’ থাকিলে সাংসারিক কোন বিষয়েই কোন গোলযোগ হয় না। আমার জানা একজন অল্প বেতনের কর্ম্মচারী ‘বোম্বাই চাদর কাটিয়া’ নিজের ও ছেলেদের পিরাণ করেন। সেই রকম ‘মনের’ প্রয়োজন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেদেরও যে কোথাও কোথাও শালকের টুপি ও ঘাগরা পরা হইতেছে তাহা কি একান্ত হেয় ব্যবহার নয়? আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকিলে উঁহারা ওরূপ করিতে পারেন না। সেই আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকিলে দেশীয় সাধারণ গৃহস্থও কেহ বলিতে পারেন না যে ‘সকলে লোভে পড়িয়া অন্যায় করিতেছে বলিয়া আমারও বাহারের লোভ—সুতরাং দেশীয় তাঁতিকে কিছু দিব না।’ নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়ান যে দেশের নিয়ম সে

দেশীয় শিল্প।

দেশে সুধু মোটা পরিয়া দেশীয় শিল্পী পোষণ যে কর্ত্তব্য তাহাও আজ বলিয়া দিতে হইতেছে!

ভদ্রলোক। আসে পাশে সস্তা বিলাতী দেখে কে আর মোটা দেশী লইতে যাইবে।

অনাথবন্ধু। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা ঐরূপ করিলেই দেখাদেখি সাধারণ লোকেও তাহা করিবে। উপরিস্থ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ করিতে দেখে, নিম্নস্তরের লোকেরা সর্ব্বত্রই সেইরূপ করে। বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণের কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে এদেশের লোকেরা আশৈশবকাল অভ্যস্ত এবং শাস্ত্রে আদিষ্ট। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা একটু সংযমশীল হইয়া বিলাতী ব্যবহারে লজ্জা বোধ করিলে আর কোন গোলই থাকে না। বিলাতী চটের র্যাপারে মোটা দেশী চাদরের অপেক্ষা শীত কম কাটে—আবার জল সয় না সুতরাং অপবিত্র। ব্রাহ্মণেরা এই কথা স্মরণ করিলে ছেলেরাও শীতের দিনে বাঁচে, আর দেশীয় শিল্পীরাও বাঁচে।

ভদ্র লোক। আমি একজন পুরোহিতকে বলিতে শুনিয়াছি 'দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার প্রচলনে আমাদের লাভ নাই। যজমান ত আর বেশী টাকা খরচ করিবে না। যে এক টাকার বিলাতী কাপড় দিত, সে এক টাকারই দেশী বস্ত্র দিবে। আমাদের পক্ষে এক টাকার দেশী কাপড় দেওয়া অপেক্ষা এক টাকার বিলাতী দেওয়া ভাল—তবু পরা যায়!'

অনাথবন্ধু। ব্রাহ্মণ এইরূপ স্বার্থপর এবং নীচদৃষ্টি হওয়াতেই দেশের যত অমঙ্গল। পুরোহিতদিগের

সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা বড়ই দরকার! পুরোহিতগণ যদি এখনও বলিতে পারেন 'দেশী কম দামী কাপড়ে আমার নিজের একটু অসুবিধা হইবে বটে, তথাপি দেশী কাপড়ই দিও। দেশের তাঁতিরা কে খাইতে পায় না। আহা বেচারীরা খাইতে পাউক। পূর্ব্বগত কর্ত্তাগণ ত মোটা খাট দেশী কাপড়েতেই চালাইয়াছেন—আমি কোন ছার যে আমার চলিবে না।'—তাহা হইলে প্রকৃত ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন এবং উদার হৃদয় দেখিয়া যজমানগণও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ধর্ম্মপথপ্রদর্শক বলিয়া বুঝিবে এবং তাঁহাদের সন্তানাদির কখন সাংসারিক কষ্ট হইতে দিবে না।

"কৌশলে বা স্বার্থদৃষ্টিতে ত ব্রাহ্মণ এই সমাজে বড় হন নাই। প্রাধান্য হইয়াছিল, উদারতা, সর্ব্বজনহিতে দৃষ্টি এবং স্বার্থত্যাগ জন্য। প্রাধান্য যাইতেছে ক্ষুদ্র দৃষ্টি এবং স্বার্থান্বেষণ জন্য। স্বার্থত্যাগেই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থলাভ হয়, তাহা কি ব্রাহ্মণগণ আর বুঝিবেন না? বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগী পরমহংসগণকে রাজভোগে রাখিতে যে হিন্দুসমাজ কি জন্য ব্যাকুল তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? ব্রাহ্মণ প্রকৃতপ্রস্তাবে এক মনে অপরের জন্য চিন্তা করুন—তাঁহার নিজের পেটের উপায়, যেমন পরমহংস মহাপুরুষদিগের জন্য করিতেছেন, ভগবান, হিন্দু সমাজের হাত দিয়া তেমনই করিয়া দিবেন!

"লাহোরে দেশীয় বস্ত্র প্রচারিণী সভা এবং মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে স্বদেশীসভা স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্জাব এবং বোম্বাইয়ে

অধিকাংশ দেশীয় ভদ্রলোকেই দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে-ছেন। এখন বাঙ্গালী অনেকের গায়েও দেশীয় 'টুইলের সার্ট' দেখা যাইতেছে। ফলতঃ এই বিষয়ের আলোচনা রাখিলে এবং দশজন ভাল লোক এইমত চলিলে সাধারণের ভিতরেও দুই তিন পুরুষের মধ্যেই এই প্রকার মত দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

"স্বদেশীয় শিল্পজাতের প্রতি এত অনাদর পৃথিবীর কোন দেশের লোকে করে না! সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দেশীয় জিনিস পাইলে বিলাতী লইবেন না। আমরা নিজেরা সে প্রতিজ্ঞা করি না কেন? প্রতি টাকার বিলাতী জিনিস কিনিবার সময় মনে করি না কেন যে, শীর্ণকায় দেশীয় মজুর ও শিল্পী তের চৌদ্দ জন যেন আমার দ্বারে পাত পাতিয়া এক বেলার অন্নের জন্য বসিয়া আছে এবং আমি ঐ টাকাটি দিয়া দেশীয় জিনিস কিনিলেই তাহাদের পাতে ভাত পড়িত! এ দেশী মজুরেরা ত চারি পয়সায় একবেলার আহার সারে। দেশী জিনিস কিনিলে প্রত্যেক টাকার ৵৹ কি ৸৹ আনা ত এ দেশে থাকে ও স্বদেশীয় শ্রমজীবিরা পায়।

"ফলতঃ দেশীয় জিনিস কিনিলেই একটি অলক্ষ্য 'ভারত দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ফণ্ডে' নিয়মিত চাঁদা দেওয়া হইয়া যায়! বিলাতীর পরিবর্ত্তে যদি সকলেই দেশী জিনিস কিনি তবে ঐ ফণ্ডের বার্ষিক চাঁদা প্রায় ৪০৲ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়! যাঁহারা সুস্পষ্ট দুর্ভিক্ষ

হইলে দশ পাঁচ টাকা চাঁদা তোলেন তাঁহারা এমন মোটা কথাটা বিলাতী কাপড়ের কোট কামিজ কিনিবার সময় মনে করেন না কেন? 'সকলে একথা না বুঝিলে, সকলে এমন না করিলে, আমি করিব না' এ আবদারে 'চিত্র গুপ্তের খাতায়' প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব কাটে কি? যিনিই জানিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন তাঁহারই 'জ্ঞানকৃত অপরাধটি' হয়।"

ভদ্রলোকটী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যত দূর পারি আমিও দেশীয় জিনিশ ব্যবহারের চেষ্টা করিব। বাড়ীতে মেয়েরা হেটো মোটা কাপড়ে প্রথম একটু খুঁত খুঁত করিবে। কিন্তু উচিত কার্য্যে মেয়েদের ভয় করিলে চলিবে কেন?"

ভারত গবর্ণমেণ্টের উদার কার্য্যের উদাহরণ পাইয়া ভদ্রলোকটী একেবারে সকল ভ্রম ঘুচিয়া গেল। ইংরাজের সদুদাহরণে যে কাজ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ছেলের বিবাহ।

সাধু নিগর্হিতং শুদ্ধং কন্যাপুত্র বিবাহকে।

সত্যনাথের কাশীতে পড়া শুনার জন্য বিবাহে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। প্রদোষেরও সুতরাং বিবাহ হয় নাই।

কিরণশশীর আজ ১০ বৎসর ধরিয়া ইচ্ছা বৌএর মুখ দেখেন। "সত্যনাথের বিবাহ দাও তা হলে প্রদোষের বৌ আসে"—মহামায়াও এ কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন কিন্তু সংসারের তাহাতে মত হয় নাই।

তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে উপযুক্তরূপ পাঠ সমাপ্তি না হইলে তিনি বিবাহে অনুমতি দিবেন না। যতটা সম্ভব প্রকৃত হিন্দুমতেই থাকা যখন প্রার্থনীয়, যখন বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে অর্থকরী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত না করিয়া টোলের পণ্ডিত প্রস্তুত করা হইতেছে, তখন মধ্যে থেকে একটা বিবাহ দিয়া নিয়মবিগর্হিত কাজ কেন করা হয়?

সত্যনাথকে খুব পণ্ডিত করিব, সংসারের সাংসারিক বিষয়ে ইহাই প্রধান অভিলাষ। নিজের পুত্র সন্তোষ, সত্যনাথের টোলে পাঠ সমাপন করিবে—বাড়ীর বড় ছেলের প্রাধান্য অপর সকলের অপেক্ষা অনেক উঁচু হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষ্য।

সংসারের কথাতে পুত্রের বিবাহে বিলম্ব হওয়ায় কিরণশশীর অভিমান হয় নাই।

"সাংসারিক কোন কথাতেই সংসার থাকে না। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে ও একরূপ উদাসীনের মত। যদি ওর এ কথাটা না রাখা হয় তবে গুরুগিরিতে হাত দেওয়া হইল বলিয়া বড় অভিমান করিবে। সত্যনাথকে পড়ান ওর সংসারের প্রধান বন্ধন। ওর অমতে বিবাহ দিলে রাগ করে হয়ত আর পড়াবে না। হয় ত কোন দিন কাশীর সন্ন্যাসীর দলে মিশে কোথায় চলে যাবে।"—কিরণশশী নিজেই এই সকল কথা একদিন মহামায়াকে বলিয়াছিলেন।

সংসার অল্প বয়সে স্ত্রীহীন হইয়া পবিত্র চরিত্রে তাঁহারই ন্যায় পরলোকের প্রতি মন রাখিয়া কঠোর ব্রত আচরণ করিতেছেন, কিরণশশী ইহার মাহাত্ম্য সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরকালের দিকে মন একাগ্র হইলে ভাল মন্দ চেনা যায়।

এখন সত্যনাথের বয়স ছাব্বিশ বৎসর। প্রদোষের পঁচিশ। এই বৎসর উভয়েরই বিবাহ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

'অনাথবন্ধু বাবু একটু হাতকষা লোক, তাঁহার দশ টাকা আছে। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে আয়ও মন্দ নয়। ছেলেরা খুব উৎকৃষ্ট।'—এই কথা ভাবিয়া অনেকেই উঁহার ঘরে কন্যা দিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু অনাথবন্ধু

এত কাল 'ছেলেদের বিবাহের দেরী আছে' বলিয়াই কাটাইয়া দিতেছিলেন।

একজন কন্যাভারগ্রস্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "মহাশয় ভাল ছেলে সব যদি এমন করে ধরে রাখেন তাহা হইলে লোকের যে বড় বিপদ। আর ছেলেও খারাপ হইবার সম্ভাবনা।"

অনাথবন্ধু কেবল বলিয়াছিলেন "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! যখন যেখানে ঘটিবার কথা তাহাই হইবে। নচেৎ বিবাহে এতটা দেরী পূর্ব্বে আমার পছন্দ ছিল না। উনিশ বৎসরে বিবাহই ভাল মনে করিতাম।"

কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যার সহিত সত্যনাথের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল এবং ঠিকুজি মিলিল। কলিকাতার ভিতর একটু শীঘ্র শীঘ্র আচারভ্রষ্টতা ঘটিতেছে। বিলাসিতা বেশী। এই জন্য অনাথবন্ধু অল্প অমত করিয়া বলেন—

"আমার ছেলে অধ্যাপক পণ্ডিত হইতেছে, আচার বিচারে বিশেষ দৃষ্টি আছে। অধ্যাপকের উদ্দেশ্য টাকা নয়। উহাঁদের 'সম্মান' বিশেষ যত্ন করিয়া রাখাই আবশ্যক। ব্যবসায়ের সম্মানে অন্য জামাই অপেক্ষাও যেন সত্যনাথের অধিক সমাদর দরকার। কলিকাতায় এই ভাব কমিয়া যাওয়ায় আমার মফঃস্বলে অধ্যাপকের বাড়ীর মেয়ে লইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আপনি খুব সংভ্রান্ত বংশীয়। অতি সজ্জন। বিশেষ আগ্রহ

যথেষ্ট সম্মান আছে। নির্ব্বিরোধী পরোপকারী লোক। ছয় পুত্রের পর একটি মাত্র কন্যা।

প্রদোষের নরগণ ক্ষত্রিয় বর্ণ। কন্যার দেবগণ বিপ্রবর্ণ। বর্ণ শ্রেষ্ঠা কন্যা স্বামীতে সম্পূর্ণ ভক্তিমান হয় না এরূপ একটা কথা আছে। অনাথবন্ধু প্রদোষের মত ছেলের সম্বন্ধে সে ভয় করিলেন না। তিনি স্থির করিয়া আসিলেন যে সত্যনাথের বিবাহের সাত দিন পরেই যে দিন ভাল আছে তাহাতেই প্রদোষের বিবাহ হইবে। মেয়েটির বয়স দশ বৎসর।

অনাথবন্ধু এই দুই বিবাহে কোন প্রকার ফর্দ্দ দিলেন না। বলিলেন—

"আমি বেশ কড়া ফর্দ্দই দিয়াছিলাম। ভাল ঘর—সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে—ঠিকুজির মিল—কন্যার পিতৃকুলে মৃদমুর্গী বা পুরুষানুক্রমিক কঠিন রোগাদি থাকিবে না। এ সমস্তই পাইয়াছি। মেয়েকে রাঁধিতে হইবে, কন্যা বিলাতী জিনিসপত্র পাইবেন না, তাহাতেও সম্মতি দিয়াছেন। এত যখন মিলিয়াছে তখন স্বধু গহনার জন্য বা দান সামগ্রীর জন্য এসে যায় না।

"গহনা গৃহস্থ বাড়ীর উপযুক্ত দুই পাঁচ খানা অবশ্যই বৌমার হবে। আপনি কিছু দিবেন। আমি কিছু দিব। তবে দু একখানা যাহা আমরা দিব একেবারে ভারী ভারী করিয়া দেওয়াই ভাল। ফং ফংএ গহনা ভাঙ্গিয়া গড়িতে অনেক ক্ষতি হয়। গা মোড়া গহনার আবশ্যক নাই।

কিছু কমই দেবেন—অধিক ব্যয়ভার যাহাতে বোধ হয় এমন কিছু করিবেন না।

"দান সামগ্রীটা একরূপ সভা-সাজান গোছ করিয়া আপনারাই বুঝিয়া দিবেন। বরের জন্য আংটী দিতে হয় ছেলের বাঙ্গালায় নাম খোদাই করিয়া সিল আংটী দিবেন—তবু কখন চিঠি মুড়িয়া মোহর করিবার সময় কাজে লাগিবে। ভাল ঘড়ির প্রয়োজন নাই। অত টাকা বিলাতে দিয়া কি হবে? ঘড়ি বিলাতী কিনিতেই হয়—দেশী জন্মায় না। কম দামী কাজ চলার জন্য আমিই কিনিয়া দিয়াছি।

"নমস্কারি কাপড় চোপড় প্রভৃতি যাহা দিবেন দেশী কিনিয়া দিবেন। কাপড় যেমনই হউক দেশী হইলেই ভাল হইয়াছে বলিব। দেশীয় কারিকরেরা কিছু পায় —আমার এসব সম্বন্ধে প্রধান ফর্দ্দই এই।"

একজন উপস্থিত ভদ্রলোক বলিলেন, "তবে কি খেরোর তোষক আর হেটো কাপড়ের মসারি হইবে?"

অনাথবন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি—তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব—তবে জিনিস-পত্র দেশী হইলেই যে আর ভাল হয় না তাহা নয়। রেসমি মশারির কাপড় মানভূমে তৈয়ারি হয়। লক্ষ্ণৌএর ছিট মন্দ জিনিস নয়। খাটে ভাল বাটালির কাজ করাইলে কাঠের খাটেই অনেক টাকা খরচ করা যাইতে পারে। বিলাতী লোহার খাটের বা কাচের খাটের পূর্ব্বে এদেশে রূপার ও

সোনার খাট এবং কিঙ্খাপের গদি হইয়া গিয়াছে!—আমি অত শত চাহি নাই। কেবল লোহার খাট, বিলাতী ছিট, নেটের মশারি, দেখিতে না হয় এই মাত্র অনুরোধ। বিবাহে এ সব বিষয়ে দেশীয় রীতি অনুসারে আমার কথা চলে বলিয়াই বলা। নচেৎ অন্য সময়ে আপনাদের যেরূপ রুচি সেইরূপ করিবেন—তাহাতে কথা কি!”

উপস্থিত দু একজন বলিতে লাগিলেন “মহাশয়! আপনার ন্যায় এমন একটু আধটু (কথাটা মার্জ্জনা করিবেন) ছিট থাকিলে বিবাহ বিভ্রাটটা ভাল হইয়া যায়। এক মেকের ঘড়ি ছাড়িয়াইত তিন চারিশত টাকা বাঁচাইয়া দিলেন।—আচ্ছা ভাল কথা! জুতোর কি হইবে? বিলাতী জুতা ত দিবার যো নাই। চীনের বাড়ীর কি চলিবে?”

অনাথবন্ধু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন “হাঁ, ওটা ভাবনার বিষয় বটে! তা চীনেরা যখন এদেশে আসিয়া কাজ করিতেছে তখন ওদের মালও এদেশী। কিন্তু ঠিক বিলাতীর মতন না পাইলে যদি আপসোশ না মেটে সেজন্য পশ্চিমে বিনামা কোম্পানি ও লালচাঁদ প্রভৃতিও আছে। তবে সাবেক ধরণে জরির জুতা ও খড়ম দেওয়ায় দোষ কি?”

বাবুটি অনাথবন্ধুর হাসির ভিতরের ঠাট্টা টুকু বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। এখন ফিরাইয়া বলিলেন, “ওবিষয়ে বৈবাহিক মহাশয়ের যেরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিবে তাঁহাই পূরণ করা আবশ্যক।”

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। নিজেদের যাহা খরচ হইবে অনাথবন্ধু তাহার ফর্দ্দ করিলেন।

মহামায়ার গহনা হইতে একখানি রজনীর বৌএর জন্য ও একখানি সত্যনাথের বৌয়ের জন্য রাখা হইল। কিরণশশী নিজের গহনার এক এক খানি সত্যনাথের ও তাহার ছোট দুই ভাইয়ের এবং দুইখানি নিজের পালিত ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তোষের জন্য রাখিতে চাহিলে মহামায়া ঐমত গহনা বাছিয়া দিলেন। বক্রী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের তিন খানি প্রদোষের বৌএর জন্য ফর্দ্দ ভুক্ত হইল।

নলিনী দুই বৌকে যে দুইখানি গহনা দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া পাঠাইলেন। সংসার মৃতা স্ত্রীর গহনার মধ্যে কোন্ দুই খানি দুই বৌকে দিতে হইবে নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইলেন।

অনাথবন্ধু নূতন দুইখানি গহনা গড়িতে দিলেন, ও যে সকল গহনার এইরূপে ঠিকানা হইল সেইগুলির উল্লেখ করিয়া হবু বৈবাহিকদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"এ ফর্দ্দ পাঠানর অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—এক রকমের দুখানা করিয়া না হইয়া পড়ে। আর এক কথা বলা হয় নাই। অনেক বাড়ীতেই এখন সোণার গোট ও চন্দ্রহারের ফ্যাসান উঠিয়াছে, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে কোমরের নীচে সোণার ব্যবহার হয় না।"

সত্যনাথের বিবাহ যে বাড়ীতে হইতেছে, তাহারা প্রদোষের হবু শ্বশুরের অপেক্ষা বহুলপরিমাণে সচ্ছল

অবস্থাপন্ন, সুতরাং গহনা প্রভৃতি অধিক দিবার সম্ভাবনা, অনাথবন্ধু বাড়ীতে এ কথা একটু বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

কিরণশশী উদ্দেশ্য বুঝিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "বড় মানুষের মেয়ে অধ্যাপকের স্ত্রী হইতে চলিল। উহার এ সময়ে যদি বেশী না হয়, তবে আর কখন হইবে ?"

কিরণশশী তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে দেখাইলেন যে, ক্ষুদ্র হিংসাদি তাঁহার মনে আর স্থান পায় না এবং ভাগুরের কোন কার্য্যের ত্রুটি খুঁজিতে প্রবৃত্তি নাই।

কিরণশশী এক দিন স্পষ্টই বলিলেন, "যাহার যেখানে ভবিতব্য ছিল, সেইখানেই বিবাহ হইতেছে। যদি প্রথমে পল্লীগ্রামের মেয়েটির খবর আসিত, তাহা হইলে ত সত্যনাথেরই সেখানে বিবাহ হইত !"

অনাথবন্ধু ইংরাজী বাজনা, আলোকমালা বা পতাকাদির হাঙ্গামা কিছুই করিলেন না। দেশীয়ের পরিচালিত একটি আড়গড়া হইতে একখানি ভাল গাড়ি মাত্র আনাইয়াছিলেন। মফঃস্বলের বিবাহে প্রদোষের জন্ত তাঞ্জাম স্থির হইয়াছিল। কলিকাতায় বরযাত্র প্রায় ৫০।৬০ জন হইল। মফঃস্বলে ২০ জন মাত্র।

বিবাহের উপলক্ষে কিছু সামাজিক বাসন বিতরণ করা হইল। এখন অনেকে আইবুড়ো ভাত দেওয়া একটা "ট্যাক্‌স" মনে করেন। সেই বিশ্বাসে কোন কোন

কর্ম্মকর্ত্তারা উপযুক্তরূপ নিমন্ত্রণই করেন না। কিন্তু কিছু জিনিস দিয়া আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করাই ভাল বলিয়া অনাথবন্ধুর বোধ হইল।

সামান্য সামাজিক বিতরণ, কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটকদিগকে দশ পাঁচ টাকা দেওয়া, বিবাহের প্রধান ভার নয়। আতসবাজী, আলোকমালা, ইংরাজী বাজনা, মদ, মুর্গী এই সকল দিকেই আজ কাল বেশী খরচ হয়। গায়ে হলুদের ব্যাপারে আজকাল একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডের ফ্যাসান উঠিয়াছে; অনাথবন্ধু তাহার দিকেই গেলেন না। সোণা রূপার পুতুলে খরচ করা অপেক্ষা কাঁশা পিতলের বাসন দেওয়া ভাল মনে করিলেন।

একে একে দুই বিবাহই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। বরেদের 'বাজার-দর' সকলের জানা। সুতরাং কন্যাকর্ত্তারা চক্ষু লজ্জায় নিতান্তই সামান্য রূপে কাজ সারিতে পারিলেন না। তবে অনাথবন্ধুর অকপট ব্যবহারে তাঁহাদের খারাপ জিনিস দিতে বা কথার খেলাপ করিতে হইল না এবং প্রাণ লইয়া টানাটানি ব্যতিরেকেই কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

মহামায়া ও কিরণশশী দুজনেরই বেশ বৌ মনে ধরিল। রজনী বৌ দেখিল না বলিয়া অনাথবন্ধুর চক্ষে জল আসিল। পিতা মাতা—নাতবৌ দেখেন নাই। তাঁহারা থাকিলে আজ সত্যনাথের এবং প্রদোষের বৌ দেখিয়া কতই সুখী হইতেন একথা অনেকেবারই মনে হইল।

কিরণশশীর ও মহামায়ার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ছেলে বৌএদের জন্ত যে শুভাকাজ্ঙ্কা উঠিল, তাহা শিক্ষা ও অভ্যাসানুযায়ী পথে বহু সহস্র জপ, ও গরীব দুঃখীকে কাপড়খানা টাকাটা সিকেটা এইরূপ দানের মূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

কুটুম্ব বাড়ীর সকল জিনিসের ও ব্যবহারের প্রশংসা অনাথবন্ধুর যত্নে তাঁহার পরিবার মধ্যে অতি সুস্পষ্ট রূপেই হইতে লাগিল।

যাঁহারা মেয়ে দেন তাঁহারা সাধারণতঃই নম্র থাকেন। তাঁহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য আরোপ করিয়া পিশুনবাদীদিগের প্রশ্রয় দেওয়া এবং সেই উপলক্ষে নব পরিণীতা বালিকাদিগের সমক্ষে পিতামাতার নিন্দা করিয়া অনর্থক তাহাদিগের মনে কষ্ট দেওয়া একান্ত নীচতার ও ভবিষ্যতে অনেক দুঃখের কারণ।

অনাথবন্ধু সযত্নে পরিবার মধ্যে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে নববধুদের মনে শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধীয় প্রথম ছবিটিতে কাঠিন্য, লোভ, কলহ এবং অন্যায্য ব্যবহার প্রভৃতির ছায়া না পড়িয়া উদারতা, পর-যশ-প্রিয়তা ও সদয় সযত্ন ব্যবহারের ছাপ পড়াই কি পারিবারিক ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল নয়? বাড়ীর সকলেরই মন ভাল ছিল সুতরাং কপটতা ব্যতিরেকেই ঐরূপ ব্যবহার হইতে পারিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কন্যার বিবাহ।

অনিন্দিতমপক্ষয়ং জ্ঞাত্বাপি ন নিবর্ত্ততে।
তেন কিমন্যতো গ্রাহ্যমন্যায্যং যদু বিবেচিতং ॥

দুই ছেলের বিবাহের অল্প দিন পরেই অনাথবন্ধু একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাইলেন।

ছেলেটি গণিতে ও বিজ্ঞানে এম এ পাস করিয়াছে, প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ স্থাপিত বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিবে। বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় হয়।

পিতা কলিকাতায় একটি অফিসে কাজ করেন। মাহিনা ১০০৲ টাকা। দুইটি মেয়ের বিবাহে তাঁহার তিন হাজার টাকা দেনা হইয়া জীবনবীমার কাগজ বাঁধা পড়িয়াছে।

তিনি বেশ লম্বা ফর্দ্দ দিলেন। পাঁচ হাজার টাকা নগদ। মেকেবের ঘড়ি। ৮০ ভরি সোনা। রূপার দান সামগ্রী।

সমস্ত অবস্থা শুনিয়া অনাথবন্ধু প্রদোষকে আলাদা বলিলেন "দেখ আমি যে জীবনবীমার বিরোধী তাহা কি অকারণ? জীবনবীমা করিলে লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া অসংযত খরচ করিতে অভ্যাস করে—সঞ্চয়শীলতা যায়; গৃহস্থের প্রধান গুণের—সংযমের—চর্চ্চা ছাড়ায় নৈতিক

অবনতি ঘটে, আর শেষে একটা আগন্তুক খরচার জন্ম জীবনবীমাও বাঁধা পড়ে। পরিবারের জন্ম প্রকৃতপক্ষে কোন সংস্থানই করা হয় না। ফিরিঙ্গির ধরণে যত আয় তত ব্যয় হইয়া পড়ে। বাঁধা দেওয়ার অমন যোগাড় না থাকিলে কাজেই অপেক্ষাকৃত কম খরচে বিবাহ সারা হইত। বেশী টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিলেই যে কন্যার সুখ হয়, আব পল্লীগ্রামে গরিবের ঘরে দিলেই যে সুখ হয় না তাহা ত নহে।”

প্রদোষ বলিল “অবস্থা অনুসারে পাত্র লওয়া একান্ত আবশ্যক। চাকুরে মানুষদিগের দেনা করিয়া পরিবার-দিগকে জড়াইয়া ফেলা বড়ই বিষম কথা। মানুষের প্রাণ কখন আছে কখন নাই।”

প্রদোষের কথায় রজনীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা অনাথবন্ধুর মনে পড়িল। শেষের কথাটা বলিতেই জেঠা মহাশয়ের মুখে বিষাদ চিহ্ন আসিল দেখিয়া প্রদোষেরও সেই কথা মনে হইয়াছিল।

অনাথবন্ধু বুঝিতে পারিলেন এবং কথা ফিরাইয়া লই-বার জন্ম বলিলেন—

“সে যাহা হউক, এ ছেলে খুব ভাল। কিন্তু বাপের নগদ টাকার একান্ত প্রয়োজন। এদিকে আবার কন্যার পিতার প্রদত্ত বিবাহের উৎসর্গীকৃত নগদ টাকা বরের বাপের লওয়া—একান্তই বিসদৃশ ব্যাপার। এবিষয়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।”

সংসারকে লিখিয়া পাঠাইলেন "সত্যনাথ ও সন্তোষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তোমার নিজের ও তাহাদের কি মত জানাইবে।"

প্রদোষের সহিত এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিলে প্রদোষ বলিল "বরের বাপের নিজের জন্য টাকা লওয়া অন্যায়। কিন্তু এখন অনেকেই লইতেছে। আর সুশীলার বিবাহের জন্য যে লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছে মোটের উপর তাহাও এখনকার কালের পক্ষে একান্তই অতিরিক্ত নয়। অমন ছেলে কোথা পাওয়া যাইবে? আমাদের বংশে মেয়ে কম হওয়ায়, আর ছেলেরা ডাগর হইলে মেয়ের বিবাহ হওয়ায়, আমরাত মেয়ের বিবাহে একটু বেশী খরচই করিয়া থাকি! পিসিমার বিবাহেতে তখনকার যথা সর্ব্বস্ব দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই শুনিয়াছি!"

অনাথবন্ধু প্রীতিপূর্ণ নয়নে প্রদোষের মুখের দিকে চাহিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নিজের যৌবন কালে পিতাকে ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। পিতা মাথায় হাত দিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন সেই স্পর্শ সুখ যেন আবার অনুভব করিলেন। তিনিও প্রদোষের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "পুরুষানুক্রমে যেন মন উদার থাকে। যেন পূর্ব্ব পুরুষ দিগের কার্য্যের প্রতি সভক্তিক দৃষ্টি থাকে। তাঁহাদের খুঁত ধরিয়া বাহাদুরী করিতে যেন কখন প্রবৃত্তি না হয়! তুমি সকল বিষয় তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর দেখিয়া

বড়ই প্রীত হইলাম। সকল লোকের পক্ষে এক ব্যবস্থা খাটে না। যাহাদের মেয়ে বেশী, আয় কম, ছোট ছোট ছেলে—তাহাদের এমন পাত্রে মেয়ে দেওয়া উচিত যেন অধিক খরচ না হয়।”

কাশী হইতেও ঐ ধরণের উত্তর আসিল। “বরের বাপের টাকা লওয়া উচিত নয়। তবে প্রথা যখন উঠিয়াছে, ছেলে ও ঘর যখন ভাল, তখন টাকা দিলেও হানি নাই। ‘দায়ে পড়িয়া দান’ মনে করা যায়।”

অনাথবন্ধু কন্যাকে তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ লিখিয়া দিতে রাজী হইলেন কিন্তু কন্যার শ্বশুরকে দিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না।

পাত্র একদিন সহপাঠী দুই চারি জনের সঙ্গে আসিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া গেল। অনাথবন্ধু তখন কাছারী গিয়াছিলেন। প্রদোষ পাত্রটীকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। শুভ দৃষ্টির পূর্ব্বে যে পাত্র কন্যাকে দেখে বা কন্যা পাত্রকে দেখে তাহা অনাথবন্ধু ভাল বাসেন না বলিয়া প্রদোষ জানিতেন। কিন্তু ছেলে আসিয়াছে তাহাকে কি করিয়া ফেরত দিবেন? প্রদোষ সেই জন্য পাত্রকে যেন চিনিতেই পারিলেন না এই ভাব দেখাইয়া সকলেই যেন পাত্রের বন্ধু এইরূপ ব্যবহার করিলেন।

প্রদোষ অনাথবন্ধুকে পরে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। বাড়ীর অপর কাহাকেও বলেন নাই। বরের বাড়ীর এক ঝি একদিন মেয়ে দেখিয়া গেল। সে বলিল যে পাত্র মেয়ে

দেখিয়া গিয়াছে। পছন্দ হয়েছে। কিন্তু যাহারা আসিয়াছিল তাহার মধ্যে কোনটী যে পাত্র প্রদোষ তাহা প্রকাশ না করায় অনাথবন্ধুর বাড়ীর কিছু কেহ স্থির বুঝিতে পারিল না।

অনাথবন্ধুর এক একবার মনে হইতেছে, 'না হয় বরের বাপকেই টাকাটা দিই। মেয়ে সুখে থাকবে। ছেলে ভাল। ছেলের বাপও মানুষ মন্দ নয়, তবে মেয়ের বিবাহ দিয়া ঋণগ্রস্ত হওয়ায় অগত্যা ভাল ছেলের বিবাহ উপলক্ষে সেই টাকা তুলিতে ব্যস্ত। ও অবস্থায় নিজেরও হয়ত মন ঐরূপ হইত।'

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল "টাকা গহনা কন্যার পিতা যাহা দেন তাহা স্ত্রীধন হইবারই কথা। আমি বৌয়ের প্রাপ্য টাকা নিজে লইয়া ছেলে বৌএর চক্ষে এবং নিজের মনে অত ছোট হইতে পারিতাম না। কন্যাকে "ধন রত্ন সমন্বিতা" দান করিবার জন্য শাস্ত্রের আদেশ। যেমন বৌএর গহনা গুলি খুলিয়া লওয়া অতি ছোট লোকের কাজ, বৌয়ের বাপের দেওয়া টাকাটা নিজে লওয়া কতকটা সেই ধরণের।"

তিনি নিজের ছেলের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে কিছু মাত্র কামড় করেন নাই এবং যাতায়াত বা "গণের" টাকা এবং কৌলিন্য অনুসারে নির্দ্ধারিত পণের কয়েকটি টাকা ব্যতীত কিছুই নিজের খরচ করিতে অধিকার আছে বলিয়া মনে করেন নাই।

কথাবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া আসিল। সোণার ঘড়ি চাই না। তবে ৩৩০০৲ টাকা বরের বাপকে নগদ এবং মেয়েকে দুই হাজার টাকার গহনা দিতে হইবে; দান সামগ্রী যেমন ইচ্ছা দিবেন। বরের বাপ বাড়তী কিছু চান না, কিন্তু মেয়ের বিবাহের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া যেটা বাড়তী দেনা দাঁড়াইয়াছে, সেটা ছেলের বিবাহে শোধ হওয়া চাই এবং বৌএর গহনা এবং বিবাহের সামান্য খরচও আসা চাই।

বরের বাপ বলিলেন, "ছেলের বিবাহে অনাথ বাবু যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই সকলের অনুকরণীয়। কিন্তু আমার উপর দুজনে যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আমার এক জনের উপর অত্যাচার না করিয়া উপায় নাই।"

অনাথবন্ধুর প্রতি বরকর্ত্তার একান্ত শ্রদ্ধা হইয়াছিল। উঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হয় এটা তাঁহার খুবই ইচ্ছা হইল। অন্য এক জায়গা থেকে তাঁহাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে মেয়ে দেখিতেও গেলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন "অন্য স্থানে কথা বার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইয়াছে।"

অনাথবন্ধু শেষের এই সংবাদ পাইয়া বরের বাপকে নগদ টাকা দিতে রাজী হইলেন। দেখিলেন লোকটার অর্থলোভ ত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহারও শ্রদ্ধার উদয় হইল এবং মনে করিলেন এরূপ লোক হয়ত অবস্থার

উন্নতি হইলে পুত্রবধূর টাকা ফিরাইয়া দিয়া ফেলিতেও পারেন।

অনাথবন্ধুর এক মেয়ে বই নয়। এখনকার কালে অমন পাত্র মোট ছয় হাজার টাকাতেও কোন কোন বৎসরে শস্তা বলিয়াই ধরিতে হয়। তিনি ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া সমস্ত স্বীকার করিলেন—বিবাহের দিনও স্থির হইল।

অনাথবন্ধু বলিলেন "আমার সুশীলার অনেক পুণ্য যে এমন ঘরে এমন পাত্রে সম্বন্ধ হইল। লক্ষ কথা না হইলে না কি বিবাহ হয় না, তাই দেনা পাওনার কথায় একটু গোল হইতেছিল, কিন্তু আমাদের ও বিষয়েও মতের অমিল গোড়া হইতেই ছিল না। ফর্দ এখনকার দিন কাল হিসাবে কেহই অতিরিক্ত মনে করেন নাই। আমিও প্রথম থেকেই অনেকটাই স্বীকার। আপনার মেয়ে জামাইকে কিছু দিতে সকলেরইত সহজেই ইচ্ছা হয়, আর আমাদের বাড়ীতে সবে ঐ এক মেয়ে। তার পর আপনার বৌ হলে আপনিই উহাকে কত সব দিবেন।"

বরের বাপ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে অনাথবন্ধু ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে গোল হইতেছিল শুধু নগদ টাকাটা লইয়া। উহা আমার মেয়েরই পাওনা। ওটা আপনার একরূপ বৌএর কাছে ধার থাকিল—সময়ে শোধা উচিত। তিনিও মনে মনে তাহাই করিবেন স্থির করিতেছিলেন।

প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনি যেমন ছেলেদের বিবাহে ব্যবহার করিলেন এখনকার কালে তাহা কেহ করে

না। আপনার ধন আছে, সুখ্যাতি আছে, বংশ মর্য্যাদা আছে, আর ছেলেরা এক একটি রত্ন! আপনি যেমন ব্যবহার করিলেন অন্যে তাহা করিলে আমার দুই মেয়ের বিবাহে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতাম না। সকলে ভাল হইলেই চলে। নচেৎ বড়ই কঠিন ব্যাপার।”

অনাথবন্ধু কিছু বলিলেন না। মনে হইল যে ‘সকলে ভাল না হইলে ভাল হইবার চেষ্টা করিব না’ এটা সাধারণ ধর্ম্মভঙ্গ পণ নয়!

উপস্থিত একজন ভদ্রলোক বলিলেন, “আপনিও ত তেমন বেশী চাহেন নাই। সেদিন ছয় হাজার টাকা নগদ ও নব্বই ভরি সোনার কথা বলিয়া যোড়াসাঁকো হইতে সাধাসাধি! আপনি বলিলেন ‘না মেয়ে দেখিতে যাইব না। কথা এক রকম স্থির হইয়া গিয়াছে।’ তখন কথা ত স্থির হয় নাই, আর হইলেই কি এখনকার কালে লোকে ওরকম করে? ছেলে যেমন তাতে আপনি দশ হাজার চাইলে চাইতে পারিতেন। তা এ যে সম্বন্ধ হইল এ খুব ভাল হইল। বাবুর একটু বঙ্গবাসী ধরণ—দেশী জিনিসে অতিরিক্ত ভক্তি—ইংরাজী নবিশে সে-কেলের চেয়েও কিছু বেশী বেশী গোঁড়ামি।—কিন্তু অমন ভদ্রলোক কখন দেখি নাই। এখানে কাজে কথায় তফাত নাই!”

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জলাশয় ফণ্ড।

জলকষ্টাধিকং যস্মাৎ অন্যকষ্টং ন বিদ্যতে।
ততঃ কূপতড়াগাদি প্রদানং সুফলপ্রদং॥

আরও পাঁচ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। অনাথবন্ধু এবং মহামায়া এক্ষণে বারাণসী ধামে সংসারের বাসায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

সংসারের পুত্রের এবং অনাথবন্ধুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের বিবাহের পর, সংসার সন্ন্যাস গ্রহণে ব্যগ্র হইলে অনাথবন্ধু তাঁহাকে লেখেন, "আমার সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য বাকী আছে। আমি কাশী যাইতেছি। শাস্ত্র কথা শুনাইতে হইবে।"

কিরণশশী আজও কলিকাতায় আছেন। প্রদোষের ছেলে তাঁহার বড়ই নেওট।

মহামায়া কাশী আসিবার সময় কিরণশশীও সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মহামায়া তাঁহাকে বলিয়া আসিলেন "আরও দশ দিন তুমি সংসার দেখ প্রদোষের বড়ই ইচ্ছা। সে তোমাকে 'কাশী যেও না' একথা খুব জোর করে বল্‌তে পারে না; আমাকে বলিয়াছে,"জেঠাইমা তুমি যদি একান্তই ছেড়ে চলে যাকে আরও দুপাঁচ বছর থেকে যেতে বল। কাশী না গেলেই কি নয়?"

মহামায়া প্রদোষকে বলিয়া আসিলেন "ভগবান আমাদের যেমন দিয়েছেন তোমাদেরও যেন তেমনি ছেলে মেয়ে দেন। তোমরাও সময়ে সবাইকে গুছিয়ে দিয়ে কাশীতে চলে যেতে চাইবে। এখন মাঝে মাঝে তোমরা ত সেখানে আমাদের দেখিতে যাইবে ?"

অনাথবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যনাথ ফরাশডাঙ্গায় গঙ্গাতীরে একটি টোল করিয়াছেন। অনেকগুলি ছাত্র ন্যায়, স্মৃতি ও বেদান্ত পড়িতেছে। তাঁহার পবিত্র আচার এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ ও ভক্তি পরিষিক্ত করিতেছে। পবিত্র চরিত্র অধ্যাপক পণ্ডিতের ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত রক্ষক আর কেহই নাই।

দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারি পাস করিয়া এবং কারখানায় হাতে হেতেরে অতি উৎকৃষ্টরূপ কার্য্য শিখিয়া, দেশীয় মূলধনে পরিচালিত কলিকাতার নিকটস্থিত একটি চটের কলে সহকারী অধ্যক্ষ এবং পরিদর্শকের কার্য্য করিতেছেন। অধ্যক্ষ একজন বোম্বাই প্রদেশীয় মুসলমান।

তৃতীয় পুত্র ভক্তিচরণ এখন পাটনায় উকীল। জামাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন।

নলিনী এবং আনন্দনাথের ইচ্ছা শীঘ্রই অনাথবন্ধুর ও মহামায়ার ন্যায় কাশীতে গিয়া বাস করেন, কিন্তু সংসারের ঝঞ্চাটে যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না।

তাঁহাদের বড় ছেলেটি বেশ কাজের লোক হইয়াছে— বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছে। মফঃস্বলে জলাশয় খনন এবং

পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার জন্য অনাথবন্ধু ও আনন্দনাথ যে সমিতির স্থাপনে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন—আনন্দনাথের পুত্র এখন তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী সভ্য।

সমিতির মূলধন অনেক বাড়িয়াছে। একজন মুসলমান, দুইজন মাড়োয়ারি, একজন সুবর্ণবণিক, দুই জন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ ভদ্রলোক কেহ বা জীবদ্দশায় কেহ বা মৃত্যু-কালে উইলদ্বারা অনেক টাকা ঐ ফণ্ডে দিয়া গিয়াছেন।

স্থানীয় লোকে অন্যূন সিকি চাঁদা তুলিলে সমিতি হইতে অবশিষ্ট টাকার সাহায্য করা হয়। স্থান বুঝিয়া কোথাও বার আনা খরচা চাঁদা করিয়া তুলিলে তবে সাহায্য করা হয়। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া এখন অনেক বড় বড় দীঘিরও পঙ্কোদ্ধার হইতেছে।

নূতন পুষ্করিণী খনন প্রায়ই করিতে হয় না। যেখানে জল কষ্ট বোধ হয়, সেখানে অন্ততঃ একটা ডোবাও আছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার। ময়লা জল পরিষ্কার এবং ভাল জল আনা একই কার্য্যের দ্বারা হয়, অথচ অপেক্ষাকৃত কম খরচা পড়ে।

সমিতির রিপোর্ট সকল মিউনিসিপ্যালিটীর ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বরের নিকট পাঠান হয় এবং তাঁহারা কিছু চাঁদা দিউন আর নাই দিউন, তাঁহাদিগকে জলকষ্ট নিবারিণী সভার সভ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সভ্য হইতে গেলে কেবল একটি স্বীকৃতি পত্রে সহি করিতে হয় মাত্র—"জলকষ্ট নিবারণ চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।"

এখন প্রায় সকল জেলাবোর্ডে ও মিউনিসিপালিটিতে প্রতিবৎসরই দেশীয় ইয়ুরোপীয়, সরকারী ও নির্ব্বাচিত নির্ব্বিশেষে সকল সভ্য একমত হইয়া অনেক টাকা ইন্দারা ও খাল কাটাই জন্য মঞ্জুর করেন।

'সাধারণে জল ব্যবহার করিতে পাইবে' জলাশয় সমিতির সাহায্যকালে ইহা ছাড়া অন্য কোন সর্ত্ত স্বীকার করান হয় না। কিন্তু জেলা বোর্ডের সাহেব মেম্বরগণ, ডাক্তারগণ ও সাধারণতঃ ইংরাজী শিক্ষিতেরা পুষ্করিণীর সম্পূর্ণ স্বত্ব গ্রহণ না করিয়া টাকা দিতে চান না। মাছের আয়ের দিকেও লোলুপ দৃষ্টি! জল ময়লা হওয়ার ভয়ও বড় বেশী। কাজেই ইন্দারার দিকেই উহাঁদের ঝোঁক অধিক। কিন্তু সকল জেলার লোকেত ইন্দারার জল খায় না! উহাঁরা সাধারণতঃ সে সব কথা শোনেন না। এবং এই ছুতায় বড় বড় দীঘির পঙ্কোদ্ধারেও হাত দিতে হয় না বলিয়া কেহ কেহ নাকি মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট!

কিন্তু কোন জেলায় দেশীয় সভ্যেরা বিশেষ যত্ন করিয়া একবার কোন উদার হৃদয় কালেক্টরকে বুঝাইতে পারিলে খুব বড় বড় প্রাচীন দীঘিরও পঙ্কোদ্ধার হইয়া যায়। কালেক্টরদিগের মন হইলে উহাঁরা কখন বা চাঁদা তুলিয়া, কখন বা দুই তিন বৎসরের টাকা একত্রে রাখিয়া ঐ সকল বৃহৎ কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্পত্তি বিভাগ।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

তন্তুদেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

অনাথবন্ধু কাশী যাইবার পূর্ব্বে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

প্রদোষের সাবালক হইবার পর তাহার ও সংসারের সহিত পরামর্শ করিয়া এক সময়ে অনাথবন্ধু মফঃস্বলের একটি জমিদারকে অনেকগুলি টাকা ধার দেন। সেই সময়ে রজনীর অংশের যে টাকা সুদে বাড়িতেছিল সে সমস্তই নিজের টাকার সহিত ঐ কার্য্যে খাটাইয়াছিলেন।

দলিলখানি নিজের ও প্রদোষের নামে করিতে চাহেন কিন্তু প্রদোষ তাহাতে আপত্তি করে। দলিল অনাথ-বন্ধুর নামেই হইল, কিন্তু সেই দিনই তিনি উইল লিখিয়া রেজেষ্টরি আফিসে রাখিয়া আসেন যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সংসারের ও প্রদোষের সহিত এজমালী এবং প্রদোষ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিছুকাল পরে জমিদারটী টাকা শোধ করিতে পারিয়াছিলেন। অনাথবন্ধু তাঁহাকে কিছু সুদ ছাড়িয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ মহাজনকে 'পুরা সুদখোর' হইতে নাই। হয় কম সুদে টাকা দিতে হয়, নয় সুদ ছাড়িতে হয়। নচেৎ ব্রহ্মতেজঃ লোপ হইয়া যায়—অনাথবন্ধুর ইহা দৃঢ় বিশ্বাস।

টাকাটা ফেরত পাইলে অনাথবন্ধুর নামেই কোম্পানির কাগজ কেনা হইল।

প্রদোষের রোজগারের টাকাও প্রদোষ সমস্তই জেঠা মহাশয়ের হাতে আনিয়া দিত। অনাথবন্ধুর নিজের ছেলেরাও যাহা পাইত আনিয়া দিত। তিনি একমালী হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা। প্রত্যেক ছেলেদের ও বৌএদের খরচের জন্ত প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতেন। ছেলেদের যাহার যাহা আয়. তাহা সমস্তই তাঁহার সংসার খরচের খাতায় জমা হইত।—"বাসা খরচ বাবদ" বলিয়া সেই খাতাতেই খরচ বাদ পড়িত।

অনাথবন্ধু কাশী যাইবার পূর্ব্বে যখন বিষয় ভাগ করিয়া দিলেন, তখন এক হাজার টাকা "জলাশয় ফণ্ডের" জন্ত রাখিলেন। বাকী যাহা রহিল তাহার এক তৃতীয়াংশ সংসারের পুত্রকে, এক তৃতীয়াংশ প্রদোষকে এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিজের তিন পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন।

প্রদোষ ভাবিল "মাতার টাকা বাড়িয়া আমার আলাদা আছে। আবার একমালি সম্পত্তির তৃতীয়াংশ বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ১৮ হাজার টাকা দিলেন। আমার নিজের ২৫ হাজার হইল, খুড়তুতা ভাইয়ের ১৮ হাজার হইল ;

শুধু জেঠতুতা ভাইয়েদের ৬ হাজার করিয়া হইল—অথচ জেঠা এতটা উপার্জ্জন করিলেন!”

এই বৈষম্যের উল্লেখ করিলে অনাথবন্ধু হাসিয়া বলিলেন “তোমার যদি অনেকগুলি ছেলে হয়, আর সত্যনাথের যদি একটি হয়,তবে তাদের সমান সমান হইবে।”

তার পর সজল নেত্রে বলিলেন “যদি যৌবন কালেই আমার ডান হাত ভেঙ্গে না যেত—যদি রজনী থাকিত—তবে আজ তোরা সকলেই বড়মানুষ হইতিস্। ১০।১৫ হাজার টাকার কম বেশী চক্ষে ঠেকিত না।”

প্রদোষ আর কিছু বলিতে পারিল না। জেঠামহাশয়ের কথায় বুঝিল যে তাহার সহোদর ভাই থাকিলে কিছু ভাগে টাকা কম পড়িত বটে, কিন্তু ভুবনে যে জিনিস একান্তই দুর্ল্লভ সেই জিনিস—প্রীতিপূর্ণ সহোদর ভ্রাতা পাইত। তাহার নিকট অর্থ অতি তুচ্ছ বস্তু! সত্যনাথেরা সহোদর তিন ভাই বলিয়াই ভাগে কম হইল—সুতরাং তাহা ক্ষোভের কথা নয়। প্রদোষ আরও বুঝিল যে জেঠামহাশয় বলিলেন যে, তাহার পিতার উপার্জ্জন ক্ষমতা অধিক ছিল। তিনি থাকিলে তিনিও নিজের উপার্জ্জন আলাদা রাখিতেন না। তিনিও এজমালী সংসারে টাকা ফেলিতেন—সকলেই অধিক টাকা পাইত।

প্রদোষ জেঠামহাশয়কে কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু মাতার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিল।

কিরণশশী বলিলেন “বাবা প্রদোষ! তোমার জেঠা-

মহাশয় তোমাকে বরাবর শিখাইয়াছেন যে,যদি কোন কাজ ভাল হইল না বলিয়া মনে হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা শুধরাইবার উপায় দেখিবে। এটা শুধরাইবার কি উপায় দেখিতেছ ?”

প্রদোষ বলিল “জেঠামহাশয় করিতেছেন—আমি ত উঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে পারিব না ! কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছি না।”

কিরণশশী এক সময়ে পুত্রের অংশের টাকা অধিক হয় এই ইচ্ছায় কত না চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়াছিলেন ! আজ তাঁহার চক্ষে পুত্রের অধিক টাকা হওয়া এবং সত্যনাথের কম টাকা হওয়া অনুচিত ও অপ্রীতিকর !

তিনি বলিলেন “তোমার খুড়ামহাশয়কে সমস্ত কথা খুলিয়া লেখ। কেন তোমার জেঠামহাশয় সমস্ত সম্পত্তি এজমালী করিয়া ফেলিলেন তাহা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, সে কথা বল। তাঁহার পুত্রও বেশী পাইতেছে। তিনিও এরূপ ভাগ করা উচিত মনে করিবেন না। তুই আর সন্তোষ আমার বড় আদরের। কিন্তু সত্যনাথও আমার পেটের ছেলের মতন। তার অপেক্ষা তোদের বেশী পাওয়া আমি প্রার্থনা করি না। বিশেষ সে গেল ধর্ম্ম কার্য্যে। তার টাকা কম হওয়া টোলের ছেলেদের অন্নমারা !”

প্রদোষ পিতৃব্য সংসারকে লিখিয়া পাঠাইলেন “আমাদের সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হইয়াছিল। এক হাজার আলাদা রাখিয়া জেঠা মহাশয় আঠার হাজার করিয়া সন্তোষকে আমাকে দিলেন। দাদা, জ্ঞানচন্দ্র এবং ভক্তি-

চরণকে ছয় হাজার মাত্র করিয়া দিলেন। আমার ও সন্তোষের চারি হাজার করিয়া টাকা কোম্পানির কাগজের সুদে দশ হাজার হইত। সেই পরিমাণ আমাদের দিলেই বেশ হইত। তাহাতে প্রায় সমান ভাগই দাঁড়াইত। আমরা পাঁচ জনেই যেন সহোদর ভ্রাতা জেঠামহাশয় এইরূপেই ত পালন করিয়াছেন!

"পিতামহ ঠাকুর কাগজ ভাগ করিয়া দেওয়ার পর হইতে আমাদের টাকা আলাদা ছিল। আমি দু এক টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথমের টাকা ৺ ঠাকুর পূজা, মার একটা ব্রত, জেঠাই-মার একটা ব্রত, এইরূপে খরচ হয়। তাহার পর নিয়মিত যখন কিছু আসিতে থাকিল, তখন আমি আনিয়া দিলে একদিন বাক্‌সের আলাদা গেবেতে রাখিয়াছিলেন। একটু চিন্তিত দেখিলাম। তখন কিছু বুঝিতে পারি নাই। আজ তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। ইহার পরেই অনেক টাকা ধার দেওয়ার জন্য আবশ্যক বলিয়া আমার পৈতৃক অংশের টাকা ও আপনার টাকা একত্র করিয়া লইলেন। আপনার অংশের টাকা আপনার কাছে ছিল আমার অংশ সম্পত্তি মার কাছে ছিল। পিতামহ ঠাকুরের সময় যেমন কলিকাতায় ও কাশীর বাসার খরচ সংসারিক খাতায় উঠিত, অনেককাল সেরূপ উঠে নাই। তবে মাসকাবারি হিসাব আপনি পূর্ব্বমত পাঠাই-তেন। এই সময় হইতে মাসকাবারি হিসাবটা জেঠা-

মহাশয় সংসারিক খাতায় লিখিয়াছেন। এ সব এখন বুঝিতেছি তখন লক্ষ্য করি নাই।

"আমার রোজগারের কয়টা টাকা হয় আলাদা রাখিতে হয়, না হয় নিজে নিয়া এজমালী সংসার করিয়া ফেলিতে হয়। জেঠামহাশয় আমাকে এত ভাল বাসেন যে আমার টাকা আলাদা করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেই জন্য কি দাদা এবং আমার ছোট দুই ভাই তাঁহাদের পিতার উপার্জ্জনের অধিকাংশ ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবেন? আমি যাহা বলিতেছি তাহা আইনসঙ্গত কি শাস্ত্রসঙ্গত তাহা জানি না, কিন্তু ঐরূপ সমান ভাগ করিয়া দেওয়াই যেন আমাদের পরিবারের পক্ষে উপযুক্ত।"

সংসার অনাথবন্ধুকে প্রদোষের কথা কিছু না বলিয়া লিখিলেন "আপনি বাড়ীর কর্ত্তা। ছেলে পাঁচটীই যেন সহোদর, এমনি উঁহাদের পরস্পরে ভাব। বিষয় সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিলেই সেই ধরণ থাকে। ইতরবিশেষ করিয়া দিলে সে ভাব যেন একটু কম দেখায়। সমান ভাগ করিয়া দিন।"

অনাথবন্ধু উত্তর লিখিলেন—"শাস্ত্রমত কার্য্য করিলে ইতরবিশেষ করা হয় না এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ সন্তান কাহার ক্ষোভ হয় না। ছেলেরা সকলেই ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান,সকলেই ঠিক বুঝিবে। সমান ভাগ করিয়া দিলে—প্রদোষের ও সন্তোষের অংশের প্রাপ্য টাকা সত্যনাথকে দিলে সে কি তাহা লইবে? সে তোমার শিক্ষায় হাড়ে

ছাড়ে হিন্দু এবং নিজে বড় ভাই বলিয়া তাহার যথেষ্ট মনে গুমোর আছে। আর তা ছাড়া আমি ভাগ করিয়া দিয়াছি। এখন ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই?"

সংসার প্রদোষের চিঠিখানি নিজ পুত্রকে দেখিতে দিলেন। আর বলিলেন, "তোমারও যদি ঐরূপ মন হয়, তবে ইহার উপায় স্থির কর।"

পরে সন্তোষে এবং প্রদোষে চিঠি লেখালেখি হইলে কিরণশশীর উপদেশ মতে দুজনেই অনাথবন্ধুর দেওয়া কোম্পানির কাগজগুলি সংসারের নামে লিখিয়া দিলেন।

সংসার তখন সত্যনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাদের লিখিলেন "আমি তোমাদের খুড়া—তোমরা কখন কিছু আমাকে দাও নাই। তোমরা যে কোম্পানির কাগজগুলি দাদার কাছে সম্প্রতি পাইয়াছ, তাহা তোমাদের কাছে নিঃস্বত্বে দান চাহিতেছি। একটি ভাল কাজের জন্য চাহিতেছি, দিতে পারিবে না কি?"

সকলেই বুঝিল, কোন বিশেষ মতলব আছে। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকলেই কাগজগুলি রেজেষ্টরি চিঠিতে সংসারের নিকট পাঠাইয়া দিল।

সংসার চুয়ান্ন হাজার টাকার কাগজ একত্র করিয়া দশ হাজার টাকার করিয়া পাঁচখানি নিজের নামে 'রিনিউ' করিলেন। কাহার কাহার কাগজ ছিল, তাহার চিহ্নও রহিল না। বক্রী চারি হাজার টাকা কাশীর বেদবিদ্যালয়ে "বিশ্বেশ্বর বৃত্তি" স্থাপন জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি নিজের

হৃদয় মধ্যেই পাইয়া পিতা মাতা ও মধ্যম ভ্রাতাকে স্মরণপূর্ব্বক দান করিলেন, এবং পাঁচখানি কাগজ পুত্রের ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের পাঁচ জনের নামে লিখিয়া দিয়া রেজেষ্টারি চিঠিতে উহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।

পত্রে লিখিলেন "তোমাদের দেওয়া টাকা হইতে চারি হাজার টাকা ৺বিশ্বেশ্বর বৃত্তিতে দিয়াছি। তোমরা আমাকে নিঃস্বত্বে দান করিয়াছিলে, এবং আমিও যে দান গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আমি ঐ টাকা হইতে নিজের ইচ্ছায় খরচ করিয়া দেখাইয়াছি। সুতরাং বক্রী টাকাও আমি যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ সন্তানকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের প্রীতিসহ দান করিলাম, তাহাতে কেহ যেন আপত্তি করিও না। আপত্তি করিলে বুঝিব আমাকে নিঃস্বত্বে দাও নাই। দেওয়া টাকা আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, তাহার উপর কতক অধিকার রাখিয়াছিলে। তোমরা পাঁচ জনে চিরকাল আপনাদিগকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মনে কর, স্বধর্ম্মে দৃঢ় থাক, এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

সত্যনাথও আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিরণশশীও অতিশয় তুষ্ট হইলেন। "কিরণশশীর ইচ্ছায় এবং প্রদোষের চেষ্টায়" এই ব্যবস্থা হইল শুনিয়া অনাথবন্ধু ও মহামায়াও সুখী হইলেন। সংসার লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রদোষের মত ছেলে হয় না।"

কিরণশশীর মনে পূর্ব্বেকার কথা এবং নিজের মনের পরিবর্ত্তনের কথা অনেক তোলাপাড়া হইল। স্বর্গগত

স্বামী তাঁহার এই কার্য্যে তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন স্বামী জ্যোতির্ম্ময়রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিতেছেন "আমার অকালমৃত্যুতে তুই ভাল হইলি। আমার কাছে আসিবার উপযুক্ত হইতেছিস্। আমি জীবিত থাকিলে—তোর পূর্ব্বের মত মন থাকিলে—আমাদের ইহলোকেই মনান্তর এবং পরলোকে অনন্ত বিচ্ছেদ হইত। ভগবান সবই ভালর জন্য করেন।"

অনাথবন্ধু আপনার খরচের জন্য কোন টাকা রাখেন নাই। ছেলেদের বলিলেন "শেষাবস্থায় পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখে বাস করাই শাস্ত্রের বিধি। তোমরা মাসে মাসে আমাকে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিও।"

প্রদোষ বলিল "তাহাতে কুলাইবে না। আমরা চার জনে অন্ততঃ দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

অনাথবন্ধু বলিলেন "না আমি বিবেচনা করিয়াই স্থির করিয়াছি। চারি জনে পাঁচ টাকা করিয়াই দিও।"

কাশীতে পৌঁছিলে প্রদোষ প্রথম মাসে কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিল। মনিঅর্ডর কুপনে লিখিয়া দিল "আমার পরম পূজ্যপাদ জেঠামহাশয়ের জন্য ৫৲ আর আমার জেঠাই মাতা ঠাকুরাণীর ১৫৲।"

প্রদোষ বেশ জানিত যে, অনাথবন্ধু যে পাঁচ টাকা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অধিক লইবেন না। নচেৎ উহার ইচ্ছা হইতেছিল মাসে ১০০৲ করিয়া পাঠাইয়া

দিয়া আপনার ভালবাসা দেখায়। কলিকাতায় প্রদোষের বেশ পসার হইতেছিল।

সত্যনাথ প্রথম মাসে কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিলে অনাথবন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন, "অর্থ সাচ্ছল্য বেশী থাকে ছাত্রসংখ্যা বাড়াও, পুঁথি কেন, কিছু সঞ্চয় কর। এখন আর চারি মাস আমাকে কিছু পাঠাইও না।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ২৫৲ ও ৩০ টাকা পাঠাইয়াছিল। তাহাদের এবং প্রদোষকে ঐরূপ মাসে পাঁচ টাকা মাত্র হিসাবে পাঠাইতে বলিয়া অনাথবন্ধু শেষে লিখিলেন "অধিক কখন আবশ্যক হয় জানাইব। তোমরা কয় ভাইত নিজেদের রোজগারের কিছু টাকা আমাদের শ্রাদ্ধের সময় জলাশয় ফণ্ডে দিবে? তাহাতেই তৃপ্তি হইবে। এখন টাকা সঞ্চয় করিলে তবেত ভাল কাজে দিবার ক্ষমতা হইবে। এখানে অধিক টাকার দরকার নাই। সংসারের বাসায় আহারাদির ব্যয় ছাড়া অন্য খরচ বড় হয় না, আর আমাদের সে খরচও নাই। সুতরাং কাশীতে কম খরচেই চলে। পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইলেই আমাদের দান ধ্যানের পক্ষে যথেষ্ট। সংসারের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে যে তৃপ্তি হয় এমন সুখ কিছুতেই হয় না। বড় দিনের ছুটীতে তোমরা এসে দেখে যেও আমার দিন কেমন সুন্দর কাটছে।"

প্রদোষ উত্তরে লিখিল "জ্যেঠাইমার কাছে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। একবার ৺পিতাঠাকুর কাশীর

বাসায় গিয়া ৺পিতামহ ঠাকুরের হাতে উপার্জ্জিত অনেকগুলি টাকা দিলে পিতামহী ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন 'হ্যাঁরে ওঁকে অত দিলি, আর আমি কি কেউ নই? আমাকে তীর্থ স্থানে খরচ করিতে কি দিলি?' তাহাতে পিতৃদেব পিতামহ ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইলে পিতামহ ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'তোর রোজগারের টাকা তুই ওঁকে হাতে করে দিলে যখন সুখী হবে তখন এই টাকা থেকেই তোর যা ইচ্ছা হয় নিয়ে হাতে করে দে। আর মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিস্।' তাহাতে পিতাঠাকুর পনরটি টাকা তুলিয়া লইয়া স্বীয় মাতার চরণে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। এই গল্পটি শুনিয়া অবধি সেই ছেলে বেলা থেকে সাধ ছিল যে, আমি যদি জেঠাইমার ও মাতার কাশীবাসের সময়ে উহাঁদের মাসে পনর টাকা করিয়া দিতে পারি তবে জীবনসার্থক জ্ঞান করিব। আপনার কথামত আপনাকে পাঁচ টাকা মাত্রই দিয়াছি।"

এই পত্রে অনাথবন্ধুর ও মহামায়ার যে কত সুখ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

ফলতঃ প্রদোষের কার্য্যক্ষমতা, ভক্তিপ্রবণতা ও উদারতার নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের পালনে যে তাঁহার ত্রুটি হয় নাই—অতি গুরু দায়িত্বের কার্য্য যে ভাল করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এই বোধে অনাথবন্ধু অনেকটাই আশ্বস্ত ছিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচারে যশ।

যমোযথা প্রিয়দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তকালে নিযচ্ছতি।
তথা রাজ্ঞা নিযন্তব্যা প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্॥

অনাথবন্ধুর বারাণসীতে অবস্থানকালে এক জন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত তথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। সাহেবটী যেমন পণ্ডিত তেমনি ধীরপ্রকৃতিক। যে কয়েকজন উদারচেতা ধার্ম্মিক ইংরাজের পুণ্যে এত বিত্তবশালিতা এবং এত নিরঙ্কুশ প্রতাপ সত্ত্বেও ইংরাজ অনেকটা খাঁটি থাকিয়া যাইতেছেন—স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁহাকে অনেকটা ন্যায়বিচারেই স্থির থাকিতে হইতেছে—সাহেবটী তাঁহাদের মধ্যেরই এক জন। কোথাও কোন প্রকার মারাত্মক ত্রুটি হইলেই এই সকল উন্নতচেতাদিগের তীব্র বিদ্রূপ এবং সারগর্ভ উক্তি জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়।

সাহেব এদেশাগত ইংরাজ এবং সাহেব-ঘেঁসা বাঙ্গালীর নিকট হইতেই অনুসন্ধান শেষ করিলেন না। দণ্ডীদিগের, পরমহংস ঠাকুরদিগের, এবং দেশীয় পণ্ডিতদিগের নিকট বিনীতভাবে যাতায়াত করিয়া এদেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মাবলীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সং-

সারের সহিত কথাবার্ত্তায় অনেক সংবাদ সহজে জানিতে পারিয়া পরম প্রীত হইলেন। সংসারও বহুদর্শী সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তায় অনেক কথা শিখিতে পারিলেন। দুজনে বিশেষ বন্ধুত্ব হইল।

অনাথবন্ধুর সহিতও নানা বিষয়ে সাহেবের কথাবার্ত্তা হইত। এক দিন কথায় কথায় সাহেব অনাথবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এদেশীয়দিগের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কি মত?"

অনাথবন্ধুর কখন মুখে এক মনে এক ছিল না। তিনি সরলভাবেই উত্তর দিলেন যে, এদেশে এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের থাকার যে একান্তই প্রয়োজন আছে তাহা ভদ্র ও শিক্ষিত লোকমাত্রেই বুঝেন। সাধারণ লোকে গবর্ণমেণ্টের বিষয় বড় ভাবেই না। তবে রাস্তা, ডাক, পুলিস প্রভৃতির বন্দোবস্তে এবং নবাবী আমলের শেষে একবার দেশে কিরূপ অরাজকতা হইয়াছিল তাহার প্রাচীন গল্প স্মরণে সাধারণ প্রজাও সন্তুষ্ট আছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিক্ষিত লোকে সত্য সত্য বৈদেশিক রাজত্বের প্রয়োজন মনে করা কি সম্ভব? অপর কোন দেশের লোকেত তাহা মনে করে না!"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "অপর কোন দেশের লোকত পরোক্ষদৃষ্টি, উদারহৃদয়, প্রকৃতবিচারে অভ্যস্ত 'হিন্দু' নহে! অপর কোন দেশে ত হিন্দু-সমাজের ন্যায় দৃঢ় সম্বদ্ধ অন্তঃশাসিত সমাজও নাই! আমাদের সামাজিক, পারি-

বারিক ও পারমার্থিক বিধিগুলি অক্ষুণ্ণরূপে প্রতিপালিত হইতে পাইলে, আমরা রাজশক্তি কাহার হাতে আছে সে কথা অতি সামান্য কথা বলিয়া মনেই স্থান দি না। ঐ সকলে বাধা না পাইলে আপনাদের 'স্বাধীনতা আছে' বলিয়াই মনে করি। ইংরাজরাজ আমাদের সামাজিক নিয়মে কি ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। এই জন্যই আমরা ইংরাজরাজের এতটা পক্ষপাতী।

"দু এক জন গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের সময়ে যে দু একটী ব্যবস্থায় অপ্রীতি উৎপাদন করিয়াছে—যেমন ধর্ম্মপরিবর্ত্তেও উত্তরাধিকার থাকা বা সম্মতির আইন বা কোথাও তীর্থস্থানের বড় বড় মেলা ভঙ্গ—তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ শাসননীতির উপরে দোষ পড়ে নাই। কর্ম্মচারী বিশেষের অজ্ঞতা ও হঠকারিতা দোষে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু যখন ওরূপ ধরণের কিছু হইলে 'তবে' লোকে আপনাদিগকে 'অধীন' বলিয়া বুঝিতে পারে—'তবে' ঐ কথা ভাবিতে থাকে—তখন ওগুলা ঘটিতে দেওয়া—এমন শান্তপ্রকৃতিক প্রজার মনে অনর্থক বেদনা লাগিতে দেওয়া—ইংলণ্ডের এবং ভারতের উচ্চ রাজনৈতিকদিগের উচিত নয়।"

সাহেব বুঝিলেন যে অনাথবন্ধু প্রকৃত কথাই বলিতেছেন। দেখিলেন কি জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনতা হিন্দুরা পরাধীনতা বলিয়া মনে করেন না। আপনাদের সামাজিক নিয়মের অধীনে থাকিতে পাইয়া উহারা একান্তই

তুষ্ট এবং সেই জন্যই উহাদের সামাজিক কোন বিষয়ে পাদ্রিদের কি ডাক্তারদের খেয়ালে মাতিয়া হস্তক্ষেপ হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়,—অতিশয় অপকর্ম্ম।

সাহেব প্রকাশ্যে বলিলেন "কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে মুসলমান-সম্রাটেরা ঐরূপ কখন কখন করিতেন।"

অনাথবন্ধু। "কিন্তু তাহার ফল মুসলমানের পক্ষে কৈ ভাল হইয়াছে? কাহারও দোষ ত অনুকরণীয় নয়!"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা—রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কি আপনারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কোন দোষই দেখেন না?"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "পৃথিবীতে একেবারে নিখুঁত কিছুই হয় না। মনুষ্যের সকল কার্য্যেই ত্রুটি থাকে। পার্থিব সমস্ত জিনিসেরই ছায়া আছে। মোটের উপর ইংরাজের দৃঢ়সম্বদ্ধ শাসন প্রণালীতে প্রজা তুষ্ট আছে।

"তবে 'লেখাপড়া জানা লোকে' রাজার এ দেশের সম্বন্ধে শোষকতা দোষই অধিক দেখেন। এ দেশীয় শিল্প 'রক্ষা' করা পর্য্যন্ত রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। 'নগদ দশ পনের কোটি টাকা স্পষ্টতঃই না হয় ভারতবর্ষের দেয়-কর বলিয়া লইয়া এদেশ হইতে তা ছাড়া আর একটী পয়সাও না যায় এরূপ শিল্প বাণিজ্য ও রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত' এরূপ মনে করেন। 'হিন্দু মুসলমানের আমলে দেশের টাকা দেশেই থাকিত

এখন বৎসরে ৫০।৬০ কোটি যায়' এই কথাই উহাঁরা সকলে বলেন। কিন্তু ওরূপ করিতে পারা কি এ অবস্থায় এখনকার কালে সম্ভব? তবে প্রকৃতপক্ষে কতকটা শিল্প রক্ষা করিতে পারা অসম্ভব বলিয়া আমিও মনে করি না। গবর্ণমেণ্ট ছুরি, কাগজ প্রভৃতি এ দেশের উৎপন্ন গ্রহণ করিয়া সে কর্ত্তব্যও কতক পালন করিতে 'আরম্ভ' করিয়াছেন। কিন্তু বিলাত হইতে 'লবণ' আনার ব্যবস্থাটা বড়ই দূষ্য বলিয়া মনে হয়। আফিমের ন্যায় এ দেশেই লবণ প্রস্তুত করা উচিত। এ গেল সাধারণতঃ শিক্ষিতের কথা।

"ইংরাজ ঘেঁসা লোকে আপনাদের দাম্ভিকতার দোষই অধিক দেখে। এক টেবিলে খাইতে পায় না বলিয়া তাহারা বড়ই কাতর! কিন্তু উহা 'আমার চক্ষে' ইংরাজের আত্মগৌরবের পরিচায়ক বলিয়া একটা মহৎ গুণ বলিয়াই ঠেকে। কৈ, আমারও ত ভিন্ন-জাতীয়ের সহিত একত্রে খাইতে প্রবৃত্তি হয় না!"

সাহেব একটু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা অস্ত্র আইন সম্বন্ধে কি বলেন?"

নিজে ইয়ুরোপীয়, সুতরাং সাহেব নিরস্ত্রীকরণটা বড়ই অপমানকর মনে করেন। ভাবিলেন এ বিষয়ে এই সত্যবাদী লোকটীকে নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে হইবে।

অনাথবন্ধু বলিলেন, "সীমান্ত প্রদেশে যে সকল দুরন্ত

পার্ব্বত্য জাতি আছে তাহাদের হাতে ইংরাজী উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র পড়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। তাহাতে কতকগুলি ভাল ভাল ইংরাজ আফিসার এবং এ দেশীয় অনেকগুলি সাহসী সিপাহীর প্রাণনাশ সম্ভাবনা ব্যতীত অন্য কোন ফলই নাই। সুতরাং এ দেশে এক প্রকারের অস্ত্র আইন থাকার যে প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু বন্যশূকর, ভালুক, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হইতে শস্য রক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রজার নিকট অস্ত্র থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয়। সড়কি, বর্শা, এবং তীর ধনুক অস্ত্র আইনের ধারা হইতে একেবারেই বর্জ্জিত করা উচিত। ঐ সকল অস্ত্র সীমান্ত গোষ্ঠীয়দিগের যথেষ্ট আছে। যত আইনই করুন চোর ডাকাইতে ও সকল সর্ব্বদাই সহজে সংগ্রহ করিতে পারিবে। দাঙ্গা হাঙ্গামাতে ও সকল কদাচ ব্যবহার হইতে পারে বটে, কিন্তু লাঠি বন্ধ যখন করা যায় না—গলা টেপা, পেটে বুকে লাথিমারা, ইট ছোঁড়া, কাস্তে কাটারির কোপ ইত্যাদি যখন বন্ধ করা যায় না—তখন সকলের হাতেই দড়ি বাঁধিয়া না রাখিলে খুন বন্ধ করা অসম্ভব। ব্রিচলোডার কি ম্যাগাজিন রাইফল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রে গোরা সৈন্যই সুসজ্জিত থাকুক—এ দেশীয়দিগের উহাতে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মুখের দিক হইতে ভরিবার সাবেক ধরণের বন্দুক বন্যপ্রদেশে সহজে এবং বিনা 'ফি'তেই সাধারণ প্রজাকে রাখিতে দেওয়া উচিত। লাইসেনগুলি অন্ততঃ তিন

বৎসর চলা উচিত। বৎসর বৎসর বদলাইতে লোকের বড়ই হাঁটাহাঁটি ও হায়রানি হয়। আদালতে আসিতে হইলেই ত খরচা!

"আর্ম্মাণি, ইংরাজ এবং দেশীয় খৃষ্টানগণ যে অস্ত্র আইন হইতে বাহিরে আছেন, তাহা না রাখিলে বড়ই উঁচুদরের কাজ হয়। তাহা যদি নাই পারেন, তাহাতেও বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি আছে মনে করি না। কিন্তু স্কুল পাঠশালায় এবং গ্রামে গ্রামে কাওয়াজ শিখানর বন্দোবস্ত থাকিলে বড়ই ভাল হয়। সৈনিক 'ড্রিলে' যে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবেই অমূল্য।"

সাহেবটির মন যথার্থই উঁচুদরের। অনাথবন্ধুর সরল উত্তরে বুঝিতে এবং শিখিতে পারিলেন যে, প্রকৃত সুসভ্য-সমাজে অস্ত্র সম্বন্ধে মত এই ধরণেরই হইবার কথা। ইংরাজেরাও সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। সাহেব দেখিলেন যে মার্কিণেরা যে কথায় কথায় পকেট হইতে রিভলভার বাহির করেন, তাহার অপেক্ষা আধুনিক হিন্দুর ন্যায় নিরস্ত্র থাকাই যেন পবিত্রতার পরিপোষক!

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "সৈনিক চাকরী সম্বন্ধে লোকে কি কি বলে?"

অনাথবন্ধু বলিলেন "কিছু কিছু উচ্চ সামরিক চাকরী উচ্চ বংশোদ্ভূত শিখ, রাজপুত, পাঠান, মহারাষ্ট্রীয় ও পশ্চিমের ব্রাহ্মণাদিকে এবং কখন দু একটী বাঙ্গালী ও

দক্ষিণীকে দিলে ভারতবাসী আনন্দে গলিয়া যাইবে। এতটুকু সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে যে আপনারা কেন পারেন না, এ বিষয়ে কেনই যে এতটা ক্ষুদ্র দৃষ্টি, তাহা যদি আমরা কিছু বুঝিতে পারি! মোগলের নিকট রাজা মানসিংহের সম্মান যে দেশে হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেনই এত অনুদার ভাব দেখান? রুষীয়েরা এক "জেনারেল আলিখানফে" কত সুখ্যাতিই পাইতেছে! আপনাদের ওরূপ অন্ততঃ দুইটী কয়াওত রাজনীতি সঙ্গত!"

সাহেব একটু লজ্জিত হইয়া কথা ফিরাইবার জন্য বলিলেন "বিচার সম্বন্ধে লোকে কি বলে?"

অনাথবন্ধু। "ন্যায় বিচারই প্রায় হয়! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও ডিক্রি পাওয়া যায়। বিচারের এমন সুবন্দোবস্ত বোধ হয় এসিয়ার আর কোন দেশে নাই। ধরণটা দেখিতে শুনিতে খুবই ভাল। তবে দেওয়ানী মোকদ্দমায় আদালত খরচার হার 'কিছু' কমাইয়া দেওয়া উচিত।"

সাহেব বলিলেন "শিল্প রক্ষা, এবং ডাক্তারি মতাদির উল্লেখে সামাজিক নিয়মে অণুমাত্র হাত না দেওয়া, রাজকার্য্য পরিচালনে কিছু খরচ কমাইয়া যাহাতে করভার আর কোন মতে বর্দ্ধিত না হয় তাহা করা, তীর ধনুক এবং বর্শা প্রভৃতি সামান্য অস্ত্র সম্বন্ধে অস্ত্র আইন উঠাইয়া লওয়া, দু দশটি ভদ্রসন্তানের পক্ষে সামরিক বিভাগে ক্রমশঃ উন্নতি হইতে দেওয়া, জাতিটা বীর্য্যহীন না হইয়া পড়ে, এ জন্য সাধারণতঃ ভারতবাসীর কুস্তি কাওয়াজের বন্দোবস্ত

করা, এই গুলি ছাড়া দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকে গবর্ণমেণ্টের কাছে আর কিছু চায় ?”

অনাথবন্ধু বলিলেন “হাঁ, আর একটি বিষয়ে লোকের মনে একটু অন্তর্গূঢ় ক্ষোভ হইতেছে। ইউরোপীয়দিগের হাতে দেশীয়ের মৃত্যু হইলে অথবা দেশীয় স্ত্রীলোকের অপমান হইলে অনেক সময়ে ইয়ুরোপীয়ের উপযুক্ত সাজা না হওয়ায় সাধারণ লোকে একটু মনমরা হইতেছে। আমি উকীল ছিলাম—আইন জানি। আমি জানি যে. দোষ ইয়ুরোপীয় জুরিদের—এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কোন দোষ নাই। কিন্তু লোকে অত বুঝে না।

“আমি একজন ভদ্রলোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে দোষ জুরির—ইংরাজের স্বজাতি পক্ষপাতিত্বের। কিন্তু তিনি বলিলেন, ‘যদি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ-কর্ম্মচারীরা ঐ দোষ শূন্য হইতেন তবে এতদিনে জুরির বিচার বন্ধ করিয়া ইয়ুরোপীয় খুনির বিরুদ্ধে “মার্শল-ল” জারি করিতেন। ইয়ুরোপীয় খুনি, জুরির বিচারে নির্দ্দোষ হইলেও তাহাকে দেশ বহিষ্কৃত করিবার উপায় করিতেন।’ আমি বলিলাম যে গবর্ণমেণ্টের ওরূপ করিবার সাধ্য নাই। তাহা হইলে বিলাতে ভয়ানক আন্দোলন হইবে।

“আসল কথা এই যে ব্যাপার শক্ত বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি গোপনে গোপনে ‘ফুলার মিনিটের’ ন্যায় হুকুম সর্ব্বদা জারি করেন, যদি প্লীহা ফাটান এবং গুলিকরা আসামীরা সামান্য সাজাই পাউক আর খালাসই পাউক তাহাদের

"অসতর্ক" বা "অধীর" বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে অস্ত্র আইনের অধীন করিয়া অপমানিত করেন এবং বিচার বিভ্রাট বন্ধ করিবার জন্য যদি প্রতিমাসে কতগুলি ইউ-রোপীয় মনুষ্য-হত্যা করিয়া সাজা পাইল না বা কম সাজা পাইল তাহার তালিকা লইয়া, 'কেন এরূপ হইল' তাহার বিবরণ জানিবার জন্য গুপ্তভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া রিপোর্ট চাহেন এবং বারান্তরে না ঘটে সে জন্য কি করা আবশ্যক তাহার পরামর্শ চাহেন, তবে জজ মেজেষ্টার-দেরও ঐ দিকে বিশেষঃ যত্ন হয়—জুরি লিষ্টের প্রকৃতপক্ষে সংশোধন হয়।

"রাজার জাতি সাজা পাইলে 'এদেশে' রাজার মান হানি হয় না। এদেশে রাম রাজাই লোকের মানসিক আদর্শ। রাম প্রজারঞ্জন জন্য পত্নী ত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অন্যে পরে কা কথা! রাজা 'স্বগণের' উপর একটু অতিরিক্ত কড়া হইলে এদেশে সম্মান বাড়ে বই কমে না। 'প্রেষ্টিজ প্রেষ্টিজ' করিয়া যাঁহারা মরেন, দপদপা রাখিবার জন্য বড়ই চিন্তিত—তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

"ফলতঃ ঠিক নিক্তিধরা ন্যায়বিচারের অপেক্ষা রাজত্বের দৃঢ়তা সাধক জিনিষ আর কিছুই নাই। প্রজার প্রকৃত বিশ্বাস থাকা চাই যে রাজার জাতির সম্বন্ধেও ন্যায় বিচারই হইয়া থাকে।

"দেখুন, দেশীয় ও সাহেবের কোন মোকদ্দমায় যদি সাহেবের কিছুমাত্র সাজা হয় অথচ দেশীয়ের উপর

অন্যায়পূর্ব্বক চালান মোকদ্দমায় সাহেবের খাতির না রাখিয়া যদি দেশীয়কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে বিচারকের কতই সুখ্যাতি বাহির হয়! দেশ শুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করে! ফলতঃ 'অপরাধীর' জন্য ইংরাজ সমাজে এত পূতু পূতু কেন হয়, তাহা যদি আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি! স্বজাতীয়ের দুঃখে দুখিত হইতে হয় বটে, কিন্তু গরীবের ঘর জ্বালান, ধান চসান, অথবা খুনের কি বলাৎ-কারের মোকদ্দমায় সেরূপ হওয়া কি উচিত? স্বজাতি বাৎসল্যের অপেক্ষাও কি ধর্ম্ম বড় নয়?"

অনাথবন্ধু অকপট ভাবে সমস্ত কথা বলায় সাহেব পরম প্রীত হইলেন। ধীরতা সহকারে কথিত 'খাঁটি সত্য কথা' প্রকৃতপ্রস্তাবেই জগতে দুর্লভ সামগ্রী!

সাহেব বলিলেন "আমি বিলাতে এ বিষয়ে আন্দোলন করিব। আপনি যথার্থই বলিলেন—ন্যায় বিচারই রাজত্বের ভিত্তি। সকল দেশেই এবং সকল সময়েই একথা ঠিক।"

অনাথবন্ধু বলিতে লাগিলেন "একটি প্রকৃত ঘটনার কথা বলি। দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার ভ্রাতা জাহাজ ডুবিতে মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যে টগ-ষ্টীমারের ধাকায় ঐ জাহাজ ডোবে তাহার কাপ্তেনের উপর আমার ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছিল।—"কেন হাল ফিরাইয়া লয় নাই!" এই কথাই ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া মনে হইয়াছিল। যদি কোন সাহেবের সাক্ষাৎ প্রহারে বা গুলিতে আমার ভাই মরিত, তাহা হইলে আজন্ম সংযম

শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান আমিই হয়ত আইন ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম!—খুনের ও বলাৎকারের উপযুক্ত বিচার হওয়া সকল সমাজেই একান্ত প্রয়োজন।”

“ফলতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের কথা ধরিলে যেমন নরহত্যা বড় মর্ম্মান্তিক পাপ—সমস্ত সমাজেরও পক্ষে সেইরূপ নরহত্যার প্রশ্রয় ভয়ানক পাপ। একজন গোরা এ দেশীয় একজনকে হত্যা করিয়া জুরীর গোলযোগে নিখিরকিচে বাঁচিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কিছু দিন পরেই সে আর একজন গোরাকে মারিয়া ফেলে। সেবারে উহার ফাঁসী হইল। কিন্তু প্রথম বারে কিছু কারাদণ্ডও হইলে আর স্বজাতির কেহ মরিত না। যে খুন হয় তার চেয়ে যে খুন করে তার ক্ষতি অধিক। অতি দীর্ঘ পরকালটা নষ্ট হয়।”

অনাথবন্ধুর এই শেষের কথাটা সাহেবের বড়ই মিষ্ট লাগিল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন “ধর্ম্ম ও পরকাল এই দুই সূত্র ধরিয়া আপনারা যেরূপে সকল কথারই মীমাংসা অতি সহজে ও সুন্দররূপে করিতে পারেন, ততটা দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া কার্য্য করিতে আমাদের বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরাও পারেন না। আমি এ দেশে আসিয়া দেখিতেছি যে, এ সকল অতি গভীর তথ্য পরকালের চিন্তায় অভ্যস্ত ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি হিন্দুর যেন মুঠার ভিতরে রহিয়াছে! এ সকল বহুপুরুষের ধর্ম্মানুবর্ত্তিতার ফল, আমরা হঠাৎ কিরূপে পাইব?”

অনাথবন্ধুর প্রতি একান্তই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সাহেব মন খুলিয়া বলিলেন “আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন যে দেশীয় লোকে একান্ত একাগ্র ও স্বার্থত্যাগী হইয়া চেষ্টা না করিলে তাঁহাদের শিল্পাগার স্থাপন বা শিল্প রক্ষা হইয়া উঠিবে না। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ গঠন তাহাতে ‘শিল্প রক্ষার উপযোগী’ আমদানী শুল্ক বসান ঘটিতেই পারে না। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন না বলিলেই হয়। যদি দেশের কোটি কোটি লোকে বিলাতী ছুরি, কোদাল, কাগজ ও কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করে, তবে দশ খানা ছুরি কি দশ রীম কাগজ কি পাঁচটা তাঁবু কিনিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের বিশেষ উপকার কি করিতে পারেন?

“করভার কমানও সম্ভব নয়। খরচত বৃদ্ধি হইতেই থাকে! তবে বিচার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিলে হয়ত অনেকটা সুবিধা করা যাইতে পারে।”

অনাথবন্ধু বলিলেন “পৃথিবীতে কোন অসুবিধাই থাকিবে না এরূপ হওয়া অসম্ভব। স্বধর্ম্মাচরণ এবং শিল্প রক্ষার জন্য যদি আমরা নিজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করি, আর সকল সময়ে প্রকৃত ন্যায়বিচারের জন্য আপনারা বিশেষ যত্ন করেন, তবে ভারতবাসীর তেমন উল্লেখ যোগ্য কোন কষ্টই থাকে না।”

সাহেব ইহার পর প্রধান সেনাপতির সহিত এই বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তাহার পর

হইতেই সৈনিকদিগের শিকার করিতে বাহির হওয়া এবং গুলি লাগান টোটা নিকটে রাখা সম্বন্ধে নূতন কতকগুলি নিয়ম প্রচারিত হয় এবং সাবেক নিয়মগুলির প্রতিপালন সম্বন্ধে বড়ই কড়াকড়ি আরম্ভ হয়।

সাহেব ইংলণ্ডীয় কয়েক খানি সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে ভারতে ইয়ুরোপীয় অপরাধীদিগের বিচার বিভ্রাট বিষয়ক অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলে, অনাথবন্ধুর পরামর্শানুযায়ী গুপ্ত সারকুলার জারি হইয়াছিল। খুনী ইংরাজের বেকসুর খালাস বা সুধু জরিমানা হওয়া থামিয়া আসিল এবং কারাদণ্ডাদির কথা ক্রমেই অধিক শুনা যাইতে লাগিল।

দেশীয়েরা ধীরভাবে খাটি সত্যকথা ভাল ইংরাজের কাছে বলিলেই অনেকটা উপকার পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মনুষ্যত্ব আছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুশীলার পত্র।

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং।
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং॥
করোতিবাসং গিরিরাজশৃঙ্গে।
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নাস্যঃ॥

সুশীলা কয়েক মাস পরে মাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

কলিকাতা
বুধবার।

সপ্রণাম নিবেদন—

মা!

আমি আজ চারদিন এখানে আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম দাদার বাসা থেকেই তোমাকে পত্র লিখিব, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

৺সরস্বতী পূজার দিন দাদা কত দুঃখ করিয়া বলিলেন, "বাবা আর মা যখন দেখিতেছেন না—কাশী গিয়া রহিলেন—তখন আমাদের কোন কিছু করিতেই যেন গা উঠে না।"

পিশিমা পিশেমশাই, দাদারা সকলে, বৌয়েরা, মেজখুড়িমা ও আমরা সকলেই একত্র হইয়াছিলাম। তোমাদের আর ছোট কাকার আসা হইলে কত ভাল হইত। সেজদাদা আর নদাদার আসা হওয়ায় তবু দাদা অনেকটা সুখী হইয়াছিলেন।

আমরা সকলেই রাঁধিয়া ছিলাম। অনেক গুলি ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। তোমরা কাশী হইতে যে ফল পাঠাইয়াছিলে, আর বাঁকিপুর হইতে যে ঘি এবং তরিতরকারী এবং কলিকাতা হইতে যে মশলা ও মেওয়া দাদারা ও পিশেমহাশয় আনিয়াছিলেন তাহাতে খাওয়ানর জিনিশ পত্র খুব ভাল হইয়াছিল। রান্না ভালই হইয়াছিল, কিন্তু মেজ খুড়িমার মত কাহারও রান্না ভাল হয় না।

খানকতক গোলপাতার চালা তুলিয়া দেওয়ায় বাড়ীটা তত ছোট বোধ হইতেছিল না। পাশে একখানা পাকা মেঝের উপর বড় খোলার ঘর হইয়াছে। নূতন ছাত্রেরা তাহাতে থাকেন।

সব জায়গা এমনি ঝর ঝরে আর সব জিনিস পত্র এমনি গোছান। বড় বৌএর সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল। খুব গোছাল, কাজ কর্ম্মে আছেন খু; সকলের সুবিধার জন্যই ব্যস্ত। আবার মুখে কথাটি নাই! খুব নিকটের কুটুম্বের মেয়েরা আসিয়াছিলেন।

একটি মেয়ে, বছর নয় বয়েস, সে যে সুন্দর!—আমরা তেমন কখন দেখি নাই! মেজ দাদার বৌএর চেয়েও

যেন সুন্দর হবে। বাপ মা নাই, মাতামহীর কাছে আসিয়াছে। তারা লাহিড়ী—বারেন্দ্র শ্রেণী। শুনিলাম বাপ পশ্চিমে কোথায় কেরাণীগিরি করিতেন। বাসায় বসন্তের মড়কে মেয়ের বাপ মা দুদিন আগুপেছু মারা যান। লোক খুব ভাল ছিলেন। বাসায় দশ জনকে খেতে দিতেন। টাকা কড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নাই। সুধু জীবন বীমা করেছিলেন। সে কোম্পানিরা গোলমাল করে টাকাটা দিলে না—কি আর কি হোল বোঝা গেল না, কিন্তু টাকা ওঁরা পান নাই। ডাক ঘরে সামান্য কিছু রাখিয়া ছিলেন। তাহাতেই সেখানকার খরচ পত্র করে আসা হয়। মেয়ের বিবাহে কিছু দিতে পারিবেন না। সেই জন্য ভাবনা। মেয়ে তার জ্যাঠার কাছে কিছু দিন ছিল, কিন্তু জেঠাই বড় দজ্জাল। সে অযত্ন করিত। জ্যাঠা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

তোমাকে এত খবর দিচ্ছি কেন জান? ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছোট দাদার বিবাহ দাও আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। বাবা ত বলিয়াছিলেন, 'রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হওয়ায় দোষ নাই, বরং হওয়াই ভাল; যখন সকলের ঐরূপ ইচ্ছা হইবে তখন ঐরূপ বিবাহ সমাজে চলিয়াও যাইবে।—কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের সহিতও কখন না কখন আবার চলিবে?' এখন আমরাত 'সকলেই' ঐ মেয়ের সঙ্গে ছোট দাদার বিবাহ ইচ্ছা করিতেছি! দাদাকে এই কথা বলায় তিনি বলিলেন "চলিবে বটে, কিন্তু দু তিন পুরুষের

আগে নয়। এখনও পরস্পর খাওয়া দাওয়া সব যায়গায় চলে না। সকলেই যখন চলা ভাল বলিবে তবেত চলিবে।”

এখানে ক্রমে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ঐ কথা বলায় তিনি বলিলেন ‘রাঁঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হওয়া কেমন কেমন মনে হয়। বিবাহে বর খুঁজিতে কিছু সুবিধা হয় বটে, কিন্তু উহা চলিবে না। আমার বাপের বাড়ীতে অমন কথা শুনিলে সকলে নাকি জাতি গিয়াছে বলিবেন!’—‘সকলের’ মন কি কখন হইবে?

দাদা সেদিন বলিতেছিলেন “দু তিন পুরুষ পূর্ব্বে কেহ একথা মনেও করিত না। এখন যাওয়া আসার এত সুবিধা হইয়াছে যে আগে বিক্রমপুর হইতে বৌ আনিতে পথে যত সময় লাগিত, এখন কাশ্মীর কনোজ থেকে তার চেয়ে অনেক শীঘ্র আসিতে পারা যায়। এখন অনেক লোকেই সকল দেশের ব্রাহ্মণের মধ্যে গোত্রাদি মাত্র বাছিয়া বিবাহের ইচ্ছা করিতেছে। সকল দেশীয় কায়স্থের ও বৈদ্যদের মধ্যেও ঐরূপ বিবাহ হয় ইচ্ছা করিতেছে। আরও দু তিন পুরুষ বাদে ও সকল বিবাহ কিছু কিছু চলিতে ‘আরম্ভ’ হইতে পারে। শাস্ত্রীয় আপত্তি নাই বলিয়াই চলিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, তিনি ত হিন্দুস্থানী ছিলেন! তবে ‘ভিন্ন জাতির’ সহিত বিবাহ কখনই চলিবে না।”

তা তোমরা ত সত্য সত্য ও মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে না!—অমনি মেয়ে কিন্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে এবারে গ্রহণের সময় কাশী যাইবেন। এখনও এক মাস আছে। বাবা আমাদের যাইবার জন্ত জিদ করিয়া লিখুন। হয় ত তাহাতে দো-ভাধাটা কাটিয়া যাইবে। আমারও যাওয়া হবে।

এখানে যে মেম সেলাই শিখাইতে পূর্ব্বে কদিন আসিয়াছিল, সে তখন বিধবা ছিল। এবারে তাহার মামাত ভাইয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। বর বয়সে ত্ব-বছরের ছোট! আজ এসেছিল; বলিল, এই বরের সঙ্গেই বরাবর বিবাহের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রোজগারী ছিল না বলিয়া অপর রোজগারী বরকে বিবাহ করিতে হয়। পূর্ব্বস্বামী মরিয়া যাওয়ায় এখন ভালই হইয়াছে, এইটে যেন জানাইল! সাহেবেরা এত সব কল কারখানা শিল্পকর্ম্ম জানে, লেখা পড়াও করে, আচার ব্যবহারে এমন কেন? মেমের কথা শুনে আমাদের লজ্জা করিতে লাগিল—সে কিন্তু বেশ অম্লানবদনে ঐ সব কথা বলিল। উহার একটা ছেলে আছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন, সেটা শীঘ্রই এইবার মারা যাইবে। নূতন স্বামী সে ছেলেটার যত্ন করিতে দিবে কেন? আর বল্লেন, এই সবগুলাই ইংরাজী পড়া কোন কোন লোকের ভাল মনে হচ্ছে!

আমার শ্বশুর আর মেমের কাছে লেখা ভাল বাসেন না। বলেন, সেলাই শিখিবার জন্ত কোন দরিদ্র মুসলমানের মেয়েকে পাঁচ টাকা দিলে সে ঠাণ্ডা মেজাজে

যত্ন করে শিখিয়ে দিবে। গরিব হিঁদুর মেয়েও ভাল সেলাই করিতে কেহ কেহ শিখিয়াছে। আর সব ত বাড়ীতেই আপনার লোকের কাছে শেখা চলে।

বাবাকে আমার শ্বশুরঠাকুর খুব ভক্তি করেন। বাড়ীতে এখন সুধু দেশী কাপড়ই কেনা হয়। ব্রতআচরণে যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহা আর বাড়ীতে আপনাআপনির মধ্যে রাখিতে দেন না। পাড়া অন্তরে টোলেই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাবার বন্দোবস্ত যাহা শুনেন, তাহাই খুব ভাল বলেন।

আমাকে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরাবরই ভালবাসেন ও যত্ন করেন। কিন্তু আমার দেবরের বিবাহ হওয়ার পর হইতে আমি ত মানুষ আমারই প্রশংসার শেষ নাই। তোমার সুখ্যাতি করিয়াই আমাকে আদর করেন। নূতন কুটুমদের ধরণধারণ তবে পছন্দসই হইতেছে না। আমার কাছে ওঁদের বিরুদ্ধে বেশী বেশী বলিতেছিলেন—আমি বলিলাম, পুরাণ হইলে ভাল লাগিবে। একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভাল যে সে সকল সময়েই ভাল। পুরাণ পাপী কি ভাল!"—তাঁরা কিন্তু এমন অন্যায় কিছু করেন নি।

পিশিমা শীঘ্রই কাশীবাস করিতে যাইবেন বলিয়াছেন। উনি ত অনেকদিন থেকে বলিতেছেন—কিন্তু তিনি আমাদের মায়া কাটিয়ে তোমাদের মতন অমন করে চলে যেতে পারিবেন না।

সত্যই বলছি, সে দিন সবাই একত্র হওয়ায় তোমার কাশীতে থাকাটা যেন অন্য সময়ের চেয়েও আরও মন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সংস্কৃত থিয়েটার হবার জন্য অনেকে জিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। একজন ভাল কথক আসিয়াছিলেন। তিনি একটি পুরাণের গল্প বলিলেন, আর গুটিকতক জয়দেবের গান গাইলেন। ভঙ্গিরঙ্গ খুব কম, আর গলা বড় ভাল। কিন্তু আর সকলের চেয়েই ভাল লাগিয়াছিল—দাদাদের ও টোলের ছেলেদের এক সঙ্গে স্তব ও বেদপাঠ। অনেক রকমের শ্লোক পড়া হইয়াছিল। মানে ত কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু কেমন একরকম মিষ্টি লাগে! শব্দটা যেন অনেক দিন পর্য্যন্ত কাণে লেগে থাকে। অন্য সব গানের মতন শীঘ্র ভোলা যায় না।

বাবাকে ও ছোট কাকাকে আমার প্রণাম জানাইবে ও তুমি আমার প্রণাম জানিবে। এখানকার সকলেই ভাল আছেন।

মা! তোমাকে মুখে যাহা যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই রকমই লিখিলাম। অন্য কেহ ত আর দেখিবে না! তাই আজ তিন দিন ধরে এই প্রকাণ্ড চিঠি লিখিতেছিলাম।

সেবিকা
সুশীলা

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বারাণসীর পত্র।

স্বাচার পরিপূতাশ্চ ধার্ম্মিকা শাস্ত্রবেদিনঃ।
বিধিজ্ঞা ব্রাহ্মণা লোকে ব্রহ্মণঃ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টয়ঃ ॥

তিন বৎসর পরে বারাণসী হইতে অনাথবন্ধু প্রদোষকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।—

তুমি লিখিয়াছ যে কোন ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন 'সমস্ত ভারতবাসীর একোদ্যমে হয় ফিরিঙ্গি হইয়া যাওয়া উচিত, না হয় মরিয়া যাওয়া উচিত। এমন অবজ্ঞেয় জীবনে ফল কি ?'

তুমি উত্তর দিয়াছিলে 'যদি সকল ভারতবাসী একোদ্যমে কোন কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে ফিরিঙ্গি হইবার প্রয়োজন কি ?—সকলেই স্বধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল হইলেই ত হইল।' তোমার উত্তর ভালই হইয়াছিল। উহার ভিতরে আসল কথা সবই আছে।

ভারতবাসী বৈদেশিক বিজেতার এবং বৈদেশিক শিক্ষায় স্থূলদৃষ্টি স্বদেশীয়ের দ্বারা 'অবজ্ঞাত' বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি "অবজ্ঞেয়" ?

হিন্দু অপর জাতীয়দিগকে কষ্ট দিতে তাহাদের দেশে যায় না। অপরে আসিয়া কষ্ট দিলেও বিশেষ

ভ্রুক্ষেপ করে না। গীতায় ভগবান স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ লোকই তাঁহার প্রিয়—(যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ)।

এমন স্বল্পে তুষ্ট, সংযমশীল, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী জাতি আর কোথায় আছে? এত শস্তাদরে মজুরী, কৃষি ও শিল্পের কার্য্য, সিপাহীগিরি, লেখকের ও শিক্ষকের ও পুরোহিতের কার্য্য আর কোন্ জাতীয় লোকে করিতে পারে? সংযম ব্যতীত শস্তা হয় না। পারিশ্রমিক যুদ্ধে—যে যুদ্ধের পৃথিবীতে ক্ষণমাত্র বিরাম নাই—পৃথিবীর কোন জাতিরই ভারতবাসীকে জিতিবার কথা নয়।

তবে এখন যে আমরা শিল্প যুদ্ধে ক্রমাগতই হারিতেছি তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দোষে। আমাদের দলবন্ধন ক্ষমতাই কম। আর কারবারে দলবন্ধন আমাদের একেবারেই অনভ্যস্ত। এ দিকে প্রতিযোগী যে সে কেহ নয়—প্রবলপ্রতাপ "ম্যাঞ্চেষ্টর!" তাহার চাপ এত ভয়ানক যে ভারত গবর্ণমেণ্টও অনিচ্ছায় ফ্যাক্টরি আইন ও কার্পাস শিল্পের উপর কর বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন!

এখনও আমাদের অনেক বিষয়েই শিক্ষানবিশী চলিতেছে। ভগবান আমাদিগকে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে একান্ত স্বধর্ম্মিপ্রেমিকতা শিখাইবার জন্য ঐ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ জাতি মুসলমানের অধীন করিয়াছিলেন। এক্ষণে নিরপেক্ষভাবে ও সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য পরিচালন, বিবিধ বৈষয়িক জ্ঞান

ও স্বজাতিবাৎসল্য শিখাইবার জন্য ভূমণ্ডলের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ইংরাজকেই আমাদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য পদে পদে দেখিয়া, শুনিয়া, ঠেকিয়া আমরা যে একদিন উত্তমরূপেই উহা শিক্ষা করিব, কোন আস্তিকের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

সমস্ত ভারতবাসীর কল কারখানায়, জ্ঞান সম্পন্ন ও জাতীয়ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষিক্ত হইতে অনেককাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে, তখন উহা রেড ইণ্ডিয়ানদের নির্ম্মূল করিয়া মার্কিনরাজ্যের মূলপত্তন অপেক্ষা মহত্তর ও বিশুদ্ধতর কার্য্য বলিয়া ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তখন এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী কয়েক সহস্র ইংরাজ, এবং কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান সকলেই "ভারতীয় ভাব" প্রাপ্ত হইলে এই পুণ্যভূমি কার্য্যতঃ কানেডা প্রভৃতির ন্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশে পরিণত হইতে পারিবে।

বিশ পঁচিশ পুরুষ পরে স্বদেশীয় ও স্ববংশীয়দিগের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে, তখন কাহারে নিকট আর তাহাদের কোন বিষয়ে হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে না—এ কথায় যিনি আশস্ত হইতে না পারেন, তিনি দূরকামীও নহেন। হিন্দুর আদর্শ নিষ্কাম ধর্ম্ম, তাঁহার লক্ষ্যের একান্তই অতীত!

হিন্দু যদি লোপ পাইবার হইত, তবে বৌদ্ধ ও মুসল-

মানের চাপে বাঁচিল কিরূপে? উহার অত্যুচ্চ ধর্ম্মমত-বাদে ও বিশুদ্ধ আচার প্রণালীতে ও ভক্তিমান হৃদয়ে অক্ষয় সত্য নিহিত আছে বলিয়াই হিন্দু অজর অমর জাতি।

হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান দোষ এই যে, হিন্দুর স্বজাতির সহিত সহানুভূতি কম। হিন্দু যতটা প্রয়োজন ততটুকুও আত্মপর বুঝে না। সুতরাং দলবন্ধনে ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় পারগ নহে। সুদৃঢ় সামাজিক দল বন্ধনই "লোক ভয়ের" মূল। লোকভয় না থাকিলে লোককে খাঁটি রাখিবে কিসে?

যেমন অচিন্তনীয় ঘটনা পরম্পরা দ্বারা অতি সহজেই ইংরাজের অধিনায়কতায় ভারতের রাজনৈতিক একতা সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ নৈসর্গিক কারণেই ভারতবাসী-দের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বৃদ্ধি ও অনেক বিষয়ে তাহাদের কূপমণ্ডুকতার হ্রাস হইতেছে। একবার ভাবিয়া দেখ পেশোয়াদিগের রাজধানী পুনা নগরীতে কংগ্রেশ উপলক্ষে বাঙ্গালী সভাপতির অধীনে যে সকল সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাঁহাদের মত ভারতবাসী মাত্রের প্রতি সহানু-ভূতি টুকু পাইলে কি রাজপুতানায় ও বাঙ্গালায় "বর্গির হাঙ্গামা" হইতে পারিত?

পরবর্ত্তী কালের এবং নিজের পারলৌকিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রানুমত পথে পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্ব প্রকারের কর্ত্তব্য পালনে হিন্দু আদিষ্ট।

পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। উহার কোন কার্য্যই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্ত কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিবার যো নাই। জীবন ক্ষণস্থায়ী বটে, কিন্তু কর্ম্মফল ত সেরূপ ক্ষণস্থায়ী নহে! উইলিয়ম টেল,জেয়োন অফ আর্ক,ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, বিস্‌মার্ক, শঙ্করাচার্য্য, শিবজী, গুরুগোবিন্দ, চৈতন্ত প্রভৃতি মহাত্মগণের সৎকার্য্যের ফল এবং জয়চন্দ্র, কালা-পাহাড়, মীরজাফর, লালসিং, কাউণ্ট জুলিয়ান প্রভৃতির অসৎকার্য্যের ফল ইহলোকেই ত দূরগামী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখা যাইতেছে, পরলোকে আরও কত দীর্ঘকাল স্থায়ী!

প্রতিবাসীর বাড়ীতে যখন আগুণ লাগিয়াছে তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যতীত কাহারও সুধু বসিয়া মালা ফিরাইলে তাহা যে ভগবানের প্রীতিকর কার্য্য হইতে পারে না সেটি 'আমাদের বোঝা চাই। স্বজন প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সে জন্য জমিজমার বা চাকুরীর ভয়ে বা অর্থলোভে জমিদারের বা প্লাণ্টারের লাঠিয়ালের পক্ষেও যে স্বদেশীয়ের গ্রাম জ্বালান অতি মহাপাপ ইহা স্মরণ থাকা আবশ্যক। বিচার বিভ্রাটে, যখন প্রপীড়িত ব্যক্তির উপর উল্টা চাপে মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমা চলে, তখন তাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ক্ষমতাপন্ন অপরাধীর আনন্দ-বর্দ্ধনে ও দুর্ব্বল নিরপরাধীর সর্ব্বনাশ সাধনে সাহায্য করা অতি পৈশাচিক কার্য্য—বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভু-দ্রোহ দ্বারা বা অরক্ষিতা বিধবার বা দুর্ব্বলের বা যাহার খাইয়া মানুষ তাহার সর্ব্বনাশ সাধন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ

অতি ঘৃণাহ পাপাত্মার কার্য্য—এই সকল কথা স্মরণ থাকা চাই।

এই সকল অপকার্য্যের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন আমাদের নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই তেমনি আবার—ঐ সকল কুকার্য্য করিতে প্রস্তুত অনেক লোক আমাদের মধ্যে থাকায় আমাদের গর্ব্বিত হইবারও অধিকার নাই। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক গুরুতর দোষের নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক। তবে সাধারণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির বিশেষ উদ্রেক হইলে—সাধারণের অভিমতির একটা দৃঢ়তা এবং তজ্জনিত লোক লজ্জার সহিত "লোকভয়" দাড়াইলে—আমাদের অনেক দোষই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

অপরের প্রতি অন্যায়াচরণের সময়ে লোক লজ্জার ভয় না করিয়া উদাসীন থাকাই আমাদের মূলের দোষ।

এই সহানুভূতি হীনতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্যই আমরা শত শত বৎসর ধরিয়া বৈদেশিকের নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি। প্রায়শ্চিত্তে যে কিছু কিছু পাপ ক্ষয় হইতেছে তাহাও ইতিহাস দেখাইতেছে। মুসলমানের অধীনে যে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল তাহাতে ভারতের একটি প্রদেশে জাতীয় জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে হিন্দুর জাতি ভেদ আচার ব্যবহার অটুট রাখিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা জাতীয়-ভাবে এরূপ পরিষিক্ত হইয়াছিল যে উহাদের পতন

কালেও "উহাদের মধ্যে স্বদেশদ্রোহী জন্মে নাই।" কিন্তু "প্রভুদ্রোহী" জন্মিয়াছিল এবং উহাদের ঐ জাতীয়ভাব প্রাদেশিকভাবের অপেক্ষা উচ্চে উঠিতে পারে নাই।

ইংরাজ শাসনের ফলেই যে সমস্ত ভারতবাসী আপনাপন ধর্ম্ম ও আচার অটুট রাখিয়া প্রকৃত "ভারতীয়-ভাব" প্রাপ্ত হইবে তাহার সুস্পষ্ট পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ ইতিমধ্যেই হিন্দু মুসলমানের স্থান ও সময় বিশেষে একপ্রাণতার উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। অবস্থা একরূপ বলিয়া ভারতবাসী সকলেরই ক্রমশঃ তাহা ঘটিবে। গোহত্যা সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে যে আজকাল আগন্তুক একটু গোলযোগ হইতেছে, [illegible] জন্য প্রবলতর কারণ সমূহের সমবায়ে সমুৎপন্ন একতার দিকে গতি আটকাইবে না।

ভারতবাসী যখন নিজের অভ্যস্ত পথে সাধনা আরম্ভ করিবেন, যখন প্রত্যেকে "নিজের নিজের মনে" সহানুভূতি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হইবেন, অপরে তাঁহার সহিত ঠিক একমত না হইলেও নিজের অন্তরের সাধনা ছাড়িবেন না—তখন ঐ পথে সমস্ত সমাজের গতি অতি দ্রুতবেগেই হইবে সন্দেহ নাই। সত্বর ফলাকাঙ্ক্ষাতেই আজিকালি যত বিবাদ!

বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া শস্য জন্মে। ফল পাকে আবার বীজ হয়। তদ্দ্বারা আবার শস্যোৎপত্তি হয়।

মানুষও শস্যের ন্যায় হয়, শস্যের ন্যায় যায়। তবে

মনুষ্যই সকল শস্যের সেরা। মনুষ্যের মধ্যে আবার পবিত্রাচারসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিসমন্বিত, পরোক্ষদৃষ্টি, কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়ব্রত কতকগুলি একান্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত কয়েকজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই সেরা ফসলের সেরা দানা!

নিজের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা অপরের সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দু আপনার শাস্ত্রাদিষ্ট পথে চলুন—সেরা ফসলের সেরা দানা এই পুণ্য ভূমিতেই চিরকাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে থাকিবে। সুধু সুধু আপনাকে অবজ্ঞেয় মনে করিয়া আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া [illegible] নাই—কিন্তু পূর্ব্ব গৌরবের দোহাই দিয়া [illegible]জের ত্রুটির বিষয়ে অন্ধ হইয়াও কাজ নাই। হিন্দুর মবিবার বা ফিরিঙ্গি হইবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু "প্রকৃত রূপে হিন্দু" হউন। ইহকাল পর কাল দুই বজায় থাকিবে।

এ সকল বিষয়ে তোমার সহিত আমার ও সংসারের অনেকবার কথা হইয়াছে। তোমরা কয় ভাই এইরূপ মনেই আছ। কিন্তু মানুষ কতদিন আছে তাহার ঠিক নাই, সেইজন্যই এতটা "লিখিয়া" রাখিলাম। আমাদের বংশে এইরূপ শিক্ষাই চলিয়া আসিতেছে আর এইরূপই যেন চলিতে থাকে।"

সম্পূর্ণ।